কিশোর ক্লাসিক

BANGLAPDF.NET

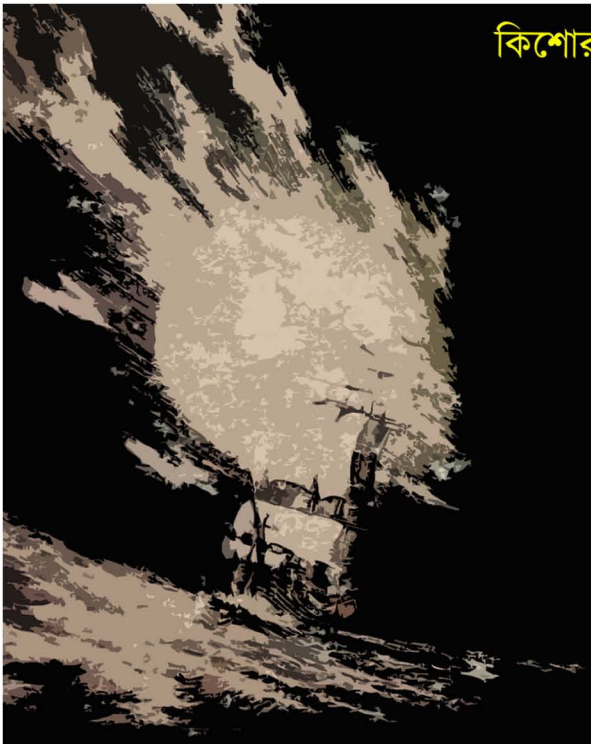

বাউন্টিতে বিদ্রোহ

মুলঃ জেমস নরম্যান হল এবং
চার্লস নর্ডহফ
রুপান্তরঃ নিয়াজ মোরশেদ

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

কিশোর ক্লাসিক

জেমস নরম্যান হল

ও চার্লস নর্ডহফ

বাউন্টিতে বিদ্রোহ

রূপান্তর: নিয়াজ মোরশেদ

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-3076-1

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৭

দ্বিতীয় মুদ্রণ: ২০০১

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: শরাফত খান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

MUTINY ON THE BOUNTY
By: James Norman Hall
Charles Nordhoff
Trans & ed. by: Neaz Morshed

ত্রিশ টাকা

বাউন্টিতে বিদ্রোহ

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি কিশোর ক্লাসিক

লিউ ওয়ালেস
বেন-হার
চার্লস নর্ডহফ ও
জেমস্ নরম্যান হল
বাউন্টিতে বিদ্রোহ
সারভান্তেস
ডন কুইক্সোট
কানাইলাল রায়
কিশোর রামায়ণ
দশ কুমার চরিত
শেক্সপীয়ার
নাটক থেকে গল্প
ভিক্টর হুগো
লা মিজারেবল
দ্য ম্যান হু লাফ্স্
চার্লস ডিকেন্স
অলিভার টুইস্ট
আ টেল অভ টু সিটিজ
মার্ক টোয়েন
পুড্নহেড উইলসন
এমিলি ব্রনটি
ওয়াদারিং হাইটস
হ্যারিয়েট বীচার স্টো
আঙ্কল টম্স্ কেবিন

রাডইয়ার্ড কিপলিং
ক্যাপ্টেনস কারেজিয়াস
লর্ড লিটন
দ্য লাস্ট ডেজ অভ পম্পেই
লরা ইঙ্গলস ওয়াইল্ডার
ফার্মার বয়
লিটল হাউজ অন দ্য প্রেয়ারি
অন দ্য ব্যাঙ্কস অভ প্লাম ক্রীক
লিটল টাউন অন দ্য প্রেয়ারি
রাফায়েল সাবাতিনি
দ্য ব্ল্যাক সোয়ান
লাভ অ্যাট আর্মস
টমাস হার্ডি
টেস অভ দ্য ডার্বারভিল
ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড
জুড দ্য অবসকিওর
দ্য মেয়র অভ ক্যাস্টারব্রিজ
চার্লস কিংসলে
হাইপেশিয়া
এইচ.দ্য ভের স্ট্যাকপোল
ব্লু লেগুন
হেনরি হল কেইন
দ্য বন্ডম্যান
স্ট্যানলি ওয়েইম্যান
আ জেন্টলম্যান অভ ফ্রান্স

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

ভূমিকা

১৭৮৭ সালের তেইশ ডিসেম্বর ইংল্যান্ডের পোর্টসমাউথ বন্দর থেকে রওনা হয় এইচ.এম.এস (হিজ ম্যাজেস্টিজ শিপ) বাউন্টি। গন্তব্য, বিশাল দক্ষিণ সাগরের ছোট্ট দ্বীপ তাহিতি। উদ্দেশ্য, তাহিতি থেকে কয়েক হাজার রুটিফলের চারা সংগ্রহ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বীপগুলোয় পৌঁছে দেয়া। ইংল্যান্ডের তৎকালীন রাজকীয় সরকার আশা করেছিল, এ গাছের চাষ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইংরেজ মালিকানাধীন খামারগুলোয় কর্মরত নিগ্রো ক্রীতদাসদের জন্যে সস্তায় যথেষ্ট খাবারের ব্যবস্থা করা যাবে।

বাউন্টির সেই ঘটনাবহুল যাত্রার ঘটনারাশি উন্মোচন করা হয়েছে এ কাহিনীতে। বাউন্টির ইংল্যান্ড থেকে রওনা হয়ে তাহিতিতে পৌঁছানো, রুটিফলের চারা সংগ্রহের জন্যে দীর্ঘদিন সেখানে থাকা, অবশেষে ফিরতি যাত্রা, তারপর বিদ্রোহ, জাহাজ নিয়ে বিদ্রোহীদের তাহিতিতে ফিরে যাওয়া এবং সব শেষে এইচ. এম. এস প্যানডোরা নামের একটি জাহাজ গিয়ে বিদ্রোহীদের কয়েকজনকে ধরে নিয়ে আসা এবং বিচার করার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এ বই-এ।

কাহিনীর কথক হিসেবে লেখকদ্বয় নির্বাচন করেছেন রজার বিয়্যাম নামের এক কাল্পনিক চরিত্রকে। নৌবাহিনী থেকে অবসর নেয়ার পর বৃদ্ধ বয়েসে স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে সে গল্প বলছে। বাউন্টির নাবিকদের ভেতর রজার বিয়্যাম বলে কেউ না থাকলেও পিটার হেউড নামের একজন ছিল। এই হেউডের আদলেই লেখকরা গড়ে তুলেছেন বিয়্যামের চরিত্র। সে কারণে স্বাভাবিক ভাবেই বাউন্টির নাবিক তালিকা থেকে হেউডের নাম বাদ দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে বিয়্যামের নাম। মিডশিপম্যান পিটার হেউডের দিনলিপিই ('এ মেমোয়ার অভ পিটার হেউড' নামে প্রকাশিত) 'বাউন্টিতে বিদ্রোহ' (মূল ইংরেজি নাম 'মিউটিনি অন দ্য বাউন্টি')-এর মূল ভিত্তি। এ ছাড়া উইলিয়াম ব্লাই-এর 'এ ন্যারেটিভ অভ দ্য মিউটিনি অন বোর্ড এইচ.এম.এস বাউন্টি', ও 'এ ভয়েজ টু দ্য সাউথ সী'; স্যার জন ব্যারো'র 'দ্য মিউটিনি অ্যান্ড পাইরেটিক্যাল সিজিওর অভ এইচ.এম.এস. বাউন্টি', জর্জ ম্যাকানেস-এর 'দ্য লাইফ অভ ভাইস অ্যাডমিরাল উইলিয়াম ব্লাই' থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেছেন লেখকদ্বয়।

এক

১৭৮৭'র বসন্ত-শুরুতে আমার বাবা মারা গেলেন প্লুরিসি রোগে। মা সাধারণ গ্রাম্য মহিলা, ভেবেছিলাম ধাক্কাটা সামলাতে পারবেন না। কিন্তু যখন দেখলাম শুধু যে সামলে নিয়েছেন তা-ই নয়, বরং শক্ত হাতে ধরেছেন সংসারের হাল, তখন আশ্চর্য না হয়ে পারিনি। প্রকৃতি বিজ্ঞানে বিশেষ আগ্রহের কারণে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হওয়ার দুর্লভ সম্মান লাভ করেছিলেন বাবা। প্রকৃতির প্রতি আগ্রহ ছিল মায়েরও—আগ্রহ না বলে বলা উচিত, ছিল অদ্ভুত এক আকর্ষণ। এই আকর্ষণের কারণে রয়্যাল সোসাইটির ফেলোর স্ত্রী হয়েও মা রয়ে গিয়েছিলেন পুরোপুরি গাঁইয়া। শহরের কৃত্রিম পরিবেশের চেয়ে উইদিকম্বির শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনই বেশি প্রিয় ছিল তাঁর কাছে।

সত্যি কথা বলতে কি, বাবার মৃত্যুর পরই মা-কে আমি বুঝতে শুরু করি; মা হিসেবে নয় চমৎকার এক সাথী হিসেবে। জীবন, পৃথিবী, প্রকৃতি সম্পর্কে মা যে কতখানি জ্ঞান রাখেন, কতখানি বোঝেন তা বুঝতে পারি সেই সময়। বাবার অভাব এক দিনের জন্যেও অনুভব করতে দেননি আমাকে। আগে ছিলেন শুধু মা, সে সময়টায় হয়ে উঠেছিলেন মা বাবা দুইই। আমি কখন কি চাই মা যেন তা বুঝে নিতেন কোন অলৌকিক উপায়ে। আমার মন বুঝে যখন যেমন প্রয়োজন তখন তেমন হালকা বা গম্ভীর চালে কথা বলতেন। যখন কথার চেয়ে নীরবতাই বেশি ভাল লাগত আমার তখন চুপ করে থাকতেন।

সেদিন সকালে যখন স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কস-এর চিঠি এল, বাগানে হাঁটছিলাম আমরা। সময়টা শেষ জুলাই। আকাশ মেঘশূন্য, নীল। বাতাসে গোলাপের সুবাস। হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম, কালো পোশাকে কী অসাধারণ লাগে আমার মা-কে!—এই সময় আমাদের নতুন কাজের মেয়ে থ্যাকার এসে চিঠিটা দিল মায়ের হাতে। খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠিটা বের করে একটা পাথরের বেঞ্চে গিয়ে বসলেন মা।

'স্যার জোসেফ লিখেছেন,' পড়া শেষ করে তিনি বললেন। 'লেফটেন্যান্ট ব্লাই-এর নাম শুনেছিস না, ক্যাপ্টেন কুকের সাথে দক্ষিণ সাগর অভিযানে ছিলেন? স্যার জোসেফ লিখেছেন, ব্লাই এখন ছুটিতে, টউনটনে এক বন্ধুর বাড়িতে আছেন; আমাদের বাড়িতে নাকি আসতে চান। তোর বাবার খুব উঁচু ধারণা ছিল ওঁর সম্পর্কে।'

সতেরো বছরের তরতাজা তরুণ আমি তখন। ক্যাপ্টেন কুক, দক্ষিণ সাগর—শব্দগুলোর মর্ম ভাল করেই জানি।

'ক্যাপ্টেন কুকের সঙ্গে ছিলেন!' রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলাম আমি। 'মা, আসতে লেখো ওকে! যেমন করেই হোক, একদিন যেন ঘুরে যান আমাদের এখান থেকে।'

'আমি জানতাম, তুই খুশি হবি,' মৃদু হেসে মা বললেন।

আমাদের বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয় টউনটন। তখনই মা আমাদের গাড়িটা পাঠিয়ে দিলেন। কোচোয়ানের হাতে দিলেন একটা চিঠি, ব্লাই-এর জন্যে। লিখলেন, 'আজ সন্ধ্যাটা যদি আমাদের এখানে কাটান আমি এবং আমার ছেলে সত্যিই খুব খুশি হব।'

সারাটা দিন টগবগে উত্তেজনায় কাটালাম আমি। ক্যাপ্টেন কুকের একজন সহযাত্রী আমাদের বাড়িতে আসছেন। দক্ষিণ সাগর, তার দ্বীপরাশি, সেসব দ্বীপের সুখী মানুষগুলো সম্পর্কে এতদিন কেবল বইয়েই পড়েছি। আজ একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা শুনতে পাব। উত্তেজিত হওয়ার মত ব্যাপারই বটে।

সন্ধ্যার সামান্য আগে গাড়ি এসে দাঁড়াল আমাদের বাড়ির সামনে। কোচোয়ান লাফিয়ে নেমে দরজা মেলে ধরল। মিস্টার ব্লাই নেমে এলেন। দুরু দুরু বুকে আমি অপেক্ষা করছিলাম তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্যে। এগিয়ে যেতেই তিনি মৃদু হেসে উষ্ণ করমর্দন করলেন আমার সাথে। বললেন, 'একেবারে বাপের চেহারা পেয়েছ! ওঁর মারা যাওয়া–সত্যিই বিরাট ক্ষতি, অন্তত যারা নৌবিদ্যার চর্চা করে তাদের কাছে।'

লেফটেন্যান্ট উইলিয়াম ব্লাই মাঝারি গড়নের মানুষ। ঋজু শক্তপ্রোক্ত শরীর। একটু মোটা। পোড় খাওয়া চেহারা। দৃঢ় চোয়াল। কপালের নিচে সুন্দর কালো একজোড়া চোখ। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, বেশির ভাগই ঢাকা পড়ে গেছে নাবিকদের তিন কোনাওয়ালা টুপির নিচে। পরনে নাবিকদের উর্দি, সাদা কিনারাওয়ালা উজ্জ্বল নীল কোট, সাদা ওয়েস্টকোট, ব্রিচেস আর মোজা।

বসার ঘরে নিয়ে বসালাম মিস্টার ব্লাইকে। একটু পরেই মা নেমে এলেন ওপর থেকে। খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসলাম আমরা। খেতে খেতে আলাপ চলল। দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের ব্যাপারে আমার বাবা যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন ব্লাই। নাবিকদের যে কতটা সুবিধা হয়েছে তা বললেন। তারপর একসময় উঠল দক্ষিণ সাগর প্রসঙ্গ।

'ক্যাপ্টেন কুক যেমন বলেছেন, তাহিতির ইন্ডিয়ানরা সত্যিই সেরকম সুখী নাকি?' মা জিজ্ঞেস করলেন।

'তাহিতির ইন্ডিয়ানদের বেঁচে থাকার জন্যে খুব একটা পরিশ্রম করতে হয় না,' বললেন আমাদের অতিথি, 'এটাকে যদি সুখ বলেন তাহলে ওরা সুখী।'

'রজার আর আমি সেদিন জাঁ জ্যাক রুশোর লেখা পড়ছিলাম,' মা বললেন। 'ওঁর মতের সাথে আমরা একমত, প্রকৃতির সান্নিধ্যেই মানুষ সত্যিকারের সুখী হতে পারে।'

মাথা ঝাঁকালেন ব্লাই। 'হ্যাঁ, রুশোর অভিমত সম্পর্কে শুনেছি আমি, যদিও পড়ার সৌভাগ্য হয়নি–আমি ফ্রেঞ্চ জানি না। আমি কিন্তু একমত নই ভদ্রলোকের সাথে। আমার বিশ্বাস সুশৃঙ্খল, শিক্ষার আলো পাওয়া মানবগোষ্ঠিই কেবল প্রকৃত সুখের সন্ধান পেতে পারে। তাহিতির ইন্ডিয়ানদের কথা ধরুন, খাওয়া পরার কোন চিন্তা ওদের নেই, তা সত্ত্বেও ওদের সমাজে এমন সব অদ্ভুত বিধিনিষেধ আছে, তা-ও আবার একটা দুটো নয় হাজার হাজার, অত

বিধিনিষেধ মেনে কোন সভ্য মানুষের পক্ষেই জীবনধারণ সম্ভব নয়। মঁসিয়ে রুশো ওদের ভেতর কিছুদিন থেকে এলে নিশ্চয়ই মত বদলাতেন।' থেমে হঠাৎ করেই আমার দিকে ফিরলেন মিস্টার ব্লাই। 'তুমি তাহলে ফ্রেঞ্চ জানো?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'শুধু ফ্রেঞ্চ না, মিস্টার ব্লাই,' মা বলে উঠলেন, 'ইটালিয়ানও জানে। এখন শিখছে জার্মান। গত বছর ল্যাটিনে কৃতিত্ব দেখিয়ে পুরস্কার পেয়েছে। আমার কি মনে হয় জানেন?—ভাষা শেখার ব্যাপারে প্রকৃতিদত্ত কিছু গুণ আছে ওর।'

'এই গুণটা আমি পেলে—উহ!' হাসলেন ব্লাই। 'কি এক ঝামেলার কাজ যে আমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন স্যার জোসেফ, যদি জানতেন!'

'কেন? কি হয়েছে?' এক সাথে প্রশ্ন করলাম আমি আর মা।

'খুব শিগগিরই আবার দক্ষিণ সাগরের দিকে যাত্রা করছি আমি। বাউন্টি নামের ছোট্ট একটা জাহাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে। তাহিতি থেকে কয়েক হাজার রুটিফলের চারা সংগ্রহ করে পৌঁছে দিতে হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বীপগুলোয়।'

আগ্রহে চকচক করে উঠল মায়ের চোখ। 'উহ, আমি যদি পুরুষ মানুষ হতাম আমাকে সাথে নেয়ার অনুরোধ করতাম আপনাকে! চারাগুলোর যত্ন নিতে পারতাম আমি।'

মৃদু হাসলেন ব্লাই। 'খুশি হয়েই আমি সঙ্গে নিতাম আপনাকে। যদিও আমার সাথে একজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী যাচ্ছেন, তবু আপনাকে পেলে আপনাকেই আমি নিতাম। ডেভিড নেলসন অবশ্য যোগ্য লোক, চারাগুলোর অযত্ন হবে না এ বিশ্বাস আমার আছে। আমার যেটা দুশ্চিন্তা সে হলো স্যার জোসেফের চাপানো কাজটা।'

'কি কাজ সেটা?' আবার প্রশ্ন করলাম আমি আর মা।

'ইন্ডিয়ানদের রীতিনীতি এবং ভাষা সম্পর্কে যতখানি সম্ভব জ্ঞান অর্জন করে আসতে বলেছেন আমাকে। শুধু এ-ই না, ওদের ভাষায় যত শব্দ আছে তার একটা তালিকা তৈরি করতে হবে, সম্ভব হলে ওদের ভাষার ব্যাকরণও তৈরি করতে হবে। বলুন তো, আমার মত মানুষ—নিজের ভাষার বাইরে আর কোন ভাষাই ভাল করে বুঝি না, কি করে এমন গুরুদায়িত্ব পালন করব?'

'কোন পথে আপনারা যাবেন, স্যার?' আমি প্রশ্ন করলাম। 'হর্ন অন্তরীপ ঘুরে?'

'সে চেষ্টাই করব, যদি আবহাওয়া অনুকূল থাকে। ফেরার সময় অবশ্য পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আসব।'

খাওয়া হয়ে গেছে। টেবিল ছেড়ে উঠে বসার ঘরে গিয়ে বসলাম আমি আর ব্লাই। মা চলে গেলেন রান্নাঘরে টুকিটাকি কাজকর্ম সারতে। মদের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে ব্লাই আমার ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে লাগলেন। অবশেষে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'তোমাকে যদি আমি সাথে নিতে চাই, যাবে?'

আমার অবস্থা তখন রীতিমত লাফিয়ে ওঠার মত। রুদ্ধশ্বাসে বললাম,

'সত্যি বলছেন! আমাকে নিয়ে যাবেন?'

'তুমি যদি রাজি হও আর তোমার মা যদি অনুমতি দেন, আমার দিক থেকে কোন অসুবিধা নেই। আমি বরং খুশিই হব। ইন্ডিয়ানদের ব্যাকরণ তৈরির কাজটা তোমার ঘাড়ে চাপানো যাবে।'

মা বসার ঘরে আসতেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'মা; লেফটেন্যান্ট ব্লাই বলছেন, আমি ইচ্ছে করলেই আগামী যাত্রায় ওঁর সঙ্গী হতে পারি, তুমি আপত্তি না করলেই হয়।'

'তাই নাকি?' মিস্টার ব্লাই-এর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন মা।

'হ্যাঁ, ম্যাডাম।'

'কিন্তু, ও জাহাজের কি বোঝে?'

'বোঝে না, বুঝে নেবে। আপনি চিন্তা করবেন না, ম্যাডাম, আমার বিশ্বাস খুব শিগগিরই আপনার ছেলে ভাল নাবিক হয়ে উঠবে। ওর ভাষাজ্ঞানটাকে আমি কাজে লাগাতে চাই।'

'কতদিন আপনারা বাইরে থাকবেন?'

'এই ধরুন দু'বছর।'

'দু'বছর।' এক মুহূর্ত ভাবলেন মা। তারপর একটু ইতস্তত করে বলে ফেললেন, 'ঠিক আছে, আপনি যদি মনে করেন ওকে কাজে লাগাতে পারবেন, নিয়ে যান।'

কথাবার্তা সব পাকাপাকি হয়ে গেল। ঠিক হলো স্পিটহেড এ গিয়ে আমি যোগ দেব বাউন্টিতে।

অক্টোবরের শেষ দিকে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লন্ডন গেলাম আমি।

প্রথমেই ভাল এক দর্জির দোকানে গিয়ে এক প্রস্থ নাবিকের পোশাকের মাপ দিলাম। আমাদের উকিল মিস্টার এর্সকাইনের সাথে দেখা করে কিছু আইনগত বিষয় পাকাপাকি করলাম। তারপর গেলাম বাবার বন্ধু স্যার জোসেফের সঙ্গে দেখা করতে।

অত্যন্ত সুপুরুষ স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কস। ক্যাপ্টেন কুকের বন্ধু, দীর্ঘদিনের সাথী এবং সহযাত্রী। বছর পঁয়তাল্লিশ হবে বয়েস। এ বয়েসেই রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এ থেকেই অনুমান করা যায় কি গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী তিনি। খাওয়া দাওয়ার পর তাঁর পড়ার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন আমাকে। টেবিলের ওপর থেকে একতাড়া কাগজ তুলে এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

'তাহিতিয়ান ভাষার শব্দ-কোষ,' বললেন তিনি। 'তোমাকে দেব বলে নকলটা তৈরি করে রেখেছি। খুবই সংক্ষিপ্ত আর অসম্পূর্ণ। আশা করছি যদ্দূর সম্ভব এটা সম্পূর্ণ করবে তুমি। উচ্চারণগুলো আরও ভাল করে শুনে ঠিক বানানে লিখবে। আমার ধারণা–ব্লাইও আমার সাথে একমত, ইটালিয়ানদের বানান পদ্ধতি অনুসরণ করে লিখলে কাজটা সহজ হবে। ইটালিয়ান তো জানো তুমি, তাই না?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'বেশ,' বলে চললেন স্যার জোসেফ, 'কয়েক মাস লাগবে ওদের রুটিফলের চারা সংগ্রহ করতে। সেই সময়টা তুমি ব্যয় করবে অভিধানের কাজে। তোমাকে যেন অন্য বিষয়ে মাথা ঘামাতে না হয় তা দেখবে ব্লাই। তুমি ফিরলেই আশা করি আমি এটা প্রকাশ করতে পারব। তাহিতিয়ানেরই বিভিন্ন উপভাষায় কথা বলে বিস্তীর্ণ দক্ষিণ সাগরীয় দ্বীপরাশির মানুষ। অভিধানটা তৈরি করা গেলে নাবিকদের কত উপকার হবে বুঝতে পারছ? সহজেই ওরা আলাপ করতে পারবে স্থানীয়দের সাথে।'

'তাছাড়া আমার বিশ্বাস,' একটু থেমে বলে চললেন স্যার জোসেফ, 'খুব শিগগিরই ওই দ্বীপগুলোর ওপর চোখ পড়বে আমাদের খামার মালিকদের। আমেরিকার উপনিবেশগুলো হাতছাড়া হওয়ার পথে, সুতরাং আজ হোক কাল হোক, ওদিকে ওদের নজর দিতে হবেই। স্থানীয় ভাষার অভিধান, ব্যাকরণ হাতের কাছে থাকলে কত সুবিধা হবে ওদের ভাবতে পারো?

'একটা ব্যাপার খেয়াল রাখবে, কাজ যেটুকু করবে নিখুঁত ভাবে করবে। আর নিখুঁত কাজ করতে হলে একজন ভাল "তাইও"—মানে বন্ধু বেছে নিতে হবে তোমাকে। মাতাভাই উপসাগরে যখন কোন জাহাজ নোঙর ফেলে, হাজার হাজার ইন্ডিয়ান ক্যানো নিয়ে হাজির হয় সেখানে। সাদা মানুষদের বন্ধু হওয়ার জন্যে উদগ্রীব থাকে সবাই। ওই সময় তোমাকে সাবধান হতে হবে। বন্ধুত্ব করতে হবে সুতরাং একজনের সাথে করলেই হলো, এ মনোভাব ভুলেও আমল দেবে না। তীরে নেমে আগে ভাবচাল বুঝবে, লোকজনের সাথে আলাপ করবে, তারপর যাকে মনে হবে সবচেয়ে বুদ্ধিমান, উঁচু শ্রেণীর, তাকেই তুমি তাইও হিসেবে নেবে। সাধারণ দু'একটা জিনিস—যেমন, ছুরি, কাঁচি, কুঠার এসবের বিনিময়ে পাবে তাজা খাবার, আতিথেয়তা, উপহার—মোট কথা ওদের পক্ষে যা দেয়া সম্ভব সবই তোমাকে দেবে। নিচু শ্রেণীর কাউকে তাইও হিসেবে নিলে পুরো পরিশ্রমটাই পণ্ড হবে। দেখবে, বুদ্ধিশুদ্ধি নেই লোকটার, যেটা তোমার সবচেয়ে বেশি দরকার, হয়তো দেখবে সেটাই সে ঠিক মত জানে না—মানে ভাষা, উচ্চারণ ঠিক নেই, এমনি সব ব্যাপার। আমার ধারণা এই লোকগুলো শুধু যে অন্য শ্রেণীর তা-ই না, অন্য গোত্রেরও বটে। আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি, লম্বা চওড়া সুন্দর চেহারার তাহিতিয়ানরাই বুদ্ধিমান হয় বেশি?'

'মানে আপনি বলতে চাইছেন, আমাদের ভেতর যেটুকু সামাজিক সাম্য আছে ওদের ভেতর তারচেয়ে বেশি কিছু নেই।'

হাসলেন স্যার জোসেফ। 'আমি বলব কম। ওপরে ওপরে মনে হয় ওরা সবাই সমান, সব শ্রেণীর মানুষ একই কাজ করে; হয়তো দেখবে মাছ ধরা দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে রাজা, বা রানী নিজের ক্যানো নিজেই বেয়ে চলেছে বা অন্য মেয়েদের সাথে বসে বাকল-এর কাপড় তৈরি করছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় ওরা সমান। যতই যোগ্যতা বা বুদ্ধির পরিচয় দিক না কেন, ওদের সমাজে যে যে স্তরে জন্মেছে তা থেকে ওপরে উঠতে পারে না। ওদের বিশ্বাস

কেবল গোত্রপ্রধানদেরই আত্মা আছে কারণ তারা সাক্ষাৎ দেবদেবীর বংশধর।' থেমে কয়েক মুহূর্ত চেয়ারের হাতলে তবলা বাজালেন স্যার জোসেফ। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'তোমার যা যা দরকার সব জোগাড় হয়ে গেছে? কাপড় চোপড়, লেখার সরঞ্জাম, টাকা?'

'জি, স্যার।'

'সেক্সট্যান্ট আছে তোমার কাছে?'

'হ্যাঁ। বাবার একটা ছিল, সেটা নিয়ে এসেছি।'

'ভাল করেছ। ব্লাই যোগ্য নাবিক। সত্যি কথা বলতে কি ওর চেয়ে যোগ্য আর ক্রেউ নেই এখন। ও তোমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে পারবে। ওর নির্দেশ মেনে চললে আমার মনে হয় না তোমার কোন অসুবিধা হবে। মনে রাখবে—এ ধরনের কাজে শৃঙ্খলার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।'

স্যার জোসেফের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। কানের ভেতর গমগম করছে ওঁর শেষ কথাগুলো—'শৃঙ্খলার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি!' কতটা যে বেশি তা আমি ভদ্রলোকের সাথে আবার দেখা হওয়ার আগে হাড়ে হাড়েই টের পেয়েছিলাম।

দুই

নভেম্বরের শেষ দিকে আমি বাউন্টিতে যোগ দিলাম।

আগেই বলেছি জাহাজটা ছোট। মাত্র নব্বই ফুট লম্বা, চওড়া চল্লিশ ফুট। মাল-বহন ক্ষমতা দু'শো টন। তিন বছর আগে হাল-এ তৈরি করা হয়েছে বাণিজ্যিক নৌ-বহরের জন্যে। তখন নাম রাখা হয়েছিল 'বেথিয়া'। সম্প্রতি অ্যাডমিরালটি ওটা কিনে নিয়েছে দু'হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে। স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কস-এর পরামর্শ অনুযায়ী নতুন নামকরণ করা হয়েছে বাউন্টি। বেশ কয়েক মাস ডেপ্টফোর্ডের ডকে ছিল। রুটিফলের চারা বহনের উপযোগী করে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে প্রায় চার হাজার পাউন্ড ব্যয়ে। পেছনের বিরাট কেবিনটা ফাঁকা করে চারা গাছ রাখার জন্যে অসংখ্য মাটির পাত্র সাজানো হয়েছে তাকের ওপর। প্রতিটা পাত্রে যাতে পানি দেয়া যায় তার সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে দীর্ঘ নল লাগিয়ে। ফলে ওপরে ওঠবার মইয়ের দু'পাশে দুটো ছোট্ট কুঠুরিতে আশ্রয় নিতে হয়েছে লেফটেন্যান্ট ব্লাই এবং মাস্টার মিস্টার ফ্রায়ারকে।

জাহাজটার পুরো কাঠামো তামার পাত দিয়ে মোড়া, সে যুগের বিচারে নতুন একটা ব্যাপার। তার ওপর পেট মোটা খোল, বেঁটে মাস্তুল আর মোটাসোটা দড়িদড়া—সব মিলিয়ে বাউন্টিকে দেখতে যতখানি না নৌ বাহিনীর সশস্ত্র জাহাজের মত লাগে তার চেয়ে বেশি লাগে তিমি শিকারী জাহাজের মত। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ব্যবহার করা যায় এমন একজোড়া কামান বসানো আছে সামনের দিকে। একই রকম আরও ছ'টা কামান আছে পেছন দিকে। তা

ছাড়াও আছে চারটে চার পাউন্ডার কামান।

জাহাজে পা দিয়েই সব কিছু কেমন অদ্ভুত আর নতুন মনে হলো আমার কাছে। পুরোটা জাহাজ মেয়েমানুষে গিজ গিজ করছে। নাবিকদের স্ত্রীরা বিদায় জানাতে এসেছে স্বামীদের। রাম-এর বন্যা বইছে যেন ডেকের ওপর দিয়ে। নারী-পুরুষের হৈ চৈ, চিৎকারে কান পাতা দায়। জেটিতেও অনেক মানুষের জটলা। ওরা দর্শক। হৈ হল্লা করছে ওরাও।

ডেকের নারী পুরুষদের মাঝ দিয়ে পথ করে কোন রকমে জাহাজের পেছন দিকে গেলাম আমি। কোয়ার্টার ডেকে দেখলাম মিস্টার ব্লাইকে। দীর্ঘ, পেটা শরীরের এক লোক তাঁর সামনে।

'আমি, স্যার, পোর্টসমাউথ মানমন্দিরে গিয়েছিলাম,' লোকটাকে বলতে শুনলাম, 'আমাদের সময়-রক্ষক এক মিনিট বাহান্ন সেকেন্ড এগিয়ে আছে ঠিক সময় থেকে, এবং দিনে আরও এক সেকেন্ড করে এগিয়ে যাচ্ছে। মিস্টার বেইলি এ ব্যাপারে একটা চিঠি দিয়েছেন আপনাকে।'

'ধন্যবাদ, ক্রিশ্চিয়ান, ব্যাপারটা দেখছি আমি,' বলে ব্লাই ঘাড় ফেরাতেই দেখলেন আমাকে। 'আহ্, মিস্টার বিয়্যাম, তুমি এসে গেছ!' বললেন তিনি। 'এসো পরিচয় করিয়ে দেই, এ হচ্ছে মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান, আমাদের মাস্টারের মেট। আর, ক্রিশ্চিয়ান, এ হলো রজার বিয়্যাম, আমাদের নতুন মিডশিপম্যান। রজার, তুমি ক্রিশ্চিয়ানের সঙ্গে যাও, ও তোমার বার্থ দেখিয়ে দেবে, তোমার কাজ সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক ধারণাও পাবে ওর কাছে।'

মাথা নুইয়ে ক্রিশ্চিয়ানের পেছন পেছন এগোলাম আমি।

পরের দিনগুলোতে একটু একটু করে বাউন্টির অন্যান্য নাবিকদের সাথে পরিচয় হলো আমার। মাস্টার ফ্রায়ার, সার্জন ওল্ড ব্যাকাস, উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ডেভিড নেলসন, মাস্টার অ্যাট আর্মস চার্লস চার্চিল, সহকারী সার্জন টমাস লেডওয়ার্ড, মাস্টার অ্যাট আর্মস-এর মেট উইলিয়াম এলফিনস্টোন, গোলন্দাজ উইলিয়াম পেকওভার, গোলন্দাজের মেট জন মিলস, সারেং উইলিয়াম কোল, সহকারী সারেং জেমস মরিসন, ছুতোর মিস্ত্রী উইলিয়াম পার্সেল, ছুতোর মিস্ত্রীর দুই সহকারী চার্লস নরম্যান আর টমাস ম্যাকইন্টশ, আর্মারার জোসেফ কোলম্যান, আমার সহযোগী মিডশিপম্যান পাঁচজন–টমাস হেওয়ার্ড, জন হ্যালেট, রবার্ট টিঙ্কলার, এডওয়ার্ড ইয়ং, জর্জ স্টুয়ার্ট; দুই কোয়ার্টার মাস্টার–জন নর্টন আর পিটার লেংকলেটার, সহকারী কোয়ার্টার মাস্টার জর্জ সিম্পসন, পাল নির্মাতা লরেন্স লেবোগ, ক্যাপ্টেনের কেরানী মিস্টার স্যামুয়েল, কসাই রবার্ট ল্যাম্ব, মালী উইলিয়াম ব্রাউন, বাবুর্চি জন স্মিথ আর টমাস হল; দক্ষ খালাসী টমাস বারকিট, ম্যাথ্যু কুইনটাল, জন সামনার, জন মিলওয়ার্ড, উইলিয়াম ম্যাককয়, হেনরি হিলব্রান্ডট, আলেকজান্ডার স্মিথ, জন উইলিয়ামস, টমাস এলিসন, আইজাক মার্টিন, রিচার্ড স্কিনার, ম্যাথ্যু থম্পসন, উইলিয়াম মুসপ্র্যাট আর মাইকেল বায়ার্ন–প্রত্যেকে যার যার ক্ষেত্রে দক্ষ। আমি একাই কেবল আনকোরা নতুন।

আটাশ নভেম্বর ভোরে আমরা পাল তুলে দিলাম। তরতর করে এগোল

বাউন্টি। কিন্তু কপাল মন্দ, সেন্ট হেলেনস দ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছুতেই বাতাস প্রতিকূল হয়ে উঠল। আকাশ হয়ে উঠল মেঘাচ্ছন্ন। বৃষ্টি পড়তে লাগল। নোঙ্গর ফেলা ছাড়া গত্যন্তর রইল না আমাদের।

বাউন্টির মত ছোট জাহাজে চল্লিশজন সঙ্গীসহ মাঝ সাগরে নোঙ্গর ফেলা অবস্থায় দিনের পর দিন চুপচাপ কাটিয়ে দেয়া সোজা কথা নয়। দু'দিন যেতে না যেতেই বিরক্ত হয়ে উঠল সবাই। আমার ব্যাপারটা অবশ্য অন্যরকম। জাহাজ চালানোর কায়দা কানুন শিখতে শিখতে কোন দিক দিয়ে যে দিন কেটে যায় আমি টের পাই না। লেফটেন্যান্ট ব্লাই নিজে শেখাচ্ছেন ত্রিকোণমিতি আর নৌ-জ্যোতির্বিদ্যা। পাল খাটানো, দড়িদড়ার ব্যবহার, নোঙ্গর ওঠানো নামানো শিখছি মাস্টার ফ্রায়ার এবং মাস্টারের মেট ক্রিশ্চিয়ানের কাছে। সারেং উইলিয়াম কোল আর তার সহকারী জেমস মরিসনের কাছে শিখছি জাহাজ চালানোর কৌশল।

একটানা চব্বিশ দিন আবহাওয়া খারাপ থাকার পর বাইশ ডিসেম্বর বিকেলে আকাশ পরিষ্কার হলো। দিক বদলে বাতাস বইতে লাগল পুব মুখে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল নাবিকরা। অলস দিনের অবসান হলো বোধহয়।

পরদিন ভোরে সারেং-এর শিঙার আওয়াজ আর মরিসনের চিৎকার শুনে যখন ঘুম ভাঙল তখনও রাতের আঁধার কাটেনি। ঝটিতি ডেকে এসে দেখি, বেশির ভাগ নাবিক পৌঁছে গেছে যার যার জায়গায়। ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস বেশ জোরে বইছে ফরাশি উপকূলের দিক থেকে। মাস্টার ফ্রায়ার ও সহকারী মাস্টার ক্রিশ্চিয়ানকে নিয়ে কোয়ার্টার ডেকে দাঁড়িয়ে আছেন লেফটেন্যান্ট ব্লাই। নোঙ্গর তোলার কাজে ব্যস্ত কয়েকজন খালাসী।

'উপরের পালগুলো ঢিলে করে দাও!' ফ্রায়ারের নির্দেশ শুনতে পেলাম।

আমার কাজের জায়গা নির্দিষ্ট হয়েছে পেছনের মাস্তুলের ওপরে। মাস্টারের নির্দেশ শুনে তাড়াতাড়ি উঠতে শুরু করলাম আমি। ওপরে উঠে দেখি কয়েকজন নাবিক আগেই পৌঁছে গেছে সেখানে। চামড়ার যে লম্বা খাপের ভেতর পাল মুড়ে রাখা হয় সেটার মুখ খোলার জন্যে টানা হ্যাঁচড়া করছে ওরা। চামড়ার বাঁধনীগুলো হিমে জমে গেছে। সহজে খুলতে চাইছে না। সেজন্যেই এই টানা হ্যাঁচড়া। এদিকে দেরি দেখে নিচ থেকে ব্লাই চিৎকার করে উঠেছেন:

'করছ কি তোমরা, অ্যাঁ? ঘুমিয়ে গেছ নাকি? এতক্ষণ লাগে ওইটুকু একটা পাল খুলতে?'

অবশেষে খুলল ছোট্ট পালটা। বাতাস লেগে ফুলে উঠল। মৃদু একটু ঝাঁকুনি খেলো বাউন্টি। ইতোমধ্যে নোঙ্গর তোলা হয়ে গেছে। চলতে শুরু করল জাহাজ।

ক্যাপ্টেনের নির্দেশে একে একে অন্য পালগুলোও মেলে দেয়া হলো।

'বড় পালটা একটু ঘুরিয়ে দাও!' ব্লাই-এর নির্দেশ শোনা গেল। 'বাতাসের দিকে! হ্যাঁ, হয়েছে! সামনের মাস্তুলের ছোট পালটা সোজা করে দাও।...'

এমনি ধরনের আদেশ নির্দেশ চলতে লাগল। সেই সাথে খালাসীদের, নাবিকদের দড়িদড়া টানাটানির সময়, 'হেইও হো! হেইও হো!' চিৎকার।

ধীরে ধীরে স্বচ্ছন্দ হয়ে এল বাউন্টির গতি। চিৎকার চেঁচামেচি কমতে

কমতে থেমে গেল একসময়। জাহাজ এগিয়ে চলল খোলা সাগরের দিকে।

নির্মেঘ আকাশে সূর্য উঠল। চমৎকার শীতের সকাল। স্বচ্ছ, ঠাণ্ডা, ঝলমলে। মাস্তুলের মাথা থেকে নেমে এসেছি কিছুক্ষণ আগে। এখন দাঁড়িয়ে আছি রেলিং-এ হেলান দিয়ে। ঝুঁকে পড়ে দেখছি সাগরের লোনা জল কেটে বাউন্টির এগিয়ে যাওয়া।

সেদিনই সন্ধ্যায় বাতাস বাড়তে বাড়তে ঝড়ের রূপ নিল। বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল সাগর। কিন্তু পরদিন ভোর হতে না হতেই আবার আগের মত শান্ত। যেন আমাদের ক্রিস্টমাস উদযাপনের সুযোগ দেয়ার জন্যে ঝড় এসেও এল না। চব্বিশ তারিখ মধ্যরাত থেকেই উৎসবের আমেজ লাগল বাউন্টিতে। ক্যাপ্টেনের নির্দেশে অতিরিক্ত মদ সরবরাহ করা হলো। পরদিন দুপুরে বিশেষ ভোজের ব্যবস্থা হলো।

জাহাজী বন্ধুদের সাথে আমার জানা-শোনার পর্ব চলছে এখনও। একটু একটু করে অপরিচিত লোকগুলো সব আপন হয়ে উঠছে। নিচের ডেকে একটা বার্থে থাকতে দেয়া হয়েছে আমাকে। হেওয়ার্ড, স্টুয়ার্ট আর ইয়ংও থাকে একই বার্থে। আমার খাওয়ার ব্যবস্থাও ওই তিনজনের সাথে মেস করে। চারজন রাতে শোয়ার জন্যে ব্যবহার করি চারটে হ্যামক। দিনে বড় একটা সিন্দুককে বানাই খাওয়ার টেবিল; ছোট ছোট কয়েকটা বাক্স কাজ করে চেয়ারের। এক জায়গায় ঘুমাই এবং খাই বলে স্বাভাবিক ভাবেই এই তিনজনের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা অন্যদের চেয়ে একটু বেশি হয়েছে।

খালাসী মাইকেল বায়ার্ন চমৎকার বাঁশি বাজায়। লোকটা প্রায় অন্ধ। কি করে যেন ও ওর এই অন্ধত্ব সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল। বাউন্টি গভীর সমুদ্রে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত কেউ টের পায়নি। যখন পেল তখন আর ওকে তীরে রেখে আসার উপায় নেই। ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার পর ভীষণ রেগে গেলেন মিস্টার ব্লাই। পারলে তখনই ছুঁড়ে ফেলে দেন সাগরে। অন্য নাবিকরাও খেপে গেল। কিন্তু লাভ কি খেপলে? জ্যান্ত একজন মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় কি সাগরে ফেলে দেয়া সম্ভব? প্রথমদিন রাতে ডেকের ওপর যখন খালাসীরা হল্লা করতে করতে মদ খাচ্ছে তখন আপন মনে ঝাঁশিটা বের করে জনপ্রিয় এক লোকগীতির সুর তুলল বায়ার্ন। মুহূর্তে থেমে গেল সব হৈ চৈ। মগে চুমুক দিতেও যেন ভুলে গেল সবাই। যতক্ষণ বায়ার্ন বাঁশি বাজাল একটা শব্দ করল না লোকগুলো। বাঁশি শেষ হতে সব এক সাথে এসে ঘিরে ধরল ওকে। ওর ওপর আর বিদ্বেষ রইল না কারও। ওর যে অন্ধত্ব ছিল ক্রোধের কারণ তা হয়ে উঠল সহানুভূতির ব্যাপার।

ক্রিসমাসের পর দিন আবার ঝড় এল। এবার আরও তীব্রতা নিয়ে। ঝড়ের শুরুতেই বিরাট এক ক্ষতি হয়ে গেল আমাদের। বিয়ারের বড় বড় কয়েকটা পিপে ভেসে গেল পানিতে। পিপেগুলো ডেকের এক পাশে রাখা ছিল। বিশাল এক ঢেউ যখন বাউন্টির ওপর ভেঙে পড়ে তখন ওগুলোর কয়েকটা ভেসে যায় সাগরে। জাহাজের তিনটে নৌকাও আরেকটু হলে দড়ির বাঁধন ছিঁড়ে ভেসে

যাচ্ছিল। কয়েকজন খালাসীর চেষ্টায় বেঁচে যায় ওগুলো। বাউন্টির সম্বল বলতে ওই তিনটে নৌকা। ভেসে গেলে কি যে হত বলা মুশকিল। হয়তো ওই দিনই ফিরতি পথে রওনা হতে হত আমাদের। নৌকা ছাড়া দক্ষিণ সাগরের দ্বীপগুলোয় অবতরণ এক কথায় অসম্ভব।

ঢেউটা যখন ভেঙে পড়ে আমি তখন নিচে, আমাদের সার্জন ওল্ড ব্যাকাস-এর সাথে আলাপ করছি তাঁর কেবিনে বসে। অদ্ভুত লোক এই ওল্ড ব্যাকাস। একটা পা কাঠের। তুষারশুভ্র চুল, নীল চোখ। মুখ দেখলে মনে হয় সব সময় রেগে আছেন, অথচ আশ্চর্য নরম তাঁর মন। ডাক্তারী পাস করেই ভদ্রলোক যোগ দিয়েছিলেন জাহাজের চাকরিতে। তার পর থেকে জাহাজেই আছেন। হাসতে হাসতে আমাকে বললেন, 'বুঝলে হে, বিয়্যাম, ডাঙার জীবন যে কেমন ভুলেই গেছি জাহাজে থাকতে থাকতে।'

ওল্ড ব্যাকাস-এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ দুই বন্ধু উদ্ভিদবিজ্ঞানী মিস্টার নেলসন আর গোলন্দাজ পেকওভার। যুদ্ধ জাহাজের গোলন্দাজদের কাজের অন্ত নেই। কিন্তু বাউন্টি নামে যুদ্ধ জাহাজ হলেও কাজে বাণিজ্য জাহাজের চেয়ে বেশি কিছু নয়। তাই উইলিয়াম পেকওভারের সময় কাটে অলসভাবে। নিয়ম মাফিক সাধারণ কিছু তদারকি ছাড়া আর কিছু করতে হয় না তাকে। উদ্ভিদবিজ্ঞানী নেলসনও আপাতত কর্মহীন। রুটিফলের চারা জাহাজে ওঠানোর পর শুরু হবে তাঁর কাজ। মিস্টার নেলসন বয়স্ক লোক। একটু চুপচাপ ধরনের। মাথা ভর্তি ধূসর চুল। সার্জনের সঙ্গে গল্প করে খুব মজা পান তিনি।

একটা বাক্সকে টুল বানিয়ে বসেছে পেকওভার। আমি আরেকটা বাক্সে। সার্জন আর উদ্ভিদবিজ্ঞানী বসেছেন বিছানায়। ঢেউয়ের দোলায় দুলছে জাহাজ। বাতাসের ঝাপটায় কেঁপে উঠছে মাঝে মাঝে। এর ভেতরেই আলাপ করছি আমরা। নাবিক হিসেবে নতুন আমি। জাহাজের দুলুনি ভয় পাইয়ে দিলে যদিও, তবু শান্তই রেখেছি মুখটাকে। নানা বিষয়ে কথা হতে হতে এক সময় সার্জনের কাঠের পায়ের প্রসঙ্গ উঠল। আমার কৌতূহল মেটানোর জন্যে বহুবার বলা গল্পটা আবার বললেন ওল্ড ব্যাকাস—কবে, কোথায়, কেমন করে আসল পা-টা তিনি খুইয়েছিলেন। সব শেষে নেলসনের দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন, 'আমাদের এই পার্সেল, বুঝলেন, ছুতোর মিস্ত্রী হিসেবে জুড়ি নেই ওর।'

'কি করে বুঝলেন? কাজ দেখানোর কোন সুযোগই তো ও এখনও পায়নি।'

'পেয়েছে, পেয়েছে!' রহস্যময় একটু হাসি হাসলেন সার্জন। 'আমার এই পা-টা ও-ই তৈরি করে দিয়েছে। একেবারে নিখুঁত কাজ। আমি বুঝতেই পারি না এটা আমার আসল পা না নকল। উহ্ আগেরটা যা ভুগিয়েছে···!'

আচমকা কেঁপে উঠল বাউন্টি। ওপর থেকে ভেসে এল খালাসীদের আর্তরব: 'গেল! গেল! গেল!' তারপর অস্পষ্ট একটা চিৎকার: 'সবাই ডেকের ওপর!' লাফ দিয়ে ছুটলাম ওপরে। ডেকে উঠতেই বাতাসের তীব্র ঝাপটা লাগল চোখে মুখে।

ব্লাইকে দেখলাম, পেছনের মাস্তুলের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। পাশে

ফ্রায়ার। চিৎকার করে সহকারীদের নানা রকম নির্দেশ দিচ্ছে সে। টালমাটাল অবস্থা জাহাজের। একবার এদিকে হেলে পড়ছে, একবার ওদিকে। তীব্র বাতাস ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলতে চাইছে পাল, মাস্তুল, দড়িদড়া। খালাসীরা প্রাণপণে পালের দড়ি কষে বাঁধার চেষ্টা করছে। এই সময় আমি দেখতে পেলাম বিশাল ঢেউটা। প্রায় উঠে পড়েছে জাহাজের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে হুইলে দাঁড়ানো লোকটার উদ্দেশ্যে চিৎকার করলেন ব্লাই। 'ত্রিশ ডিগ্রি ঘুরিয়ে দাও হাল! ডান দিকে!' তারপর মাস্তুলের মাথার দিকে তাকিয়ে: 'এই, তোমরা, উপরে! পালগুলো অর্ধেক করে গুটিয়ে ফেল! জলদি, ঢেউটা এসে পড়ার আগেই!'

ব্লাইয়ের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম আমি। ঢেউয়ের মাথায় উঠিয়ে ফেলতে চাইছেন বাউন্টিকে। কিন্তু সে সুযোগ তিনি পেলেন না। ঢেউটা আছড়ে পড়ল জাহাজের ওপর। আচমকা নিজেকে আমি আবিষ্কার করলাম পানির নিচে। তীব্র টান অনুভব করলাম শরীরে। ভাগ্য ভাল ঢেউটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে একটা দড়ি ধরে বসেছিলাম। না হলে ঢেউয়ের তোড়ে ভেসে যেতাম নিশ্চয়ই। কতক্ষণ যে পানির তলে রইলাম জানি না। বাতাসের অভাবে যখন ফুসফুস ফেটে যেতে চাইছে তখন হঠাৎই সরে গেল পানি। প্রাণ ভরে শ্বাস নিয়ে বাঁচলাম। একটু সুস্থির হয়ে তাকিয়ে দেখি ডেকের কোণে জড় করে রাখা বিয়ারের পিপেগুলো নেই। নৌকা তিনটেও যেখানে ছিল সেখানে আর নেই, উল্টে পড়ে আছে রেলিংয়ের পাশে। কয়েক জন খালাসী প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছে ওগুলোর রশি। আরও কি ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে হিসেব নিতে গিয়ে দেখা গেল, বাউন্টির পেছন দিকটায় ফাটল দেখা দিয়েছে কয়েকটা। সেইসব ফাটল দিয়ে নোনা পানি ঢুকছে ভাঁড়ার ঘরে। আমাদের খাবার দাবারের বড় একটা অংশ নষ্ট হয়ে গেছে।

উনচল্লিশ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশে পৌঁছার পর ঝড় থেমে গেল। পরিষ্কার আকাশে ঝলমল করে উঠল সূর্য। সব ক'টা পাল তুলে দিয়ে টেনেরিফের দিকে চলল আমাদের জাহাজ।

জানুয়ারির চার তারিখে মরিশাসগামী এক ফরাশি বাণিজ্য জাহাজের সাথে দেখা হলো আমাদের। পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার সময় একদম ওপরের পালগুলো নামিয়ে ওটার নাবিকরা সম্মান জানাল বাউন্টিকে। পরদিন ভোরে, আমাদের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রায় বারো লিগ দূরে দেখতে পেলাম টেনেরিফ দ্বীপকে। টেনেরিফের ছোট্ট বন্দর সান্তাক্রুজের দিকে জাহাজ চালানোর নির্দেশ দিলেন ব্লাই। সান্তাক্রুজ উপকূলে পৌঁছুতে সময় লাগল পুরো একদিন এক রাত। অবশেষে নোঙ্গর ফেললাম আমরা একটা স্প্যানিশ আর একটা আমেরিকান জাহাজের কাছে।

পাঁচ দিন এখানে নোঙ্গর ফেলে রইলাম আমরা। এবং এখানেই রোপিত হলো অসন্তোষের বীজ, যে অসন্তোষের কারণে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় বাউন্টির এই যাত্রা।

ঝড় থেমে গেলেও প্রাকৃতিক নিয়মেই সান্তাক্রুজের উপকূল তখন

অশান্ত। বিরাট বিরাট ঢেউ ভেঙে পড়ছে বালুকাবেলায়। দর দাম করে বেশ কয়েকটা উপকূলীয় নৌকা ভাড়া করলেন লেফটেন্যান্ট ব্লাই। এবং নৌকার মাঝিদেরকে দায়িত্ব দিলেন আমাদের পানি এবং খাবার দাবার সরবরাহের। নিজের লোকদের উদয়াস্ত ব্যস্ত রাখলেন ঝড়ে জাহাজের যে ক্ষতি হয়েছে তা মেরামতের কাজে। এখানেই শুরু অসন্তোষের। আমাদের কিছু নাবিক আশা করেছিল নৌকাগুলো মেরামত করে একদিনের জন্যে হলেও তীরে যাবে। নিজেরা পছন্দ করে কিনে আনবে খাবার দাবার, মদ; সবচেয়ে বড় যেটা–প্রায় দেড়মাস পর অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে হলেও পা ব্লাখতে পারবে ডাঙার মাটিতে। কিন্তু ক্যাপ্টেনের সিদ্ধান্ত যখন ওদের এই আশার গুড়ে রালি ঢেলে দিল তখন ক্ষুব্ধ না হয়ে পারল না ওরা।

নোঙ্গর ফেলার পর প্রথম যেদিন ডাঙা থেকে খাবার এল, সেদিন থেকেই নোনা মাংসের বদলে তাজা মাংস পরিবেশন শুরু হলো খাবার সময়। এই ঘটনায় অসন্তোষ একটু বাড়ল নাবিকদের ভেতর। বউন্টির নুন দেয়া মাংস খুব একটা সুস্বাদু কিছু নয়। আমার ধারণা দুনিয়ার সবচেয়ে বাজে নোনা মাংস ওগুলো–কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, টেনেরিফ থেকে এনে যে তাজা মাংস আমাদের খাওয়ানো হলো তার মান আরও খারাপ। কয়েকজন নাবিক তো ঘোষণাই করে বসল, এ মাংস মরা ঘোড়া বা খচ্চরের না হয়েই যায় না। মাস্টারের কাছে অভিযোগ করল তারা, এ মাংস খাওয়ার অনুপযুক্ত।

অভিযোগগুলো যথাসময়ে ক্যাপ্টেনের কানে তুলল ফ্রায়ার। শুনে ভয়ানক রেগে গেলেন ব্লাই। সবাইকে ডেকের ওপর জড় করে বলে দিলেন, হয় তারা তাজা মাংস খাবে, নয় তো না খেয়ে থাকবে। ফল হলো রান্না করা তাজা মাংসের বেশির ভাগই নাবিকরা ছুঁড়ে ফেলে দিল সাগরে। অনেকে ক্যাপ্টেনের সামনেই করল কাজটা। রাগে ভেতরে ভেতরে টগবগ করে ফুটলেও ওপরে কোন ভাবান্তর দেখালেন না ব্লাই।

টেনেরিফ থেকে রওনা হবার পর পরই জাহাজের নাবিকদের তিনটে চৌকিতে (Watch) বিভক্ত করলেন ব্লাই। এতদিন নাবিকরা বারো ঘণ্টা করে কাজ করত, এখন থেকে করবে আট ঘণ্টা করে। মাস্টারের মেট ক্রিশ্চিয়ানকে পদোন্নতি দিয়ে ভারপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট করলেন, এবং তৃতীয় চৌকির দায়িত্ব দিলেন তাকে (সুষ্ঠুভাবে জাহাজ পরিচালনার স্বার্থে এ ধরনের পদোন্নতি দেয়ার ক্ষমতা ব্লাইকে দিয়েছে অ্যাডমিরালটি)। জাহাজের সবাই ক্রিশ্চিয়ানকে ব্লাইয়ের বন্ধু বলেই জানে। যদিও সেই বন্ধুত্বের স্বরূপ বড় অদ্ভুত। একদিন যদি ব্লাই ক্রিশ্চিয়ানকে ডেকে নিজের সঙ্গে খাওয়ান তো পর দিনই সবার সামনে তাকে রুক্ষ ভাষায় গালিগালাজ করেন; কখনও কখনও বিনা কারণে। ব্লাই খ্যাপাটে স্বভাবের মনে করে ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে ক্রিশ্চিয়ান। তবে পদোন্নতি দিয়ে সত্যি সত্যিই ক্রিশ্চিয়ানের মস্তবড় একটা উপকার করেছেন ব্লাই। সব কিছু যদি ঠিকঠাক মত থাকে, ক্রিশ্চিয়ান যদি শেষ পর্যন্ত ব্লাইয়ের মন জুগিয়ে চলতে পারে তাহলে দেশে ফেরার পর অ্যাডমিরালটি ওর পদোন্নতিটা পাকাপাকি ভাবে বহাল করবে। সাধারণত এমনই ঘটে থাকে।

অর্থাৎ ক্রিশ্চিয়ান এখন থেকে অফিসার। শুধু অফিসারই নয়, ফ্রায়ারের সমমর্যাদার অফিসার। কাল যে অধীনস্থ ছিল আজ তাকে সহযোগী হিসেবে দেখতে কারই বা ভাল লাগে? ফ্রায়ারেরও লাগল না। বাইরে কিছু প্রকাশ না করলেও ভেতরে ভেতরে ভয়ানক ক্ষুব্ধ হলো সে—পদোন্নতি পেয়েছে বলে ক্রিশ্চিয়ানের ওপর, আর পদোন্নতি দিয়েছেন বলে ব্লাইয়ের ওপর। অসন্তোষের আরেকটা বীজ রোপিত হলো এভাবে।

জাহাজের প্রতিটা লোককে ডেকের ওপর ডেকে ক্রিশ্চিয়ানের পদোন্নতির খবর শোনালেন ব্লাই, এবং জানিয়ে দিলেন, এখন থেকে ওকে অফিসার হিসেবে মেনে চলতে হবে। এরপর কিছু কথা তিনি বললেন নাবিকদের উদ্দেশ্যে:

'প্রথমেই আমরা একমাস পিছিয়ে গেছি প্রতিকূল বাতাসের কারণে,' শুরু করলেন ব্লাই। 'তারপর ঝড়েও বেশ কিছু দিন সময় নষ্ট হয়েছে। ঝড় আমাদের সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটা করেছে, আমাদের ভাণ্ডারের প্রায় অর্ধেক খাবার নষ্ট করে দিয়েছে, মদেরও একটা বড় অংশ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কত দিন আমাদের সাগরে থাকতে হবে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। সামনে আবার ঝড়ে পড়ে আরও সময় নষ্ট হতে পারে, আরও খাবার নষ্ট হতে পারে। তাহিতি থেকে রুটিফলের চারা সংগ্রহের জন্যে আমরা যে সময় হিসেবে ধরেছি বাস্তবে লেগে যেতে পারে তার চেয়ে বেশি। দেড় বছরের মত খাবার আমরা সঙ্গে এনেছিলাম, কিন্তু দেড় মাসেই তা কমে এক বছরের পরিমাণে নেমে এসেছে। সুতরাং এখন থেকেই যদি মিতব্যয়ী না হই, শেষ পর্যন্ত হয়তো বিপদে পড়ে যাব আমরা। তাই আমি আজ থেকে আমাদের মাথাপিছু রুটির বরাদ্দ দুই তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছি।'

মিতব্যয়িতার প্রয়োজন উপলব্ধি করে সবাই সানন্দে মেনে নিল এ নির্দেশ। কিন্তু নোনা মাংস আর শুয়োরের মাংস সম্পর্কে ওদের অভিযোগ রয়েই গেল।

আমাদের জাহাজে কোন ভাণ্ডার রক্ষক নেই। কেরানী স্যামুয়েলের সহযোগিতায় ব্লাই নিজেই চালিয়ে নেন কাজটা। ছোট খাটো মানুষ স্যামুয়েল। চেহারায় ইহুদি ইহুদি ভাব। সবার বিশ্বাস লোকটা ক্যাপ্টেনের টিকটিকি। জাহাজের কোথায় কি হচ্ছে—সব কিছুর ওপর সে চোখ রাখে এবং সময় মত জানায় ক্যাপ্টেনকে। এ কারণে জাহাজের সবাই তাকে অপছন্দ করে। অনেকে মনে করে এই স্যামুয়েলের সহযোগিতায় লেফটেন্যান্ট ব্লাই জাহাজের জিনিসপত্র চুরি করেন। যদি তা না হয় তাহলে বলতে হবে ব্লাইয়ের প্রশ্রয়ে স্যামুয়েলই চুরি করে। বাবুর্চিদের কাছে খাবার দাবার সরবরাহের দায়িত্ব স্যামুয়েলের। প্রত্যেক বার যখন সে নুন দেয়া মাংস বের করে, সবচেয়ে ভাল অংশটা রেখে দেয় কেবিনের জন্যে (কেবিনের জন্যে মানে ক্যাপ্টেন ও তার সহভোজীদের জন্যে)। বাকিটুকু, মানের দিক থেকে তা যেমনই হোক, না মেপে দিয়ে দেয় বাবুর্চিদের কাছে। দেয়ার সময় না মাপলেও মুখে একটা ওজনের কথা ঘোষণা করে স্যামুয়েল, এবং খাতায় লিখে রাখে ওজনটা।

হয়তো দেখা গেল 'চার পাউন্ড' ঘোষণা করে যে মাংস সে দিল তার ওজন কিছুতেই তিন পাউন্ডের বেশি হবে না। কিন্তু খাতায় লিখে রাখল চার পাউন্ড মাংস বেরিয়ে গেল ভাঁড়ার থেকে। এ সম্পর্কে কেউ কোন প্রশ্ন বা প্রতিবাদ করতে গেলে নির্ঘাত দুর্ভোগ পোহাতে হবে তাকে। শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা ব্লাই নেবেনই প্রতিবাদকারীর বিরুদ্ধে।

কয়েকদিন পরেই এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে আমরা যারা ব্লাইয়ের সমর্থকও নই আবার বিরোধীও নই–অর্থাৎ নিরপেক্ষ তারা বিরাট এক প্রশ্নের মুখোমুখি হলাম।–সত্যিই কি এতখানি নীচ স্বভাবের মানুষ ব্লাই?

সেদিন সকালে আবহাওয়া খুব ভাল। বাউন্টির প্রধান হ্যাচ তুলে রোদে দেয়ার জন্যে বের করে আনা হয়েছে আমাদের পনিরের মওজুদ। ঢাকনা খুলে দেয়া হয়েছে সবগুলো পিপের। ব্লাই নিজে তদারক করছেন কাজটা। হঠাৎ তাঁর চোখ গেল একটা পিপের দিকে। পাউন্ড পঞ্চাশেক ওজনের দুটো পনির উধাও হয়ে গেছে তার ভেতর থেকে। দ্রুত পিপেটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ব্লাই। ঝুঁকে ভাল করে দেখলেন। তারপর আর্তনাদের মত তাঁর গলা দিয়ে বেরিয়ে এল: 'ওহ্, ঈশ্বর! চুরি গেছে!'

কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল খালাসী হিলব্রান্ড্ট্। সে বলল, 'না, স্যার, চুরি যাবে কেন?–আমরা যখন ডেপটফোর্ডে তখন এই পিপেটা খোলা হয়েছিল। আপনিই তো বলেছিলেন খুলতে। পনির দুটো, স্যার, তখন তীরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।'

'চুপ! বদমাশ!'

ক্রিশ্চিয়ান আর ফ্রায়ার ছিল কাছেই। তাদের দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি হেনে ব্লাই বলে চললেন, 'সব চোর। একেবারে দল ধরে! তোমরা সবাই ষড়যন্ত্র করছ আমার বিরুদ্ধে–অফিসার, নাবিক–সব। কিন্তু আমিও বলছি, সব ক'টাকে পোষ মানিয়ে তবে ছাড়ব, খোদার কসম বলছি।' হিলব্রান্ড্ট্-এর দিকে তাকালেন তিনি। 'আর একটা কথাও যদি শুনি তোর মুখে, চাবকে পিঠের চামড়া তুলে নেব, কথাটা মনে রাখিস।' ঘুরে নিচে নামার সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন ব্লাই। তারপর আবার চিৎকার, 'মিস্টার স্যামুয়েল! এক্ষুণি ডেকে এসো!'

দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে ডেকের ওপর উঠে এল স্যামুয়েল। বিগলিত ভঙ্গিতে তাকাল ক্যাপ্টেনের দিকে।

'পঞ্চাশ পাউন্ডের দুটো পনির চুরি গেছে,' বললেন ব্লাই। 'একশো পাউন্ড পনির খেতে যতদিন লাগে ততদিন পনির দেয়া বন্ধ রাখবে–সাধারণ নাবিক, অফিসার সবাইকে!'

স্পষ্ট দেখতে পেলাম অসন্তোষের ছাপ পড়ল ক্রিশ্চিয়ান এবং ফ্রায়ারের মুখে। কিন্তু কেউ কিছু বলল না। দু'জনই বুঝতে পারছে এখন প্রতিবাদ করলে কি ফল হবে।

সেদিন থেকেই খাওয়ার সময় পনির সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হলো। তবে মাখন সরবরাহ চালু রাখা হলো। ফল হলো মাখন নিতে অস্বীকার করল

নাবিকরা। তাদের বক্তব্য পনির ছাড়া মাখন নেয়ার অর্থ চুরির অভিযোগ স্বীকার করে নেয়া। জন উইলিয়ামস নামের এক খালাসী তো ফোকাস্‌ল-এ সবার সামনে ঘোষণাই করে বসল, সে নিজে ছোট এক পিপে ভিনেগার এবং আরও কিছু টুকটাক জিনিস সহ পনির দুটো পৌঁছে দিয়ে এসেছিল মিস্টার ব্লাইয়ের বাড়িতে।

এরপর আমার মত নতুন যারা, যারা স্রেফ ক্যাপ্টেন কুকের সঙ্গী ছিল বলে দেবতার আসনে তুলে বসে আছে ব্লাইকে তাদের মনের অবস্থা কেমন হতে পারে পাঠকরাই অনুমান করে নিন।

তিন

কয়েক দিন পর এক বিকেলে ব্লাই তাঁর ভৃত্যকে পাঠিয়ে আমাকে খবর দিলেন যেন রাতে তাঁর সাথে খাই।

সন্ধ্যার পর একটু বিশেষ সাজ সজ্জা করে গেলাম ক্যাপ্টেনের কেবিনে। দেখলাম ক্রিশ্চিয়ানকেও সঙ্গে খেতে বলেছেন ব্লাই। সাধারণত সার্জন ওল্ড ব্যাকাস আর মাস্টার ফ্রায়ার ব্লাইয়ের সাথে এক মেসে খাওয়া দাওয়া করেন। আজ সার্জনকে অনুপস্থিত দেখলাম।

ক্যাপ্টেনের টেবিলে চমৎকার চমৎকার বাসন পেয়ালার প্রদর্শনী বসেছে যেন। কিন্তু ঢাকনাগুলো ওলটাতেই খেয়াল করলাম সাধারণ নাবিকদের চেয়ে মোটেই উন্নত নয় খাবারগুলো। নুন দেয়া গরুর মাংস–এটাই পরিমাণে সবচেয়ে বেশি, জঘন্য মাখন, আরও জঘন্য পনির–আমি নিজের চোখে ওগুলোর ভেতর থেকে লাল লাল পোকা বের করতে দেখেছি; খানিকটা নোনা বাঁধাকপি–স্কার্ভি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে এটাই একমাত্র উপাদান আমাদের খাদ্য তালিকায়; আর বড় একটা বাসনে ঢিবি করা সেদ্ধ মটর কলাই ভর্তা, বাউন্টির নাবিকরা যার নাম দিয়েছে 'কুকুরের শরীর'।

মদের গেলাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন ব্লাই, যেন এমন সুস্বাদু খাবার জীবনে আর কখনও দেখেননি–খাওয়া দূরে থাক। এমন ভঙ্গিতে তিনি খেতে লাগলেন, দেখলে যে কারও মনে তাঁর ভদ্রতাবোধ সম্পর্কে প্রশ্ন জাগবে। ফ্রায়ার লোকটা একটু রুক্ষ প্রকৃতির, সভ্যতা ভব্যতার ধার বড় একটা ধারে না, ক্রিশ্চিয়ানও অনেকটা তেমনি। তবু আমার মনে হলো ওরাও যেন লজ্জা পেল ক্যাপ্টেনকে অমন জঘন্য খাবার বুভুক্ষুর মত খেতে দেখে। ক্যাপ্টেনের ডান দিকে বসেছে ক্রিশ্চিয়ান, বাঁ দিকে ফ্রায়ার, আর আমি সামনে। কিছুক্ষণ সাধারণ টুকটাক আলাপের পর কথার মোড় ঘুরে গেল বাউন্টির নাবিকদের দিকে।

'জাহান্নামে যাক সব!' বললেন ব্লাই; মাংস আর কলাই ভর্তায় ভর্তি তাঁর মুখ, দ্রুত চিবোতে চিবোতে জড়িত কণ্ঠে কথা বললেন তিনি। 'সব ক'টা

বদমাশ, কুঁড়ের বাদশা! কি দেখে যে কর্তৃপক্ষ এদের বাছাই করল, বুঝতে পারি না…' চিবোনো খাবারটুকু গিলে ফেলে আরেক গ্রাস মুখে পুরলেন ব্লাই। 'ওই যে বদমাশটা–কাল যাকে চাবুক মারলাম, কি যেন নাম, মিস্টার ফ্রায়ার?'

প্রশ্নটা শুনে একটু লাল হলো মাস্টারের মুখ। বলল, 'বারকিট।'

'হ্যাঁ বারকিট, বেয়াদব কুকুর! বাকিগুলোও ওর মতই খারাপ। জাহাজের কাজ যদি এক বিন্দু বোঝে!'

'আমি কিন্তু, স্যার, আপনার সাথে একমত হতে পারছি না,' ফ্রায়ার সবিনয়ে বলল। 'স্মিথ, কুইনটাল, ম্যাককয় সবাই প্রথম শ্রেণীর নাবিক, এমন কি ওই বারকিটও, যদিও ছোকরা ভুল–'

'বেটা বেয়াদব কুকুর!' মাস্টারকে থামিয়ে দিয়ে গর্জে উঠলেন ব্লাই। 'সামান্য কোন অভিযোগও যদি পাই, আবার আমি ধরব বদমাশটাকে। পরের বার দুই নয়, চার ডজন লাগাব।'

ক্যাপ্টেন থামতেই ক্রিশ্চিয়ান বলল, 'আমার মত যদি চান, তাহলে বলব, দুর্ব্যবহারের চেয়ে সদয় ব্যবহার করেই বারকিটের মত মানুষদের পোষ মানানো সহজ…'

ওকে শেষ করতে না দিয়ে ব্লাই হেসে উঠলেন হা-হা করে। 'মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান, মেয়েদের স্কুলে মাস্টারি নিলেই ভাল করতে তুমি! হা-হা, সদয় ব্যবহার, তাই না?' গ্লাস তুলে চুমুক দিলেন তিনি। 'এসব উদ্ভট চিন্তা মাথা থেকে নামাও, ভাল ক্যাপ্টেন হতে পারবে তুমি। সদয় ব্যবহার, হা! আমাদের নাবিকরা গ্রীক যতটুকু বোঝে সদয় ব্যবহারের মর্যাদা ঠিক ততটুকু বোঝে। ওরা যা ভাল বোঝে তা হলো শাসন, কড়া শাসন! না হলে বিদ্রোহ আর দস্যুতা সাগরের নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াত।'

'তা অবশ্য ঠিক,' স্বীকার করল ফ্রায়ার।

কিন্তু মাথা নাড়ল ক্রিশ্চিয়ান। 'আমি মানতে পারছি না কথাটা,' বিনয়ের সাথে সে বলল। 'আর দশজন ইংরেজের সাথে কোন পার্থক্য নেই আমাদের নাবিকদের। কিছু কিছু লোক আছে সত্যিই যাদের কড়া শাসনে রাখতে হয়, তবে ভাল লোকও আছে যারা দয়ামায়াওয়ালা যোগ্য নেতার নেতৃত্বে নির্ভয়ে মৃত্যুর মুখে পর্যন্ত যেতে দ্বিধা করবে না।'

'তেমন কোন লোক আছে আমাদের জাহাজে?' নাক সিঁটকানো ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন ব্লাই।

'আমার মনে হয় আছে, স্যার,' আগের মতই বিনীত কণ্ঠে বলল ক্রিশ্চিয়ান, 'এবং সংখ্যায় তারা খুব কম নয়।'

'সত্যিই! একজনের নাম করো তো!'

'ছুতোর মিস্ত্রী মিস্টার পার্সেল। লোকটা…'

এবার আগের চেয়ে অনেক উচ্চস্বরে, এবং বেশিক্ষণ ধরে হাসলেন ব্লাই। 'সত্যিই মানবচরিত্র বিচারে তোমার জুড়ি মেলা ভার, ক্রিশ্চিয়ান! ওই মাথামোটা বুড়ো বদমাশটা! হা-হা, সদয় ব্যবহার…খুব ভাল বলেছ!'

মুহূর্তে রক্ত উঠে এল ক্রিশ্চিয়ানের মুখে। অনেক কষ্টে রাগ সামলে সে

বলল, 'বুঝলাম পার্সেলকে আপনার পছন্দ নয়। তাহলে মরিসন।'

'মরিসন! মানে সারেঙের মেট? নেকড়ের চামড়া গায়ে ভেড়া? বলছ এদের সাথে সদয় ব্যবহার করতে হবে?'

'নেকড়ের চামড়া গায়ে ভেড়া কি না জানি না, স্যার,' বলল ফ্রায়ার, 'এটুকু জানি, ভাল নাবিক মরিসন। মিডশিপম্যান ছিল, তাছাড়া ওর জন্মও ভদ্র ঘরে।'

'জানা আছে আমার!' ব্যঙ্গের সুরে বললেন ব্লাই। 'তোমরা যে যা-ই বলো আমার মত বদলাবে না। মরিসনকে সাবধান থাকতে বোলো! ওর দিকে নজর রাখছি আমি। একটু বেচাল দেখলেই এমন শিক্ষা দেব···। কি বলছিলে?—ভদ্র ঘরের ছেলে? মানে চামড়াটা বারকিটের মত পুরু নয়? তাহলে তো আরও বেশি সাবধান থাকতে বলবে। ওর সারেঙও ওকে বাঁচাতে পারবে না।'

খেতে খেতে আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করলাম ক্যাপ্টেন এবং মাস্টারকে। কিছুক্ষণের ভেতর কোন সন্দেহ রইল না ক্যাপ্টেনকে অপছন্দ করে ফ্রায়ার, পনির নিয়ে সেই ব্যাপারটা সে ভুলতে পারেনি। ব্লাইও অপছন্দ করেন তাঁর মাস্টারকে; সবচেয়ে বড় কথা, সেটা তিনি গোপন করার চেষ্টা করছেন না মোটেই। ক্রিশ্চিয়ানকেও তিনি পছন্দ করেন না, সেটাও লুকানোর চেষ্টা করছেন না। ভাবখানা তোমাদের আমি অপছন্দ করি এর ভেতর লুকোচুরির কি আছে?

কয়েকদিন পরে ওল্ড ব্যাকাস-এর কাছে শুনলাম, ক্যাপ্টেনের সাথে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে মাস্টার। অবাক হলাম না শুনে। এমন কিছু ঘটবে, আমি আন্দাজ করতে পারছিলাম।

বিষুবরেখা পার হয়ে এসেছে বাউন্টি।

টেনেরিফ থেকে প্রচুর কুমড়ো নিয়েছিলাম আমরা খাওয়ার জন্যে। বিষুবীয় অঞ্চলের উত্তাপে এবার সেগুলোয় পচন ধরল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেগুলো শেষ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ব্লাই। রুটির বদলে নাবিকদের কুমড়ো সরবরাহের হুকুম দিলেন স্যামুয়েলকে; তাও দু'পাউন্ড রুটির বদলে এক পাউন্ড কুমড়ো। স্বভাবতই ব্যাপারটা পছন্দ হলো না কারও। কুমড়ো নিতে অস্বীকার করল সবাই। যথারীতি স্যামুয়েল গিয়ে খবরটা জানাল ক্যাপ্টেনকে। সবাইকে ডেকে জড় হওয়ার নির্দেশ দিলেন ব্লাই।

'আমি দেখতে চাই, কার এত বড় সাহস যে কুমড়ো নিতে অস্বীকার করে!' ক্রুদ্ধ বাঘের মত গর্জে উঠলেন তিনি। 'কুমড়ো তো ভাল জিনিস, আমি যা দেব তা-ই খেতে হবে, বদমাশের দল! যদি ঘাস দেই, তা-ও খেতে হবে। কি করে তোমাদের শায়েস্তা করতে হয় আমি জানি!'

এবার আর কেউ অস্বীকার করল না কুমড়ো নিতে। তবে নিল ঠিকই কিন্তু বেশির ভাগই ফেলে দিল পানিতে।

দু'এক দিনের ভেতরই আরেকটা গুঞ্জন উঠল, বিশেষ করে অফিসারদের ভেতর, মাংসের পিপেগুলোয় যে পরিমাণ মাংস থাকা উচিত আছে তার চেয়ে কম এবং এই কমটুকু পুষিয়ে নেয়ার জন্যে নাবিকদের সরবরাহ করার সময়

কম দেয়া হয় ওজনে। অনেক দিন ধরেই ব্যাপারটা নিয়ে কানাঘুষা চলছিল, এবার সরব হয়ে উঠল সবাই। তদন্ত করে ব্যাপাটার সুরাহা করার আবেদন জানাল ওরা মাস্টারের কাছে। আবার সবাইকে ডেকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলেন ব্লাই।

'মিস্টার ফ্রায়ারের কাছে অভিযোগ করেছ, হ্যাঁ?' চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন তিনি। 'খাওয়া নিয়ে সন্তুষ্ট নও তোমরা! শোনো শেষ বারের মত আমি বলছি, খোদার কসম বলছি, সন্তুষ্ট হওয়ার চেষ্টা করো। মিস্টার স্যামুয়েল যা করে আমার নির্দেশে করে; বুঝতে পেরেছ? হ্যাঁ, আমার নির্দেশে করে। অভিযোগ করে লাভ হবে না। কোন প্রতিকারই কেউ করতে পারবে না। কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক আমি জানি। তোমাদের অভিযোগ শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে গেছি আমি। আর না। এর পর আর কোন অভিযোগ যে করবে; কোন কথা নেই, চাবকানো হবে তাকে। এ-ই আমার শেষ কথা। আশা করি মনে থাকবে সবার।'

প্রতিকারের আশা বৃথা বুঝতে পেরে সবাই চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করল। খাবার সম্পর্কে আর কোন অভিযোগ এর পর কেউ করেনি। তাই বলে নিজেদের ভেতর গুঞ্জন ওরা বন্ধ করেনি। স্যামুয়েলের সহযোগিতায় ভাল ভাল খাবার সব চুরি করে ওদেরকে ব্লাই খারাপ খাবার খাওয়াচ্ছে—এ ধরনের আলাপ ওদের ভেতর চলতেই থাকল।

ব্রাজিল উপকূল ছাড়িয়ে প্রায় একশো লিগ আসার পর বাতাস দিক বদলে বইতে লাগল উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিক থেকে। এর পর হঠাৎ বাতাস পড়ে গেল। তারপর হঠাৎই আবার বইতে শুরু করল। বুঝতে পারলাম, দক্ষিণ-পূর্ব বাণিজ্য বায়ুর শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি আমরা। বাতাসের এই নিত্য পরিবর্তনশীল এলাকায় দিন দুই পাল গুটিয়ে স্থির ভেসে রইল বাউন্টি। নাবিকরা সব মেতে উঠল মাছ ধরায়। বরাদ্দ সামান্য নোনা মাংসের খানিকটা বড়শিতে গেঁথে ছিপ ফেলল অনেকে; দু'একটা হাঙর বা বড়সড় মাছ যদি পাওয়া যায় এই আশায়।

হাঙর খাওয়ার কথা শুনে ডাঙার মানুষরা হয়তো নাক সিঁটকাবেন; কিন্তু যারা নাবিক, যারা একটু তাজা মাংস খেতে পাওয়ার আশায় দীর্ঘদিন হা পিত্যেস করে বসে থাকে তাদের কাছে হাঙরের মাংসও রীতিমত শখ করে খাওয়ার জিনিস।

অনেকের সঙ্গে বড়শি ফেলেছে গোলন্দাজের মেট জন মিলস। বছর চল্লিশেক বয়েস লোকটার। লম্বা, পেটা শরীর। জাহাজের একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে বড়শি ফেলেছে সে। পাশে দাঁড়িয়ে ছুতোর মিস্ত্রীর সহকারী নরম্যান আর উদ্ভিদবিজ্ঞানীর সহকারী ব্রাউন। মোটা রশির মাথায় বড়সড় বড়শি। টোপ হিসেবে দিয়েছে সারাদিনে খাওয়ার জন্যে যেটুকু নোনা মাংস পেয়েছে ওর মেস তার প্রায় পুরোটাই। বেশ কিছুক্ষণ রশি ধরে দাঁড়িয়ে থাকার পর ভাগ্য প্রসন্ন হলো মিলস-এর। ফুট দশেক লম্বা একটা হাঙর পিঠ উঁচিয়ে চলে গেল বাউন্টির

গলুইয়ের নিচ দিয়ে। রেলিংয়ের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়লাম আমি দেখার জন্যে।

কয়েক মুহূর্ত পরেই ছোট একটা ডোরাকাটা মাছ–দেখতে অনেকটা ম্যাকরেলের মত–লাফিয়ে উঠল জলের ওপর।

'পাইলট মাছ!' চিৎকার করে উঠল নরম্যান। 'সাবধান এবার আসবে হাঙরটা!'

'চুপ, গাধা!' ধমক দিল মিলস। 'বানরের মত লাফিও না অত–ভয় পাইয়ে দেবে তো ওকে!'

দেখা গেল হাঙরটাকে। ঝকঝকে নীল জলের বুকে নোংরা মনে হচ্ছে ওটার হলদেটে শরীর। টোপ লক্ষ্য করে ছুটে এল। প্রতিটা মুখ ঝুঁকে পড়েছে রেলিংয়ের ওপর। চোয়াল দুটো হাঁ হলো হাঙরের। একবারে গিলে ফেলল বড়শিসুদ্ধ টোপটা।

'খেয়েছে!' খুশিতে চিৎকার করে উঠল মিলস। টানতে শুরু করল দড়ি। 'নরম্যান, ব্রাউন, ধরো, টানো! একটানে ডেকের ওপর উঠিয়ে ফেলতে হবে।'

রশিটা যথেষ্ট শক্ত। মিলস আর তার দুই সহকারী টানছেও প্রাণ দিয়ে। কিছুক্ষণের ভেতর রেলিংয়ের পাশ ঘুরে ধপাস করে ডেকের ওপর আছড়ে পড়ল বেচারা হাঙর। তড়পাতে লাগল। এই ফাঁকে ছুটে গিয়ে একটা ছোট কুঠার নিয়ে এল মিলস। সর্বশক্তিতে হাঙরটার মাথায় ঘা মারল কয়েকটা। তড়পানো থেমে গেল জলদানবের। শরীর আর লেজটা কেবল কাঁপছে থির থির করে। ছ'সাতজন নাবিক এক সাথে হামলে পড়ল ওটার ওপর। দেখতে দেখতে মাথাটা আলাদা করে ফেলল বড় ছুরি দিয়ে, শরীরটা কেটে ফেলল টুকরো টুকরো করে। তারপর সাগর থেকে বালতি ভরে পানি তুলে ধুয়ে ফেলা হলো ডেক। পরিতৃপ্তির হাসি মিলস-এর মুখে। নাবিকদের ভেতর হাঙরের টুকরো বিলি করতে বসল সে এবার। এই সময় ক্যাপ্টেনের কেরানী গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এল তার দিকে।

'চমৎকার জিনিস,' তোষামুদে স্বরে সে বলল। 'ধরেছও দারুণ বুদ্ধি খাটিয়ে। আমাকে এক টুকরো দেবে তো, না?'

বাউন্টির আর সব নাবিকের মত মিলসও অন্তর থেকে ঘৃণা করে স্যামুয়েলকে। লোকটা পানি ছাড়া আর কিছু পান করে না। সবার সন্দেহ, নিজের ভাগের মদ ও জমাচ্ছে দেশে ফিরে বিক্রি করবে বলে।

'একটা টুকরো তাহলে চাই তোমার, হ্যাঁ?' গরগরিয়ে উঠল গোলন্দাজের মেট। 'ঠিক আছে দেব, কিন্তু বদলে আমাকে এক বোতল মদ দেবে তুমি, যে সে জিনিস হলে চলবে না, ভাল জিনিস দিতে হবে, তা না হলে আজ হাঙর খাওয়ার আশা তোমাকে ছাড়তে হবে।'

'কেন ভাই এমন কৃপণের মত ব্যবহার করছ,' আগের মতই মধুর স্বরে বলল স্যামুয়েল। 'তোমার একার ভাগে যা রেখেছ তা দিয়েই তো ডজন খানেক লোককে খাওয়াতে পারবে।'

'আর তোমার ভাগের মদ যা এতদিন জমিয়েছ তা দিয়ে তো হাজার

খানেক লোককে খাওয়াতে পারবে।'

'শোনো, ভাই মিলস, আমি নিজের জন্যে চাইছি না, চাইছি ক্যাপ্টেনের জন্যে।'

'এতই যদি দরদ, নিজে একখানা ধরে খাওয়াও না ক্যাপ্টেনকে। এটা আমার, আমি ধরেছি, আমার যাকে ইচ্ছা দেব, যাকে ইচ্ছা নয় দেব না। ক্যাপ্টেন তো সব খাবারের ভাল ভালগুলো খাচ্ছে, আমাদের খাওয়াচ্ছে রদ্দিগুলো, কেন ওকে আমার ভাগের জিনিস দিতে যাব?'

'কার সম্পর্কে কি বলছ, বুঝে বলছ তো, মিলস!' চাবুকের মত হিস করে উঠল স্যামুয়েলের গলা। 'কথা না বাড়িয়ে একটা টুকরো আমাকে দিয়ে দাও। ক্যাপ্টেনকে আমি কিছু বলব না।'

'কিছু বলবে না! এই যে—নাও তাহলে তোমার টুকরো!' বলতে বলতে দশ বারো পাউন্ড ওজনের এক টুকরো কাঁচা মাছ গায়ের সবটুকু জোর দিয়ে ছুঁড়ে দিল মিলস সোজা স্যামুয়েলের মুখ বরাবর। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল নিচে নামার সিঁড়ির দিকে।

অত বড় একটা টুকরোর ধাক্কা সামলাতে পারেনি স্যামুয়েল। চিৎ হয়ে পড়ে গেছে ডেকের ওপর। মিলস চলে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে। নির্বিকার মুখে চলে গেল পেছন দিকে। হাঙরের টুকরোটা নিতে ভুলল না।

দ্রুত জাহাজময় ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। এবং এই প্রথমবারের মত মিলস লক্ষ করল, সে প্রিয় হয়ে উঠেছে বাউন্টির নাবিকদের কাছে। অবশ্য এটাও বুঝতে পারছে, শাস্তি সে এড়াতে পারবে না।

ওল্ড ব্যাকাস বললেন, 'স্যামুয়েল খারাপ লোক সন্দেহ নেই—খুব খারাপ লোক, তবু শৃঙ্খলা শৃঙ্খলাই। যে কোন মূল্যে তা রক্ষা করবে ক্যাপ্টেন।'

যা ভাবা গিয়েছিল তা-ই ঘটল। সন্ধ্যার পরই মিলসকে ধরে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হলো। সারা রাত থাকল ওরকম। ভোরে শুরু হলো বিচার।

ছ'টার ঘণ্টা পড়তেই ডেকে হাজির হলেন মিস্টার ব্লাই। ক্রিশ্চিয়ানকে বললেন সবাইকে ডাকতে, অবাধ্যতার শাস্তি কেমন দেখুক। জাহাজের সামনের দিকে চলে গেল ক্রিশ্চিয়ান। চিৎকার করে জানিয়ে দিল ক্যাপ্টেনের নির্দেশ। একটু পরেই ডেকে হাজির হলো নাবিকরা। রেলিংয়ের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেল সবাই নিঃশব্দে।

'ঝাঁঝরি খাড়া করো!' স্বভাবসুলভ কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন ব্লাই।

ছুতোর মিস্ত্রী আর তার সহকারীরা ধরাধরি করে দুই হ্যাচের মুখ থেকে তুলে আনল দুটো লম্বাটে চেহারার কাঠের ঝাঁঝরি। একটা ডেকের ওপর পেতে অন্যটা খাড়া করে দিল বাঁদিকের গ্যাংওয়ের সাথে ঠেকিয়ে।

'হয়েছে, স্যার,' জানাল ছুতোর মিস্ত্রী পার্সেল।

'জন মিলস!' হাঁক ছাড়লেন ব্লাই, 'সামনে এসো!'

দৃঢ় পায়ে, মাথা উঁচু করে এগিয়ে এল মিলস। যে শাস্তিই দাও আমি গ্রাহ্য

করি না, এমন একটা ভঙ্গি মুখে। ভুরু কুঁচকে তাকালেন ব্লাই ওর দিকে। বললেন, 'কিছু বলার আছে তোমার?'

'না, স্যার,' মাথাটা সোজা রেখেই দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল মিলস।

'তাহলে কাপড় খোলো,' আদেশ করলেন ক্যাপ্টেন।

খুলল না, গায়ের জামাটা ছিঁড়ে এক সঙ্গীর দিকে ছুঁড়ে দিল মিলস। খালি গায়ে এগিয়ে গেল খাড়া ঝাঁঝরির দিকে।

'বাঁধো,' চিৎকার করলেন ব্লাই।

দুই কোয়ার্টার মাস্টার নর্টন আর লেঙ্কলেটার এবার এগিয়ে এল। দু'জনেরই হাতে লম্বা রশি। উঁচু করে ঝাঁঝরির ফাঁকের সাথে বেঁধে ফেলল ওরা মিলস-এর দু'হাত।

'বাঁধা হয়েছে, স্যার,' জানাল নর্টন।

মাথা থেকে হ্যাট খুলে নিলেন ব্লাই। দেখাদেখি জাহাজের অন্যরাও। এবার পকেট থেকে এক কপি 'যুদ্ধকালীন আচরণ বিধি' বের করে তার বিদ্রোহী বা বিদ্রোহাত্মক আচরণের শাস্তি সম্পর্কিত ধারাটি পড়ে শোনালেন গম্ভীর কণ্ঠে। তারপর বললেন, 'মিস্টার মরিসন, তিন ডজন। শুরু করো।'

মরিসন লোকটা ভাল, মনে দয়া মায়া আছে। নীতিগত ভাবে সে শাস্তি হিসেবে চাবুক মারার বিরোধী। তবু ক্যাপ্টেন যখন নির্দেশ দিল চাবুক তুলে নিতে বাধ্য হলো সে। এগিয়ে গেল ঝাঁঝরির কাছে। তারপর সবার দিকে একবার তাকিয়ে মারতে লাগল সপাং সপাং করে।

প্রথমবার যখন চাবুক পিঠে পড়ল 'আহ্!' করে একবার আর্তনাদ করল মিলস। প্রথম ডজনটা পুরো হওয়ার আগে আর একটাও শব্দ করল না ও। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে গেল আঘাতগুলো।

দু'হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে দেখছেন ব্লাই। একবার শুনলাম পরিতৃপ্তির সাথে ক্রিশ্চিয়ানকে বলছেন, 'কে এই জাহাজের ক্যাপ্টেন দেখিয়ে তবে ছাড়ব!'

তেরো বারের আঘাতটা পিঠে লাগতেই ভেঙে পড়ল মিলস-এর সহ্যক্ষমতা। এতক্ষণ দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ও ব্যথা সামলাচ্ছিল। নিচের ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে এসেছে। এবার ও চিৎকার করে উঠল, 'ওহ! ওহ ঈশ্বর! ওহ!'

দ্বিতীয় ডজন যখন শেষ হলো তখন আর শব্দ করার ক্ষমতা নেই মিলস-এর। অস্পষ্ট গোঙানির মত আওয়াজ কেবল বেরোচ্ছে গলা দিয়ে। তৃতীয় ডজন শেষ হওয়ার আগেই জ্ঞান হারাল ও। কিন্তু থামল না মরিসন। ক্যাপ্টেন থামতে বলেনি সুতরাং থামতে পারে না। পুরো তিন ডজন মারার পর থামল সে। কয়েকজন নাবিক ছুটে গিয়ে বাঁধন খুলে দিল মিলস-এর। ডেকের ওপর লুটিয়ে পড়ল অচেতন দেহটা। ওল্ড ব্যাকাস এগিয়ে এসে বসলেন পাশে। প্রাথমিক পরীক্ষা শেষ করে ঘিরে থাকা নাবিকদের দিকে ফিরে শঙ্কিত কণ্ঠে বললেন, 'সিক বে-তে নিয়ে চলো!'

নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের কেবিনের দিকে চলে গেলেন ক্যাপ্টেন।

*

মার্চের শুরুতে ব্লাই উষ্ণ মণ্ডলীয় আবহাওয়ার উপযোগী হালকা পোশাক আশাক তুলে রেখে ভারী এবং গরম কাপড় চোপড় বের করার নির্দেশ দিলেন। আগে থাকতেই ঠিক ছিল বাউন্টি কেপ হর্ন ঘুরে পশ্চিম দিকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় পড়বে, সে কারণে গরম কাপড় চোপড় আমরা সঙ্গে এনেছি। কেপ হর্ন দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত। কনকনে ঠাণ্ডা ঝড়ো বাতাস বিরামহীন ভাবে বয়ে চলেছে এখান দিয়ে। সুতরাং এ এলাকায় এসে নাবিকদের যে গরম কাপড় পরতে হবে তাতে আর সংশয় কী! শুধু পোশাক বদল না, আরও নানা দিক থেকে কেপ হর্নের শীতল ঝড়ো আবহাওয়ার মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগলাম আমরা। পুরানো হালকা পালগুলো নামিয়ে নতুন পাল বাঁধা হলো মাস্তুলে।

ইতোমধ্যে জাহাজের মেস ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। সার্জন ওল্ড ব্যাকাস এখন আমাদের মেসের সদস্য। উনি ছাড়া স্টুয়ার্ট, হেওয়ার্ড, মরিসন এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানী নেলসনও এই মেসে খাওয়া দাওয়া করেন–আমার সহযোগী মিডশিপম্যানরা তো আছেই। কয়েক দিনের ভেতর আমরা ক'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেলাম।

বাউন্টি যত দক্ষিণ দিকে এগোচ্ছে ঠাণ্ডার প্রকোপ ততই বাড়ছে। ডেক এখন রীতিমত নরক হয়ে উঠেছে–আগুনের নয়, শীতের। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে বয়ে আসা তুষার-শীতল বাতাস আমাদের হাড় পর্যন্ত জমিয়ে দিতে চায়। ভারী ভারী পশমী কাপড় পরেও পরিত্রাণ নেই। কাজের সময়টুকু কোন মতে ওপরে কাটিয়ে নিচে নামতে পারলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে সবাই। শুধু ঠাণ্ডার কষ্ট সইতে হলে কথা ছিল না, মাঝে মাঝে ওই শীতল বাতাস বেগ বাড়তে বাড়তে হারিকেনের রূপ নেয়। তখন জীবনটাকে সত্যিই অসহনীয় মনে হয়। জাহাজ বাঁচানোর জন্যে বেশির ভাগ সময় তখন ডেকে কাটাতে হয় নাবিকদের, পাল দড়ি-দড়া ঠিক করার জন্যে মাস্তুলের মাথায় উঠতে হয় নামতে হয়। জীবনে যারা একাজ করেনি তারা বুঝতে পারবে না এতে কি কষ্ট!

প্রথম ঝড়ের দাপটটা কোন মতে সামলাল বাউন্টি, তারপর আর পারল না। বাউন্টি প্রায় নতুন জাহাজ। তবু প্রবল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরের সাথে যুঝতে গিয়ে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ল বেচারা। খোলের জোড়গুলোর অনেক জায়গায় ফাটল দেখা দিল। অবিরাম পানি সেঁচার কাজে ব্যস্ত থাকতে হলো বেশ কিছু নাবিককে। শেষ পর্যন্ত যখন সামনের ডেকেও ফাটল দেখা দিল এবং সেখান দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে ফোকাস্‌লে পানি পড়তে লাগল তখন প্রত্যেককে যার যার হ্যামক পেছনের বড় কেবিন অর্থাৎ রুটিফল গাছের চারা নেয়ার জন্যে সাজানো হয়েছে যেটা সেটায় নিয়ে গিয়ে ঝোলানোর নির্দেশ দিলেন ব্লাই। দিলেন না বলে দিতে বাধ্য হলেন বলাই বোধহয় সঙ্গত। কারণ ফোকাস্‌লের প্রতিটা কুঠুরিরই ছাদ চুইয়ে পানি পড়ছে। একে ঠাণ্ডা তার ওপর পানির ধারা, এই অবস্থায় ফোকাস্‌লে থাকা সম্ভব নয় কারও পক্ষে। অবশেষে ব্লাইয়ের নিজের কেবিনের ছাদ দিয়েও যখন পানি পড়তে লাগল তখন তাঁর ইস্পাত কঠিন

সিদ্ধান্ত ভেঙে চুর চুর হয়ে গেল। হর্ন অন্তরীপ ঘুরে যাওয়ার আশা বাদ দিলেন তিনি। বাউন্টির মুখ ঘুরিয়ে দেয়া হলো পুবদিকে। অর্থাৎ এখন আমাদের লক্ষ্য উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ভারত মহাসাগর পেরিয়ে দক্ষিণ সাগরে পৌঁছানো। জাহাজের প্রতিটা মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল ক্যাপ্টেনের এই সিদ্ধান্তে। কয়েক দিনের মধ্যে উষ্ণ আবহাওয়ায় পৌঁছে যাবে বাউন্টি।

সত্যিই আবহাওয়ার উন্নতি হলো কয়েক দিনের মধ্যেই। ঝড় বাদল থেমে গেল, তবে ঠাণ্ডা তেমনিই আছে। তা থাক, ঠাণ্ডা তেমন কোন সমস্যা নয়, ঝড় আর বৃষ্টি না হলেই হলো। নাবিকদের মনে স্বস্তি ফিরে এল। যদিও পানি সেঁচার কাজ পুরোদমেই চালাতে হচ্ছে। হর্ন অন্তরীপ থেকে প্রচুর সামুদ্রিক পাখি ধরেছিলাম আমরা, তখন জাহাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে যে ওগুলো খাওয়ার সুযোগ পাইনি, এবার পেলাম। বহুদিন পর তাজা মাংসের স্বাদ পেয়ে মুখ ফিরল সবার। পেছনের বড় কেবিন থেকে আবার যে যার কুঠুরিতে ফিরে গেল।

এর ভেতর একদিন—মার্চের দশ তারিখে—খাবার নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করায় খালাসী ম্যাথু কুইনটালকে চব্বিশ ঘা চাবুক মারার নির্দেশ দিলেন ব্লাই। আবার থমথমে হয়ে উঠল নাবিকদের মন।

মে-র তেইশ তারিখে আমরা নোঙ্গর ফেললাম আফ্রিকার উপকূলে, কেপ টাউনের কাছে এক জায়গায়। আটত্রিশ দিন এখানে রইল বাউন্টি। ডেক এবং খোলের ফাটলগুলো মেরামত করা হলো। পাল, দড়ি-দড়াও মেরামত করে নেয়া হলো। কারণ এর পর আমরা যে পথে এগোব সে পথে ভ্যান ডিয়েমেন'স ল্যান্ড-এর আগে আর কোন নোঙ্গর করার মত জায়গা বা দ্বীপ পাওয়া যাবে না। ভ্যান ডিয়েমেন'স ল্যান্ড উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে প্রায় দু'মাসের পথ।

মেরামত ইত্যাদি শেষ হওয়ার পর আমরা আবার পাল তুলে দিলাম। ইতোমধ্যে জুন মাস প্রায় শেষ। তেরো বার কামান দেগে কেপ টাউনের ওলন্দাজ দুর্গটাকে সাহায্য এবং সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ এবং সম্মান জানাল বাউন্টি। তারপর সোজা ভ্যান ডিয়েমেন'স ল্যান্ড (এখনকার টাসমানিয়া)।

উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে ভ্যান ডিয়েমেন'স ল্যান্ড পর্যন্ত সেই দীর্ঘ, শীতল ক্লান্তিকর যাত্রার খুব সামান্যই আমার মনে আছে। আসলে মনে রাখবার মত তেমন কিছু ঘটেওনি। দিনের পর দিন পশ্চিম এবং দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে বয়ে আসা তীব্র বাতাসের ধাক্কায় ভেসে যাওয়া আর ভেসে যাওয়া। চারদিকে যতদূর চোখ যায় শুধু সাগরের নীল পানি আর পানি। ব্লাইয়ের কঠোর আচরণে ফক্কা হয়েছে; নাবিকদের ভেতরে কোন রকম অবাধ্যতা নেই। ফলে দিনগুলো সব এক, একঘেয়ে আর নিরুত্তাপ। নিয়ম মত কাজ করে যাওয়া, আর অবসর সময়ে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়া, গল্প-গুজব করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

অগাস্টের বিশ তারিখে আমরা মিউস্টোন পাহাড় দেখতে পেলাম। ভ্যান ডিয়েমেন'স ল্যান্ড-এর দক্ষিণ পশ্চিম অন্তরীপের কাছে, ডাঙা থেকে ছ'লিগ

মত দক্ষিণ-পুবে সাগর ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে ওটা। দু'দিন পর অ্যাডভেঞ্চার বে-তে নোঙ্গর ফেলল বাউন্টি। এখানে আমরা কাটালাম প্রায় দু'সপ্তাহ। কাঠ এবং পানি সংগ্রহের কাজেই প্রধানত ব্যয় হলো সময়টা। রোজ ছুতোর মিস্ত্রীর তত্ত্বাবধানে গাছ কাটে একদল নাবিক, আরেক দল সেগুলো চেরাই করে তক্তা তৈরি করে অন্য এক দল চলে যায় দ্বীপের গভীরে পানি আনার জন্যে।

দ্বীপের যে অংশে আমরা নেমেছি কেমন যেন মরা মরা সে জায়গাটা। গাছ পালা আছে তবু মনে হয় নিষ্প্রাণ। বেশির ভাগ গাছই ইউক্যালিপটাস জাতীয়। সোজা উঠে গেছে। লম্বায় একশো দেড়শো ফুট, সত্তর থেকে আশি ফুট পর্যন্ত ডাল পালা শূন্য। পাতা যা তা আগার দিকে ত্রিশ চল্লিশ ফুটের ভেতর। পাখির সংখ্যা খুব কম। সারা দিনে একবার কি দুবার তাদের গান শোনা যায়। যে পনেরো দিন এখানে আমরা ছিলাম তার ভেতর বুনো জন্তু দেখেছি মাত্র একটা—অপোসাম জাতীয় খুদে এক প্রাণী, মোটা এক গাছের কোটর থেকে বেরিয়ে দৌড়ে পালিয়েছিল আমাদের সাড়া পেয়ে। মানুষও দেখেছি এ জায়গায়,—সেই অপোসামটার মতই ভীতু। কালো তাদের গায়ের রঙ, শরীর সম্পূর্ণ উলঙ্গ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গলার স্বর হাঁসের মত। বেশ কয়েকবার দেখেছি ওদের। প্রত্যেকবারই চার পাঁচজনের ছোট দল। আমাদের দেখেই দৌড়ে বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যায়।

আমার ওপর পানি সংগ্রহকারী দলের দায়িত্ব দিয়েছেন ব্লাই। সৈকতের পশ্চিম প্রান্তে একটা ঝর্না আছে। সেখান থেকে পানির পাত্রগুলো ভরে আমাদের বড় কাটার-এ (এক মাস্তুলওয়ালা দ্রুতগামী নৌকা) করে জাহাজে নিয়ে তুলতে হবে। দিনে দু'তিনবার আমরা যাওয়া আসা করতে লাগলাম বাউন্টি আর ঝর্নাটার ভেতর।

ছুতোর মিস্ত্রী পার্সেলের ওপর দায়িত্ব কাঠ সংগ্রহের। তাকে সাহায্য করছে দুই সহকারী ছুতোর নরম্যান আর ম্যাকইন্টশ আর দু'জন খালাসী। ব্লাই নিজে বনের ভেতর ঘুরে দেখিয়ে দিয়েছেন কোন কোন গাছ কাটতে হবে। প্রথম দু'তিন দিনে পার্সেলের সহকারীরা দু'তিনটে বড় বড় ইউক্যালিপটাস গাছ কাটল। আগার দিকের ডাল পালা ছেঁটে চেরাই শুরু করার আগে কি মনে করে গাছগুলো ভাল মত একবার পরীক্ষা করল পার্সেল। এবং বুঝতে পারল বৃথা গেছে তিন দিনের পরিশ্রম। এ-গাছ দিয়ে ভাল তক্তা হবে না। তখন সে অন্য এক জাতের কতকগুলো ছোট ছোট গাছ কাটার নির্দেশ দিল। এই গাছগুলোর বাকল একটু রুক্ষ ধরনের, তবে কাঠ খুব শক্ত, লালচে রঙের।

সেদিন সকালে আমি আমার লোকদের পানি ভরা তদারক করছি। একটু দূরে পার্সেলের তত্ত্বাবধানে গাছ কাটছে তার লোকেরা। হঠাৎই ব্লাই উপস্থিত হলেন সেখানে। কাঁধে বন্দুক, সঙ্গে উদ্ভিদবিজ্ঞানী মিস্টার নেলসন। ভুরু কুঁচকে একবার গাছগুলোর দিকে তাকালেন ব্লাই। তারপরই রুক্ষ কণ্ঠে চিৎকার:

'মিস্টার পার্সেল!'

'জি, স্যার?'

'এসব কি গাছ কাটছ?' গর্জে উঠলেন ক্যাপ্টেন। 'এ দিয়ে যে তক্তা হবে তা আমাদের কী কাজে আসবে শুনি? আমার মনে হয় কোন ধরনের গাছ কাটতে হবে, তোমাকে আমি দেখিয়ে দিয়েছিলাম!'

খুবই ভাল মিস্ত্রী পার্সেল। নিজের কাজ সে বোঝে; ব্লাই জাহাজ চালানোর কৌশল যতখানি বোঝেন ততখানিই বোঝে। এ নিয়ে তার একটু অহঙ্কারও আছে। তাছাড়া সার্জন ওল্ড ব্যাকাসকে বাদ দিলে বাউন্টির সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ সে। মেজাজটাও তার ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের মতই, কখন উঠবে কখন পড়বে আগে থাকতে আন্দাজ করা শক্ত। ক্যাপ্টেনের কথা শুনে এক মুহূর্ত চুপ করে রইল সে। তারপর বলল:

'হ্যাঁ, স্যার, দেখিয়েছিলেন।'

'তাহলে অকাজে সময় নষ্ট করছ কেন?'

লাল হয়ে উঠল ছুতোর মিস্ত্রীর মুখ। 'আমি সময় নষ্ট করছি না, স্যার,' শীতল কণ্ঠে সে বলল। 'আপনি যেগুলো দেখিয়ে দিয়েছিলেন তার কয়েকটা কেটে দেখেছি, ওগুলো দিয়ে কাজ হবে না।'

'কাজ হবে না? খালি ফাঁকি দেয়ার বুদ্ধি···ঠিক বলেছি কি না, মিস্টার নেলসন?'

ক্যাপ্টেন আর ছুতোর মিস্ত্রীর এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার কোন ইচ্ছা নেলসনের নেই। তাই তিনি বললেন, 'আমি, স্যার, গাছ গাছড়া চিনি, কিন্তু কোনটায় কেমন কাঠ হবে তা বলা আমার ক্ষমতার বাইরে।'

'হ্যাঁ, ছুতোর মিস্ত্রী সেটা জানে,' বলল বুড়ো পার্সেল। 'আমি বলছি, ওই সব বড় বড় গাছ দিয়ে তক্তা বানালে কোন কাজেই আসবে না তক্তাগুলো।'

ক্রোধের চরম সীমায় পৌঁছে গেছেন ব্লাই। কঠোর কণ্ঠে তিনি বললেন, 'বেশি কথা না বলে যেমন বলেছি সেইমত করো, পার্সেল! তোমার সাথে তর্ক করার প্রবৃত্তি নেই আমার।'

'ঠিক আছে, স্যার,' একগুঁয়ে স্বরে বলল পার্সেল, 'বড় গাছই কাটছি। কিন্তু আবার আমি বলছি, তক্তাগুলো কোন কাজে আসবে না। যার যেটা কাজ সে-ই সেটা ভাল বোঝে···'

চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন ব্লাই। পাঁই করে ঘুরে আবার ছুতোর মিস্ত্রীর মুখোমুখি হলেন তিনি।

'বেটা বেজন্মা বুড়ো—আমার মুখে মুখে কথা! নরম্যান, তুমি এখন থেকে নেতা এখানকার। আর, পার্সেল, এক্ষুণি তুমি লেফটেন্যান্ট ক্রিশ্চিয়ানের কাছে হাজির হবে। পনেরো দিন শিকল বাঁধা অবস্থায় থাকবে।'

পার্সেলকে জাহাজে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব চাপল আমার কাঁধে।

বুড়ো মিস্ত্রী রাগে কাঁপছে থর থর করে। দু'হাত মুঠো পাকিয়ে বসে আছে নৌকার মাঝখানে। হঠাৎ তাকে বিড় বিড় করে বলতে শুনলাম, 'বেজন্মা বলল! ঠিক মত কর্তব্য পালনের পুরস্কার শিকল বাঁধা অবস্থায় থাকা! বড় বাড় বেড়েছে তোমার, ব্লাই! দাঁড়াও, ইংল্যান্ডে ফিরে নেই!'

*

অ্যাডভেঞ্চার বে-তে বাকি যে ক'টা দিন বাউন্টি নোঙ্গর করে রইল, সাধারণ নাবিকদের দিন কাটল চরম অসন্তোষের ভেতর, আমার কাটল অস্বস্তিতে। এই অসন্তোষের পেছনে কোন কারণ যে নেই তা না। এখন মাথা পিছু যে পরিমাণ খাবার দৈনিক সরবরাহ করা হচ্ছে, পোর্টসমাউথ থেকে রওনা হয়ে আসার পর আর কখনও এত কম সরবরাহ করা হয়নি। ড্যান ডিয়েমেন'স ল্যান্ড-এর যে জায়গায় আমরা নোঙ্গর ফেলেছি সেখানে খাবার মত এমন কিছু নেই যা দিয়ে আমাদের খাদ্যাভাব কিছুটা পূরণ হতে পারে। অ্যাডভেঞ্চার বে-তে মাছ নেই বললেই চলে। যা আছে তা এমন নিকৃষ্ট মানের যে দু'একদিন খাওয়ার পরই আর কেউ সেগুলো খেতে চাইল না। ডাঙায় পাখির সংখ্যাও খুব কম। ফলে ধরা কঠিন। বন্দুক থাকলে মারা যেত হয়তো, কিন্তু সাধারণ নাবিকরা ইচ্ছে করলেই পাখি শিকারের জন্যে বন্দুক তুলে নিতে পারে না। কিন্তু ব্লাই নিজে প্রতিদিনই বন্দুক কাঁধে চলে যান বনের ভেতর। ফিরে আসেন একটা বা দুটো বুনো হাঁস শিকার করে। নিজে খান সেগুলো। এটাই নাবিকদের অসন্তুষ্ট করল সবচেয়ে বেশি। এর সঙ্গে যোগ হলো ছুতোর মিস্ত্রীকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখার ব্যাপারটা। তার ওপর আছে ফ্রায়ার এবং ব্লাইয়ের ঠাণ্ডা লড়াই। একান্ত প্রয়োজন না হলে দু'জন কেউ কারও সাথে কথা বলেন না। মাস্টারের সন্দেহ জাহাজের লোকদের কম খাবার দিয়ে ক্যাপ্টেন নিজের পকেট ভারী করছে। এত সব ব্যাপারের পর আমরা রওনা হওয়ার দু'দিন আগে নেড ইয়ং নামের এক মিডশিপম্যানকে কামানের সঙ্গে বেঁধে বারো ঘা চাবুক মারার নির্দেশ দিলেন ব্লাই।

ইয়ং-এর নেতৃত্বে দু'জন খালাসী আর বাউন্টির নাবিক ডিক স্কিনারকে আমাদের ছোট কাঁটারটা দিয়ে পাঠানো হয়েছিল শেলফিশ আর কাঁকড়া সংগ্রহ করে আনার জন্যে।

নৌকা ভাসিয়ে ফ্রেডারিক হেনরি অন্তরীপের দিকে চলে যায় ওরা। বিকেলের ভেতর ফিরে আসার কথা, কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পরও ওরা ফিরল না। দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠল জাহাজের সবাই। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হলো। অবশেষে এল ওরা। কিন্তু চারজন নয়–তিনজন। নাপিত স্কিনার নেই নৌকায়। কোথায় সে, জিজ্ঞেস করতে ইয়ং যা জানাল তার মর্মার্থ–হাঁটতে হাঁটতে বনে ঢুকেছিল স্কিনার, তারপর আর ফিরে আসেনি।

'কাণ্ডের ভেতরটা ফাঁপা একটা গাছ দেখতে পায় ও,' মিস্টার ব্লাইকে বলল ইয়ং। 'আশপাশে মৌমাছি উড়তে দেখে ওর ধারণা হয় গাছটার ভেতর চাক আছে। মধু পাওয়া যেতে পারে ভেবে ও আগুন জ্বেলে মৌমাছিগুলোকে গাছের ভেতর থেকে বের করে আনার অনুমতি চাইল আমার কাছে। বলল, কি করে মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করতে হয় ও জানে, ছেলে বেলায় নাকি অনেকবার করেছে এ কাজ। মধু পেলে আপনি খুশি হবেন ভেবে আমি অনুমতি দেই। ওকে রেখে আমরা তিনজন চলে গেলাম শেলফিশ যোগাড় করতে। ঘণ্টা দুয়েক পর ফিরে দেখি গাছটার গোড়ায় আগুন জ্বলছে, কিন্তু স্কিনার নেই। ওর

নাম ধরে ডাকাডাকি করলাম, সাড়া না পেয়ে শেষে কাটার থেকে নেমে বনের ভেতর ঢুকলাম। তিনজন সমানে চিৎকার করতে করতে খুঁজলাম সন্ধ্যা পর্যন্ত, কিন্তু, স্যার, ওর কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম না।'

আমি জানতাম সেদিন বিকেলে নাপিতের কাছে দাড়ি কামানোর কথা ব্লাইয়ের। সময় মত কাজটা হয়নি বলে এমনিতেই বিরক্ত হয়ে ছিলেন তিনি। এখন যে-ই শুনলেন নাপিত ব্যাটা উধাও হয়ে গেছে, জ্বলে উঠলেন তেলে বেগুনে।

'জাহান্নামে যা শয়তানের বাচ্চা,' গর্জে উঠলেন ক্যাপ্টেন। 'তোর মত যত মিডশিপম্যান আছে সেগুলোও আস্ত একেকটা শয়তান! মধু পেলে ওই জায়গায় বসেই তোরা খেয়ে আসতি, আমি তা ভাল করেই জানি! স্কিনার কোথায় বল? জানিস না? তাহলে যা, এক্ষুণি যা, জেনে আয়! তোর সঙ্গে যে দুটো বদমাশ ছিল ওদেরও নিয়ে যা। স্কিনারকে ছাড়া ফিরবি না জাহাজে!'

পূর্ণবয়স্ক মানুষ ইয়ং। ক্যাপ্টেনের কথা শুনে লাল হয়ে উঠল ওর চোখ মুখ। তক্ষুণি সে দুই খালাসীকে ডেকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল। ফিরল পরদিন দুপুরের সামান্য আগে। এবার স্কিনার আছে ওদের সঙ্গে। জানা গেল আরও মৌচাক যদি পাওয়া যায় এই আশায় ও বনের ভেতর ঢুকে পথ হারিয়ে ফেলেছিল।

চব্বিশ ঘণ্টার ওপর না খেয়ে আছে চারটে মানুষ, কথাটা যেন মনেই পড়ল না ব্লাই-এর। ইয়ং ডেকে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎকার করে উঠলেন:

'এসো, মিস্টার ইয়ং, কিভাবে কর্তব্য পালন করতে হয় সে সম্পর্কে সামান্য শিক্ষা তোমাকে দেব। মরিসন!'

'জি, স্যার!'

'তুমিও এসো, পেছনের ওই কামানটার সাথে বাঁধো মিস্টার ইয়ংকে। বারো ঘা লাগাবে। আর এই বদমাশ নাপিতটাকে বাঁধো গ্যাংওয়ের সাথে। ওকে লাগাবে চব্বিশ ঘা।'

ইয়ং এবং স্কিনারকে চাবকানোর খুঁটিনাটি বর্ণনা আমি দেব না, শুধু এটুকু বলব, সেই বারো-ঘা চাবুক খাওয়ার পর আমূল বদলে গেল ইয়ং। ওর ভেতর থেকে কে যেন উপড়ে নিয়েছে প্রাণ নামক জিনিসটা। মুখ বুজে কাজ করে যায়, নেহায়েত প্রয়োজন না পড়লে কারও সাথে কথা বলে না, এমন কি বার্থের অন্য মিডশিপম্যানদের সাথেও না। বহুদিন পর, সমস্ত কিছু যখন ওলট পালট হয়ে গিয়েছিল, ও আমাকে বলেছিল, বাউন্টি ইংল্যান্ডে পৌঁছুলেই সে চাকরি ছেড়ে দেবে বলে ঠিক করেছিল।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেন?'

ইয়ং জবাব দিয়েছিল, 'প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে। ওর অধীনে চাকরি করে ওর কিছু করা যেত না, তাই চেয়েছিলাম সাধারণ একজন মানুষ হিসেবে ওর মুখোমুখি হব।'

*

সেপ্টেম্বরের চার তারিখে আবার আমরা নোঙ্গর তুললাম। অ্যাডভেঞ্চার বে পেছনে ফেলে এগিয়ে চললাম ওতাহিতের (এখনকার তাহিতি) দিকে। সাত সপ্তাহ পর দেখলাম আমার জীবনের প্রথম দক্ষিণ সাগরীয় দ্বীপ। আমাদের অবস্থা তখন শোচনীয়। ক্যাপ্টেনের দুর্ব্যবহার আর অর্ধাহার অনাহারে পাগল হওয়ার দশা সবার। তার ওপর নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে স্কার্ভি। বাউন্টির অর্ধেকের বেশি নাবিক আক্রান্ত হয়েছে এই রোগে।

সেদিনটার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। বিকেল বেলায় কোন কাজ নেই। তাহিতি আর বেশি দূরে নয় ভেবে বসলাম স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কস-এর পরামর্শে স্থানীয়দের সাথে বিনিময় করার জন্যে যে সব জিনিস এনেছি সেগুলো ভাল করে একবার দেখার জন্যে। স্যার ব্যাঙ্কস বলেছিলেন পেরেক, রেতি, গাছ ধরা বড়শি ইত্যাদির প্রচুর চাহিদা তাহিতীয়দের ভেতর। সস্তা গহনা-পত্রেরও চাহিদা আছে–বিশেষ করে মেয়েদের ভেতর। মায়ের কাছ থেকে পঞ্চাশ পাউন্ড নিয়েছিলাম এসব কেনার জন্যে। স্যার ব্যাঙ্কস দিয়েছিলেন আরও পঞ্চাশ পাউন্ড। পুরো টাকারই জিনিসপত্র কিনেছিলাম আমি। আমার জাহাজী সিন্দুকটার অর্ধেক ভরে আছে নানা আকারের বড়শি, পিতলের তারের কুণ্ডলী; সস্তা আংটি, কানের দুল, চুড়ি, হার; রেতি, কাঁচি, ক্ষুর, ছোট ছোট আয়না ইত্যাদিতে। রাজা জর্জের ছবিও এনেছি এক ডজন, স্যার জোসেফ এগুলো যোগাড় করে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া আছে–সিন্দুকের একেবারে নিচে এক কোনায় লুকিয়ে রেখেছি–একটা বাক্স। মখমলে মোড়া। একজোড়া বালা আর একটা হার রয়েছে ওতে। অন্যসব জিনিসের মত সস্তা নয় এগুলো, খুব বেশি দামীও অবশ্য নয়। বেশ রোমান্টিক স্বভাবের ছেলে ছিলাম আমি তখন। মনে হয়েছিল কোন সুন্দরী তাহিতীয় যদি আমাকে ভালবাসে বিনিময়ে আমি কি দেব?–তাই নিয়েছিলাম বালা আর হারটা। আজ এত বছর পরে হাসি পায় আমার। ভাবি, কি সরল সোজা ছিলাম তখন!

জিনিসগুলো সব বের করে ঝেড়ে ঝুড়ে আবার ওঠাতে শুরু করেছি এমন সময় শুনতে পেলাম ব্লাইয়ের রুক্ষ, কর্কশ কণ্ঠস্বর। যেখানে আমি বসে আছি সেখান থেকে খুব বেশি হলে পনেরো ফুট দূরে ব্লাইয়ের কেবিন।

'দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছ কেন, মিস্টার ফ্রায়ার?' চিৎকার করলেন ক্যাপ্টেন। 'ভেতরে ঢোকো।'

মাস্টারের গলা শুনতে পেলাম, 'জি, স্যার।'

'কাল অথবা পরশু,' ব্লাই বললেন, 'মাতাভাই উপসাগরে নোঙ্গর করব আমরা। এ পর্যন্ত খাবার এবং অন্যান্য জিনিস যা খরচ হয়েছে তার একটা তালিকা তৈরি করিয়েছি স্যামুয়েলকে দিয়ে। এই যে দেখ–এতে একটা সই লাগবে তোমার।'

দীর্ঘ নীরবতা এরপর। অবশেষে আবার শুনতে পেলাম ফ্রায়ারের গলা:

'না, স্যার, এতে আমি সই করতে পারব না।'

'সই করতে পারবে না! কি বলতে চাইছ তুমি?'

'স্যামুয়েল ভুল করেছে। এত মাংস কখনোই দেয়া হয়নি নাবিকদের।'

'ভুল করছ তুমি, ফ্রায়ার, আমি জানি কোন জিনিস কতটুকু তোলা হয়েছিল। স্যামুয়েল ঠিকই লিখেছে?'

'আমি সই করতে পারব না, স্যার।'

'কেন? স্যামুয়েল যা করেছে আমার হুকুমে করেছে।...এক্ষুণি সই করবে! না হলে—'

'আমি সই করতে পারব না,' আবার বলল মাস্টার, 'অন্তত স্বেচ্ছায় নয়।'

'করবে!' চিৎকার করে উঠলেন ব্লাই। 'করে আরও ভাল করবে!' ধুপ ধাপ পায়ের আওয়াজ শুনলাম, সম্ভবত দরজার কাছে গেলেন ব্লাই। তারপর আবার চিৎকার; 'মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান! সবাইকে ডেকে ডাকো এক্ষুণি!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিশ্চিয়ানের চিৎকার শুনতে পেলাম। জাহাজের সামনে পৌঁছে দেয়া হলো ক্যাপ্টেনের আদেশ। কিছুক্ষণের ভেতর সবাই জড়ো হলো ডেকে। ঝপ পট আমার জিনিসগুলো সিন্দুকে ভরে আমিও গিয়ে দাঁড়ালাম। ব্লাই এলেন। 'যুদ্ধকালীন আচরণবিধি'র বিদ্রোহ বা বিদ্রোহাত্মক আচরণের শাস্তি সম্পর্কিত ধারাটি পড়ে শোনালেন। এরপর এগিয়ে এল স্যামুয়েল। হাতে সেই তালিকা লেখা খাতা, কলম আর কালির দোয়াত।

'এবার, মিস্টার ফ্রায়ার,' ব্লাই বললেন, 'সই করো এই খাতায়।'

মৃত্যুর মত নিস্তব্ধ বাউন্টির ডেক। ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ফ্রায়ার। তারপর এগিয়ে গিয়ে কলমটা নিল স্যামুয়েলের কাছ থেকে।

'মিস্টার ব্লাই,' অতি কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করে সে বলল, 'জাহাজের সবাই সাক্ষী থাকল, আপনার নির্দেশ পালন করার জন্যেই কেবল আমি সই করছি। কিন্তু, স্যার, ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে গেল ভাবলে ভুল করবেন আপনি।'

ঠিক সেই সময় মাস্তুলের মাথা থেকে ভেসে এল একটা চিৎকার:

'ডাঙা দেখা যায়!'

চার

ছোট্ট পাহাড়ী দ্বীপটার নাম মেহেতিয়া। অবস্থান তাহিতির চল্লিশ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে। দু'চোখ ভর্তি অবিশ্বাস নিয়ে আমি তাকিয়ে রইলাম দিগন্তরেখার কাছে বিন্দুর মত স্থির অবয়বটির দিকে। সত্যিই তাহলে দক্ষিণ সাগরীয় দ্বীপ-মালায় এসে গেলাম আমরা! সন্দেহ নেই; বাউন্টি এখন সেদিকেই এগোচ্ছে।

সারারাত ঘুমোতে পারলাম না উত্তেজনায়। দ্বীপটাকে কাছ থেকে দেখতে কেমন লাগবে কল্পনা করতে লাগলাম কেবল।

পরদিন ভোরে, ঠিক সূর্যোদয়ের আগে উপকূলের খুব কাছ দিয়ে মেহেতিয়া দ্বীপকে পেরিয়ে গেল বাউন্টি। জীবনে প্রথমবারের মত দেখলাম নারকেল গাছের সবুজ ঝাঁকড়া টুপি পরা দীঘল শরীর, ঝোপ ঝাড়ের ভেতর

দক্ষিণ সাগরীয় দ্বীপবাসীদের তৃণ ছাওয়া ছোট্ট কুটির। দেখলাম ঝকঝকে রূপালি সৈকতে হেঁটে বেড়াচ্ছে ওদের কয়েকজন। বাউন্টিকে দেখা মাত্র ছুটে দ্বীপের ভেতর দিকে চলে গেল তারা। একটু পরেই দলে দলে নারী পুরুষ শিশু এসে ভীড় করল সাগরতীরে। চিৎকার, সেইসাথে বড় বড় সাদা কাপড় নেড়ে ওরা আমাদের আমন্ত্রণ জানাতে লাগল দ্বীপে।

জাহাজ থামিয়ে নৌকা নামানোর নির্দেশ দিলেন ব্লাই। কিন্তু খেয়াল করলাম, মাথায় ফেনার মুকুট পরে বিশাল বিশাল ঢেউ এগিয়ে যাচ্ছে সৈকতের দিকে। এই ঢেউ এড়িয়ে নৌকা তীরে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও মেহেতিয়ায় নামতে পারলাম না আমরা। হাত নেড়ে বিদায় জানালাম দ্বীপবাসীদের। ভরা পালে এগিয়ে চলল বাউন্টি।

সবে মাত্র দ্বীপটার উত্তর প্রান্ত পার হয়েছি আমরা, এই সময় মাস্তুলের ওপর থেকে স্মিথ চিৎকার করে উঠল:

'দেখুন, মিস্টার বিয়্যাম!'

ওপর দিকে তাকালাম, হাত তুলে সামনের দিকে ইশারা করে আছে স্মিথ। ওর ইশারা অনুসরণ করে চোখ ফেরাতেই দেখি, অনেক অনেক লিগ দূরে বিশাল এক পাহাড়ের অবয়ব উঠে এসেছে সাগর ফুঁড়ে। সকালের আলোয় হালকা নীল, একটু যেন ভৌতিক দেখাচ্ছে। চূড়া থেকে সমান ভাবে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে পাহাড়টার দুই পাশ।

তরতরিয়ে এগোচ্ছে আমাদের জাহাজ। আমি তাকিয়ে আছি। ঘোর লেগেছে যেন চোখে। কতক্ষণ অমন সম্মোহিতের মত দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না, সংবিৎ ফিরতেই ছুটে গেলাম ডেকে। মিস্টার ব্লাইও তাকিয়ে আছেন অবয়বটার দিকে। অদ্ভুত প্রসন্ন দৃষ্টি চোখে। মেজাজটাও সেরকম। আমার পিঠ চাপড়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি।

'ওই যে দেখ,' আঙুল তুলে ইশারা করলেন ব্লাই ভৌতিক অবয়বটার দিকে, 'ওটাই তাহিতি! অবশেষে আসতে পেরেছি আমরা, কি বলো?'

'মনে হচ্ছে খুব সুন্দর দ্বীপটা,' আমি মন্তব্য করলাম।

'সত্যিই সুন্দর—এত সুন্দর আর হয় না। ক্যাপ্টেন কুক ইংল্যান্ডের পর যদি কোন দেশকে ভালবেসে থাকেন তো সে এই তাহিতি। আমিও, বুড়ো বয়েসে যখন হাতে কোন কাজ থাকবে না, জীবনের শেষ দিনগুলো এখানকার নারকেল কুঞ্জের ছায়ায় কাটাতে পারলে আর কিছু চাইব না। এই দেশের মত এর মানুষগুলোও সুন্দর। লম্বা পথ পাড়ি দিতে হলো ওদের কাছে আসতে। কাল রাতে লগ দেখে হিসেব করছিলাম। এ পর্যন্ত কত মাইল জাহাজ চালিয়েছি আমরা জানো? সাতাশ হাজার মাইলেরও বেশি!'

বিকেল নাগাদ দ্বীপটার কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম আমরা।

তাহিতির সবচেয়ে সুন্দর সবচেয়ে ঐশ্বর্যময় অংশ তাইয়ারাপু। তার পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছে বাউন্টি। আমি দাঁড়িয়ে আছি রেলিংয়ের ওপর ভর দিয়ে। কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারছি না দ্বীপটার দিক থেকে। উপকূলের প্রায় মাইল

'স্যামুয়েল ভুল করেছে। এত মাংস কখনোই দেয়া হয়নি নাবিকদের।'

'ভুল করছ তুমি, ফ্রায়ার, আমি জানি কোন জিনিস কতটুকু তোলা হয়েছিল। স্যামুয়েল ঠিকই লিখেছে?'

'আমি সই করতে পারব না, স্যার।'

'কেন?...স্যামুয়েল যা করেছে আমার হুকুমে করেছে।...এক্ষুণি সই করবে! না হলে–'

'আমি সই করতে পারব না,' আবার বলল মাস্টার, 'অন্তত স্বেচ্ছায় নয়।'

'করবে!' চিৎকার করে উঠলেন ব্লাই। 'করে আরও ভাল করবে!' ধুপ ধাপ পায়ের আওয়াজ শুনলাম, সম্ভবত দরজার কাছে গেলেন ব্লাই। তারপর আবার চিৎকার; 'মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান! সবাইকে ডেকে ডাকো এক্ষুণি!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিশ্চিয়ানের চিৎকার শুনতে পেলাম। জাহাজের সামনে পৌঁছে দেয়া হলো ক্যাপ্টেনের আদেশ। কিছুক্ষণের ভেতর সবাই জড়ো হলো ডেকে। ঝপ পট আমার জিনিসগুলো সিন্দুকে ভরে আমিও গিয়ে দাঁড়ালাম। ব্লাই এলেন। 'যুদ্ধকালীন আচরণবিধি'র বিদ্রোহ বা বিদ্রোহাত্মক আচরণের শাস্তি সম্পর্কিত ধারাটি পড়ে শোনালেন। এরপর এগিয়ে এল স্যামুয়েল। হাতে সেই তালিকা লেখা খাতা, কলম আর কালির দোয়াত।

'এবার, মিস্টার ফ্রায়ার,' ব্লাই বললেন, 'সই করো এই খাতায়।'

মৃত্যুর মত নিস্তব্ধ বাউন্টির ডেক। ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ফ্রায়ার। তারপর এগিয়ে গিয়ে কলমটা নিল স্যামুয়েলের কাছ থেকে।

'মিস্টার ব্লাই,' অতি কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করে সে বলল, 'জাহাজের সবাই সাক্ষী থাকল, আপনার নির্দেশ পালন করার জন্যেই কেবল আমি সই করছি। কিন্তু, স্যার, ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে গেল ভাবলে ভুল করবেন আপনি।'

ঠিক সেই সময় মাস্তুলের মাথা থেকে ভেসে এল একটা চিৎকার:

'ডাঙা দেখা যায়!'

চার

ছোট্ট পাহাড়ী দ্বীপটার নাম মেহেতিয়া। অবস্থান তাহিতির চল্লিশ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে। দু'চোখ ভর্তি অবিশ্বাস নিয়ে আমি তাকিয়ে রইলাম দিগন্তরেখার কাছে বিন্দুর মত স্থির অবয়বটির দিকে। সত্যিই তাহলে দক্ষিণ সাগরীয় দ্বীপমালায় এসে গেলাম আমরা! সন্দেহ নেই; বাউন্টি এখন সেদিকেই এগোচ্ছে।

সারারাত ঘুমোতে পারলাম না উত্তেজনায়। দ্বীপটাকে কাছ থেকে দেখতে কেমন লাগবে কল্পনা করতে লাগলাম কেবল।

পরদিন ভোরে, ঠিক সূর্যোদয়ের আগে উপকূলের খুব কাছ দিয়ে মেহেতিয়া দ্বীপকে পেরিয়ে গেল বাউন্টি। জীবনে প্রথমবারের মত দেখলাম নারকেল গাছের সবুজ ঝাঁকড়া টুপি পরা দীঘল শরীর, ঝোপ ঝাড়ের ভেতর

দক্ষিণ সাগরীয় দ্বীপবাসীদের তৃণ ছাওয়া ছোট্ট কুটির। দেখলাম ঝকঝকে কপালি সৈকতে হেঁটে বেড়াচ্ছে ওদের কয়েকজন। বাউন্টিকে দেখা মাত্র ছুটে দ্বীপের ভেতর দিকে চলে গেল তারা। একটু পরেই দলে দলে নারী পুরুষ শিশু এসে ভীড় করল সাগরতীরে। চিৎকার, সেইসাথে বড় বড় সাদা কাপড় নেড়ে ওরা আমাদের আমন্ত্রণ জানাতে লাগল দ্বীপে।

জাহাজ থামিয়ে নৌকা নামানোর নির্দেশ দিলেন ব্লাই। কিন্তু খেয়াল করলাম, মাথায় ফেনার মুকুট পরে বিশাল বিশাল ঢেউ এগিয়ে যাচ্ছে সৈকতের দিকে। এই ঢেউ এড়িয়ে নৌকা তীরে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সেহেতিয়ায় নামতে পারলাম না আমরা। হাত নেড়ে বিদায় জানালাম দ্বীপবাসীদের। ভরা পালে এগিয়ে চলল বাউন্টি।

সবে মাত্র দ্বীপটার উত্তর প্রান্ত পার হয়েছি আমরা, এই সময় মাস্তুলের ওপর থেকে স্মিথ চিৎকার করে উঠল:

'দেখুন, মিস্টার বিয়্যাম!'

ওপর দিকে তাকালাম, হাত তুলে সামনের দিকে ইশারা করে আছে স্মিথ। ওর ইশারা অনুসরণ করে চোখ ফেরাতেই দেখি, অনেক অনেক লিগ দূরে বিশাল এক পাহাড়ের অবয়ব উঠে এসেছে সাগর ফুঁড়ে। সকালের আলোয় ঝলকা নীল, একটু যেন ভৌতিক দেখাচ্ছে। চূড়া থেকে সমান ভাবে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে পাহাড়টার দুই পাশ।

তরতরিয়ে এগোচ্ছে আমাদের জাহাজ। আমি তাকিয়ে আছি। ঘোর লেগেছে যেন চোখে। কতক্ষণ অমন সম্মোহিতের মত দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না, সংবিৎ ফিরতেই ছুটে গেলাম ডেকে। মিস্টার ব্লাইও তাকিয়ে আছেন অবয়বটার দিকে। অদ্ভুত প্রসন্ন দৃষ্টি চোখে। মেজাজটাও সেরকম। আমার পিঠ চাপড়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি।

'ওই যে দেখ,' আঙুল তুলে ইশারা করলেন ব্লাই ভৌতিক অবয়বটার দিকে, 'ওটাই তাহিতি! অবশেষে আসতে পেরেছি আমরা, কি বলো?'

'মনে হচ্ছে খুব সুন্দর দ্বীপটা,' আমি মন্তব্য করলাম।

'সত্যিই সুন্দর—এত সুন্দর আর হয় না। ক্যাপ্টেন কুক ইংল্যান্ডের পর যদি কোন দেশকে ভালবেসে থাকেন তো সে এই তাহিতি। আমিও, বুড়ো বয়েসে যখন হাতে কোন কাজ থাকবে না, জীবনের শেষ দিনগুলো এখানকার নারকেল কুঞ্জের ছায়ায় কাটাতে পারলে আর কিছু চাইব না। এই দেশের মত এর মানুষগুলোও সুন্দর। লম্বা পথ পাড়ি দিতে হলো ওদের কাছে আসতে। কাল রাতে লগ দেখে হিসেব করছিলাম। এ পর্যন্ত কত মাইল জাহাজ চালিয়েছি আমরা জানো? সাতাশ হাজার মাইলেরও বেশি!'

নারকেল নাগাদ দ্বীপটার কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম আমরা।

তাহিতির সবচেয়ে সুন্দর সবচেয়ে ঐশ্বর্যময় অংশ তাইয়ারাপু। তার পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছে বাউন্টি। আমি দাঁড়িয়ে আছি রেলিংয়ের ওপর ভর দিয়ে। কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারছি না দ্বীপটার দিক থেকে। উপকূলের প্রায় মাইল

খানেক এপাশে দীর্ঘ এক প্রবাল প্রাচীর দ্বীপটাকে বেষ্টন করে আছে। সাগরের ঢেউ তাতে বাধা পেয়ে ভেঙে পড়ছে শতধা হয়ে। প্রাচীরের ওপাশে শান্ত লেগুন। সেখানে ক্যানোয় চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে স্থানীয় ইন্ডিয়ানরা। লেগুনের ওপাশে দীর্ঘ বালুকাবেলা। তার ওপাশে সরু একফালি জমি। তাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছবির মত তৃণ ছাওয়া কুটির; আভা, রুটিফল; নারকেলের বাগান। আরও ওপাশে ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে গেছে সবুজ পাহাড়ের ঢাল। একেবারে চূড়া পর্যন্ত গাছপালায় ছাওয়া বিশাল পাহাড়। সবুজের ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পাচ্ছি অসংখ্য রুপালি রেখা। ঝরনা ওগুলো। জল-প্রপাতের মত নেমে এসেছে পাহাড়ের বুক ফুঁড়ে। সত্যিই অদ্ভুত। আমার ইউরোপীয় চোখ বিশ্বাসই করতে চাইছে না, এসব বাস্তব। মনে হচ্ছে, সুন্দর কোন স্বপ্ন দেখছি যেন।

সারাটা বিকেল আমরা প্রবাল প্রাচীরের পাশে পাশে জাহাজ চালিয়ে গেলাম। তাইয়ারাপু এলাকার পর ফাওন, তারপর হিতিআ; অবশেষে সন্ধ্যা যখন হয় হয় তখন পৌঁছুলাম তাইয়ারেই-এর পাহাড়ী উপকূলে। এখানে হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল প্রবাল প্রাচীর। সাগর ভয়ঙ্কর গর্জনে গিয়ে ভেঙে পড়ছে পাহাড়ের পাদদেশে।

বিশাল উপত্যকা প্যাপেনুর সামনাসামনি এসে পাল গোটানোর নির্দেশ দিলেন ব্লাই। সন্ধ্যা হতে বেশি বাকি নেই। আজ আর এগোনো যাবে না। বাতাস পড়ে গেছে। লেগুনের ভেতর জল যেমন স্থির তেমন স্থির প্রকৃতি। বাতাসের প্রবাহ নেই বললেই চলে। নোঙ্গর ফেলল না বাউন্টি। এমনিই ভেসে রইল শান্ত সাগরে।

রাতে খুব একটা ঘুমাতে পারল না নাবিকরা। বহুদিন পর কাল আবার ডাঙার মাটিতে পা রাখতে পারবে ভেবে উত্তেজিত সবাই। যারা স্কার্ভিতে আক্রান্ত তারা ভাবছে ডাঙায় নেমে খেতে পারবে তাজা ফল-মূল, শাক-সব্জি; শিগগিরই আবার সুস্থ সতেজ হয়ে উঠবে তারা।

পরদিন ভোরে, দিনের প্রথম আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম সবাই। রাতের বেলা বেশ খানিকটা পশ্চিমে সরে এসেছে বাউন্টি। এখন আমাদের সোজাসুজি সাগরের ওপাশে শুয়ে আছে ভাইপুপু উপত্যকা। সেখান থেকে ছোট্ট একটা নদী নেমে এসেছে। নদীটা যেখানে সাগরে মিশেছে সে জায়গার নাম পয়েন্ট ভেনাস। এই পয়েন্টে ক্যাপ্টেন কুক তাঁর অস্থায়ী মানমন্দির স্থাপন করেছিলেন শুক্র গ্রহ পর্যবেক্ষণের জন্যে। সে কারণেই জায়গাটার নাম দিয়েছিলেন তিনি পয়েন্ট ভেনাস (শুক্র গ্রহ)। দ্বীপের আরও ভেতর দিকে ভাইপুপু উপত্যকার প্রান্ত থেকে উঁচু হয়ে উঠে গেছে সেই বিশাল পাহাড়টার চূড়া, স্থানীয়রা যার নাম দিয়েছে ওরোহেনা। অন্তত সাত হাজার ফুট হবে ওটার উচ্চতা। সূর্যের প্রথম আলোয় কমলা দেখাচ্ছে পাহাড়টা।

ছোট ছোট দুটো পাল মেলে দিলাম আমরা। ধীর গতিতে এগিয়ে চলল বাউন্টি এক লিগ মত দূরে উপকূলের দিকে। একটু পরে লক্ষ করলাম সৈকতের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে হাজার হাজার দ্বীপবাসী। অসংখ্য ক্যানো জলে ভাসানোর আয়োজন করছে তারা। আমরা আধ লিগ এগোনোর আগেই

দেখলাম ক্যানোয় ক্যানোয় গিজ গিজ করছে মাতাভাই উপসাগর। প্রতিটা ক্যানোরই লক্ষ্য আমাদের জাহাজ। দ্রুত এগিয়ে আসছে সেগুলো।

দেখতে দেখতে একেবারে সামনের ক্যানোগুলো পৌঁছে গেল বাউন্টির কাছে। ইন্ডিয়ানদের চিৎকার শুনতে পেলাম:

'তাইও? পিরিতেন? রিমা?' অর্থাৎ 'বন্ধু? ব্রিটেন? লিমা?' শেষ প্রশ্নটা ওরা করল বাউন্টি পেরুর লিমা থেকে আসা কোন স্প্যানিশ জাহাজ কিনা জানাবার জন্যে।

'তাইও!' জবাব দিলেন ব্লাই। 'তাইও! পিরিতেন!'

কথাটা শেষও করতে পারেননি ব্লাই, একটা ক্যানো ভিড়েছিল বাউন্টির গায়ে–সেটার আরোহীরা রেলিং টপকে এসে নামল ডেকের ওপর।

দেখতে দেখতে তাহিতীয় মানুষে ভরে গেল বাউন্টির ডেক। বেশির ভাগই পুরুষ–দীর্ঘদেহী, সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান সবাই। গায়ের রঙ সামান্য তামাটে। রঙচঙে ছবি আঁকা এক টুকরো কাপড় জড়ানো তাদের কোমরের কাছে, ঊর্ধ্বাঙ্গে কারও কারও কাপড় আছে, কারও নেই। মাথায় নারকেল পাতায় তৈরি মুকুটের মত এক ধরনের জিনিস। স্থানীয়রা একে বলে টাউমাতা। যে দু'চারজন মহিলা এখন এসেছে তাদের সবাই সমাজের নিচু স্তরের মানুষ। তাদের পরনে হাঁটুর নিচে পর্যন্ত ঝুলে পড়া সাদা কাপড়ের কুঁচিওয়ালা স্কার্ট; ঊর্ধ্বাঙ্গে অদ্ভুত দেখতে একটু আঁটো ধরনের আঙরাখা, এমন ভাবে তৈরি যাতে ডান হাতটা মুক্ত থাকে, অনেকটা রোমানদের টোগার মত।

মিস্টার ব্লাই কড়া নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, দ্বীপবাসীদের সাথে কোন অবস্থাতেই যেন আমরা কোন রকম দুর্ব্যবহার না করি। খালি দৃষ্টি রাখতে হবে কোন জিনিস ওরা যেন চুরি বা নষ্ট করার সুযোগ না পায়। সুতরাং ওদের সঙ্গে সাধ্যমত ভাল ব্যবহার করতে লাগলাম আমরা। আমি আমার সিন্দুক থেকে কিছু টুকটাক উপহার এনে দিলাম কয়েকজনকে–ভীষণ খুশি হলো তারা। এমনিতেই হাসিখুশি মানুষগুলো, উপহার পেয়ে এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত বিস্তৃত হলো তাদের হাসি।

অবশেষে উপকূলের কয়েকশো গজের মধ্যে পৌঁছুল বাউন্টি। আর এগোনো নিরাপদ নয় মনে করে পাল গুটিয়ে নোঙ্গর ফেলার নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। এবার, মিছরির ওপর পিঁপড়ে যেমন হামলে পড়ে আমাদের জাহাজটাকে তেমনি করে ছেঁকে ধরল তাহিতীয়রা। শত শত ক্যানো ঘিরে ধরল চারদিক থেকে। প্রত্যেকটার আরোহীরা অন্যগুলোকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কাছাকাছি হতে চাইছে আমাদের। ডেকের ওপর একদল মেয়ের সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করছি আমি, এই সময় আমার ডাক পড়ল ক্যাপ্টেনের কেবিনে।

ঢুকে দেখি কেবিনে একাই আছেন মিস্টার ব্লাই। টেবিলের ওপর বিছানো মাতাভাই উপসাগরের একটা মানচিত্রের ওপর ঝুঁকে আছেন তিনি। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে সোজা হয়ে একটা সিন্দুক দেখিয়ে বসতে ইশারা করলেন।

'তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই, মিস্টার বিয়্যাম,' শুরু করলেন

তিনি। 'এই মাতাভাই উপসাগরে বেশ কয়েক মাস থাকতে হবে আমাদের— যত দিন না মিস্টার নেলসন রুটিফলের চারা সংগ্রহের কাজ শেষ করছেন অন্তত তত দিন। আমি জাহাজের আর সব কাজ থেকে তোমাকে ছুটি দিচ্ছি। এখন থেকে, যতদিন আমরা এখানে আছি, আমার বন্ধু স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কস-এর ইচ্ছানুযায়ী তুমি কাজ করবে। স্যার জোসেফের ইচ্ছা কি তা নিশ্চয়ই তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে আসবার আগে?'

'জি, স্যার।'

'তাহলে আর কি?—তীরে চলে যাও। যোগ্য একজন তাইও খুঁজে বের করো। তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই, সময় নিয়ে ভাল একজন তাহিতীয়কে বেছে নাও। একদিন, দু'দিন, প্রয়োজন হলে এক সপ্তা সময় নাও। একজন ভাল তাইও বেছে নেয়ার ওপরই নির্ভর করছে তোমার কাজের সাফল্য।'

'বুঝতে পেরেছি, স্যার।'

'বেশ তাহলে যাও। সপ্তায় সপ্তায় এসে আমাকে জানিয়ে যাবে তোমার কাজ কেমন এগোচ্ছে।'

ডেকে উঠে আসতেই মুখোমুখি হয়ে গেলাম মিস্টার ফ্রায়ারের।

'ক্যাপ্টেনের সাথে দেখা করে এলে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ।'

'কাল রাতে আমাকে ডেকে নিয়ে উনি বলেছেন, যতদিন এখানে থাকব জাহাজের কোন কাজে যেন তোমাকে না লাগাই। কেন?—তীরে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'ইন্ডিয়ান ভাষার অভিধান তৈরি করবে, তাই না?'

'হ্যাঁ, আমাকে আসলে সেজন্যেই সঙ্গে এনেছেন মিস্টার ব্লাই।'

'বেশ বেশ। একটা কথা, দ্বীপবাসীদের সাথে কোন রকম বিনিময় বা ব্যবসা করতে যেও না, সব ধরনের ব্যবসার দায়িত্ব মিস্টার পেকওভারকে দেয়া হয়েছে। ইচ্ছে হলে উপহার দিতে পারো, বিনিময়ে কিছু নেবে না।'

'মনে থাকবে, স্যার।'

'ইন্ডিয়ানদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যখন খুশি তুমি তীরে যেতে পারো।'

'ধন্যবাদ, স্যার,' বলে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি একটা জোড়া ক্যানো* চলে যাচ্ছে জাহাজের কাছ থেকে। কিছুক্ষণ আগে ডাঙার কোন এক গোত্রপ্রধানের কাছ থেকে উপহার হিসেবে কয়েকটা শূকর নিয়ে এসেছিল ওটা। এখন ফিরে যাচ্ছে। তীরে যাওয়ার জন্যে ভেতরে ভেতরে উদগ্রীব হয়ে উঠেছি আমি। মাস্টারকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওদের সঙ্গে যেতে পারি না?'

'নিশ্চয়ই। ডাকো না চিৎকার করে।'

রেলিংয়ের কাছে ছুটে গিয়ে চিৎকার করে দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম জোড়া

---

* দুটো বড় আকারের ক্যানো পাশাপাশি জুড়ে তৈরি হয় জোড়া ক্যানো। সাধারণ ক্যানোর চার-পাঁচ ক্ষেত্র বিশেষে দশগুণ পর্যন্ত হয় এগুলোর মাল ও মানুষ বহনের ক্ষমতা।

ক্যানোর আরোহীদের। ইশারায় জানালাম আমি ওদের সাথে তীরে যেতে চাই। মনে হলো আমার ইশারা বুঝতে পারল ওরা। ক্যানোর পেছন দিকে বসা দলনেতা গোছের এক লোক কি একটা নির্দেশ দিল দাঁড়ীদের। অমনি ক্যানোর মুখ ঘুরে গেল আমাদের দিকে। কয়েক মিনিটের ভেতর আবার বাউন্টির গায়ে এসে ভিড়ল ওটা। রেলিং টপকে আমি নেমে গেলাম। একটু পরেই আবার তীরের দিকে চলতে লাগল ক্যানোটা।

ডাঙায় পা রাখা মাত্র দলে দলে নারী পুরুষ ঘিরে ফেলল আমাকে। সংখ্যায় তারা এত বেশি, আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ভয় ভাঙতে বেশিক্ষণ লাগল না অবশ্য। মানুষগুলো খুবই ভদ্র, রীতিমত সুসভ্য বলা যায়। ওদের চোখে মুখে অপার বিস্ময় আর আমাকে স্বাগত জানানোর আকুতি ছাড়া অন্য কোন অনুভব নেই। বাচ্চারা মায়েদের স্কার্টের প্রান্ত আঁকড়ে ধরে আছে, ওরাও অবাক বিস্ময়ে দেখছে আমাকে। আর ওদের মা বাবারা ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে আসতে চাইছে আমার সাথে করমর্দন করার জন্যে। হ্যাঁ, পরে জেনেছিলাম, প্রিয় বা শ্রদ্ধেয় কাউকে স্বাগত জানানোর জন্যে করমর্দনের রেওয়াজ চালু আছে তাহিতীয়দের ভেতর।

হঠাৎ গম্ভীর একটা গলা ভেসে এল ওপাশ থেকে। জনতা দুপাশে সরে মাঝ বয়েসী দীর্ঘদেহী এক লোককে এগিয়ে আসার পথ করে দিল। সেই সাথে মৃদু একটা গুঞ্জন শোনা গেল:

'ও হিটিহিটি!'

মসৃণ-কামানো গাল লোকটার, বেশির ভাগ ইন্ডিয়ান পুরুষদের ভেতর যেটা দেখা যায় না। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, জায়গায় জায়গায় ধূসরের ছোপ লেগেছে। অদ্ভুত সুন্দর কারুকাজ করা আলখাল্লা তার পরনে। লম্বায় ছ'ফুটের ওপরে। দারুণ স্বাস্থ্য। সাধারণ তাহিতীয়দের চেয়ে ফর্সা গায়ের রঙ। মুখে সরল, প্রাণখোলা–একটু যেন কৌতুকপূর্ণ অভিব্যক্তি। প্রথম দর্শনেই বুঝতে পারলাম এ লোক সাধারণ কেউ নয়। নিশ্চয়ই কোন গোত্রপতি বা গোত্রপতির পরিবারের সদস্য।

এগিয়ে এল সে। দু'হাতে আমার দু'কাঁধ ধরে আমার গালে নাক ঠেকিয়ে লম্বা করে শ্বাস টানল কয়েকবার। ব্যাপারটার আকস্মিকতায় প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও একটু পরেই বুঝতে পারলাম এ এক ধরনের অভিবাদন জানানোর রীতি। ক্যাপ্টেন কুক যার নাম দিয়েছিলেন 'নাক-ঘষা'।

আমাকে ছেড়ে দিয়ে লোকটা তার প্রশস্ত বুকের ওপর আঙুল ঠেকিয়ে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল: 'আমি হিটিহিটি। তুমি মিডশিপম্যান! কি নাম?'

আরও একবার বিস্মিত হওয়ার পালা আমার। ইংল্যান্ড থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে প্রায় অসভ্য এই ইন্ডিয়ানদের দেশে ইংরেজি কথা শুনব স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। কয়েক মুহূর্ত কোন কথা যোগাল না আমার মুখে। হিটিহিটি আবার করল প্রশ্নটা:

'কি নাম?'

'বিয়্যাম,' জবাব দিলাম আমি।

'বিয়্যাম! বিয়্যাম!' সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে উচ্চারণ করল হিটিহিটি। এদিকে জনতার মুখে মুখেও প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করেছে, 'বিয়্যাম! বিয়্যাম! বিয়্যাম!'

দীর্ঘদিন ধরে যে জিনিসের জন্যে আমার প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছে সে জিনিস চাইলাম এবার। বললাম, 'একটু খাওয়ার পানি দিতে পারো আমাকে?'

হিটিহিটি চমকে উঠে আমার হাত ধরল। চিৎকার করে চারপাশের লোকদের দিকে তাকিয়ে কি একটা নির্দেশ দিল। অমনি ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে কয়েকজন ছুটল দ্বীপের ভেতর দিকে। হিটিহিটি আমার হাত ধরে সৈকতের ঠিক পেছনে একটা খোলা একচালার কাছে নিয়ে গেল। কয়েকজন তরুণী দ্রুত একটা মাদুর পেতে দিল। বসলাম আমরা। পাশাপাশি। একটু পরেই, যারা ছুটে চলে গিয়েছিল তারা ফিরে এল। এক জনের হাতে বড়সড় একটা শুকনো লাউয়ের খোল। টলটলে পানি তাতে। আমার দিকে এগিয়ে দিল। এক নিশ্বাসে আমি খোলটার অর্ধেক খালি করে ফেললাম।

এর পর একজন একটা ডাব কেটে এনে দিল–প্রথমবারের মত আমি স্বাদ নিলাম দক্ষিণ সাগরীয় এলাকার এই শীতল, মিষ্টি মদের। বড় একটা পাতা বিছিয়ে দেয়া হলো পাশে। কয়েকজন তরুণী পাকা কলা এবং আরও কয়েক রকমের ফল এনে রাখল তার ওপর। হিটিহিটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'খাও!'

লোভীর মত ফলগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাব, এমন সময় উল্লসিত একটা চিৎকার ভেসে এল সৈকতের দিক থেকে। ঘাড় ফেরাতেই দেখলাম বাউন্টির বড় নৌকাটা এগিয়ে আসছে ফেনাময় ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে। ব্লাই বসে আছেন তার পেছন দিকে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল হিটিহিটি।

'ও পারাই!' সবিস্ময়ে চিৎকার করল সে। ব্লাই শব্দটা তার অনভ্যস্ত উচ্চারণযন্ত্রের হাতে পড়ে 'পারাই' হয়ে গেছে দেখে বেশ মজা পেলাম আমি। একটু পরেই আবার সে বসল আমার পাশে। বলল, 'তুমি, আমি, তাইও, হ্যাঁ?'

আমি কিছু বলার আগেই আবার সে উঠে দাঁড়াল। ছুটল সৈকতের দিকে। নৌকাটা পৌঁছে গেছে তীরে। আমিও উঠে এগোলাম তার পেছন পেছন।

সবার আগে হিটিহিটিই অভ্যর্থনা জানাল ব্লাইকে, যেন কত দিনের পরিচিত দু'জন। ব্লাইয়ের মুখেও দেখলাম পরিচিতের হাসি।

'হিটিহিটি,' প্রৌঢ় তাহিতীয় লোকটার করমর্দন করতে করতে তিনি বললেন, 'একদম আগের মতই আছ। পাকা চুলগুলো না থাকলে বুঝতেই পারতাম না তোমার বয়েস বেড়েছে।'

হাসল হিটিহিটি। 'দশ বছর, হ্যাঁ? অনেক সময়! তুমি মোটা হয়েছ, পারাই!'

এবার হাসার পালা ক্যাপ্টেনের।

'আসো, আসো,' হিটিহিটি বলে চলল। 'অনেক শুয়োর খাও! ক্যাপ্টেন টুট (কুক) কই? শিগগির আসবে তাহিতিতে?'

'বাবার কথা জিজ্ঞেস করছ?'

অবাক চোখে ব্লাইয়ের দিকে তাকাল হিটিহিটি। 'ক্যাপ্টেন টুট তোমার বাবা!?'

'হ্যাঁ—তুমি জানতে না?'

কয়েক মুহূর্ত বিস্মিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল ইন্ডিয়ান গোত্রপতি। তারপর অদ্ভুত এক খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। হাত উঁচু করে জনতাকে চুপ করতে বলে উদাত্ত স্বরে ভাষণ দিতে লাগল সে। ব্লাই পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, এই ফাঁকে আমার কানে কানে বললেন:

'সবাইকে বলে দিয়েছি, ক্যাপ্টেন কুকের মারা যাওয়ার খবরটা যেন ইন্ডিয়ানদের না জানায়। তুমিও খেয়াল রেখো, মুখ ফস্কে কখনও যেন বলে বোসো না কুক নেই। আমি কুকের ছেলে কথাটা ওদের বিশ্বাস করাতে পারলে সহজে আমাদের কাজ উদ্ধার হবে।'

ব্লাইয়ের কথা যে কতখানি সত্যি বুঝতে পারলাম একটু পরেই হিটিহিটির ভাষণ শেষ হতেই গুঞ্জন উঠল সমবেত তাহিতীয়দের ভেতর। উত্তেজিত ভঙ্গিত কথা বলছে সবাই। অদ্ভুত কৌতূহল এবং বিস্ময়ের সঙ্গে তাকাচ্ছে ব্লাইয়ের দিকে। বুঝলাম ওদের চোখে ক্যাপ্টেন কুকের ছেলে মানে ছোটখাট দেবতা বিশেষ। ক্যাপ্টেন কুক নিজে তাহলে কি ছিলেন সহজেই অনুমান করতে পারলাম।

এখানে সুযোগ পেয়ে আমি মিস্টার ব্লাইকে জানালাম, হিটিহিটি আমার তাইও হতে চেয়েছে।

'চমৎকার!' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন ব্লাই। 'ও এখানকার বড়সড় একজন গোত্রপতি। ওকে তাইও হিসেবে পেলে অনেক সহজ হয়ে যাবে তোমার কাজ।' ইন্ডিয়ান লোকটার দিকে ফিরে ডাকলেন তিনি, 'হিটিহিটি!'

'হ্যাঁ, পারাই।'

'মিস্টার বিয়্যাম বলল, তুমি আর ও নাকি বন্ধু হয়েছ?'

মাথা ঝাঁকাল হিটিহিটি। 'আমি, বিয়্যাম তাইও!'

'বেশ বেশ!' বললেন ব্লাই। 'মিস্টার বিয়্যাম আমাদের দেশের এক গোত্রপতির ছেলে। তোমাদের জন্যে নানা রকম উপহার নিয়ে এসেছে ও; বিনিময়ে, আমি চাই, তোমার বাড়িতে রাখবে ওকে। যে ক'দিন আমরা এখানে আছি ও তোমাদের ভাষা শিখবে, লিখে নেবে। তাহলে ভবিষ্যতে যে সব বৃটিশ নাবিক এখানে আসবে তারা তোমাদের সাথে তোমাদের ভাষায়ই কথা বলতে পারবে। বুঝেছ আমার কথা?'

কোন জবাব না দিয়ে আমার মুখোমুখি দাঁড়াল হিটিহিটি। বিশাল একটা থাবা বাড়িয়ে ধরে মৃদু হেসে বলল, 'তাইও, হ্যাঁ?'

আমরা হাত মেলালাম।

তক্ষুণি একটা ক্যানো জলে ভাসানো হলো আমার সব মালপত্র বাউন্টি থেকে নিয়ে আসার জন্যে। সে রাত থেকেই আমি ঘুমাতে লাগলাম আমার নতুন বন্ধু মাহিনা ও আহোনু গোত্রের প্রধান এবং ফারেরোই মন্দিরের

বংশানুক্রমিক প্রধান পুরোহিত হিটিহিটিতে-আতুয়াই-ইরি-হাউ-এর বাড়িতে।

পাঁচ

তীরে কিছু সময় কাটিয়ে জাহাজে ফিরে গেলেন ব্লাই। আমার হাত ধরে নিজের বাড়ির পথে এগোল আমার তাইও।

পয়েন্ট ভেনাস হয়ে দ্বিতীয় একটা লম্বা অর্ধচন্দ্রাকার সৈকত ঘুরে পুব দিকে কিছুদূর যাওয়ার পর সাগর তীরে সবুজ ঘাসে ছাওয়া এক টুকরো জমির ওপর হিটিহিটির বাড়ি। তীর থেকে কয়েকশো গজ মাত্র দূরে ছোট্ট একটা প্রবাল প্রাচীর খোলা সাগর থেকে আড়াল করে রেখেছে জায়গাটাকে। প্রবাল প্রাচীর আর সবুজ জমিটুকুর মাঝখানে একটা লেগুন। উষ্ণ নীল জল সেখানে। বাতাসের মত পরিষ্কার। গভীরতা দুই কি তিন ফ্যাদম হবে খুব বেশি হলে।

হিটিহিটির বাড়িটা চমৎকার–অবশ্যই আর দশটা তাহিতীয় বাড়ির তুলনায়। লম্বায় ষাট ফুট মত, চওড়ায় বিশ ফুট। বিরাট দোচালা। ঘাসের ছাউনি। প্রান্ত দুটো অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে যাওয়ায় ডিম্বাকৃতি চেহারা নিয়েছে ঘরটা। সামনে পরিষ্কার নিকানো উঠান। আমরা সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই এক দঙ্গল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ঘিরে ধরল আমার তাইওকে। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে হিটিহিটি বলল:

'আমার নাতি-নাতনী।'

হিটিহিটির বয়েস খুব বেশি হলে পঞ্চাশ। এই বয়েসে এতগুলো নাতি নাতনীর দাদা বা নানা হতে পারা কম সৌভাগ্যের ব্যাপার নয়! কয়েকটা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে পা বেয়ে উঠে গেল ওর কাঁধে। বাকিরা কৌতূহলী চোখে নিরীক্ষণ করছে আমার 'অদ্ভুত' পোশাক আশাক।

বাচ্চাদের হৈ-চৈ শুনে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের সুন্দরী এক মেয়ে। দুধে আলতা গায়ের রঙ, অপূর্ব দেহবল্লরী। সবচেয়ে আশ্চর্য যেটা, মেয়েটার চোখ দুটো নীল! কোন অইউরোপীয় মেয়ের চোখ এমন নীল হতে পারে আমার ধারণা ছিল না। পরে জেনেছিলাম মেয়েটা বিবাহিতা এবং দু'সন্তানের জননী। হিটিহিটি আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে মেয়ের দিকে ফিরল।

'ও হিনা,' পরিচয় করিয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে শুরু করল সে। তারপর একটানা বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে গেল। তাইও শব্দটা উচ্চারণ করতে শুনলাম কয়েকবার এছাড়া আর একটা কথাও আমি বুঝলাম না। বাবার কথা শেষ হতেই হিনা এগিয়ে এসে আমার সাথে করমর্দন করল, আমার গালে নাক ঠেকিয়ে লম্বা করে শ্বাস টানল, হিটিহিটি যেমন করেছিল। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে, খাবার আয়োজনের কতদূর তার খোঁজ খবর করতে।

এই সময় ঘর থেকে বেরিয়ে এল আরেকটা মেয়ে। হিনার চেয়ে সুন্দরী। বছর সতেরো হবে বয়েস। চেহারায় আচরণে গর্বিত ভঙ্গি। নাম মাইমিতি। হিটিহিটি আমার পরিচয় দিতেই হিনার মত মাইমিতিও করমর্দন করে, গালে নাক ঘষে অভিবাদন জানাল আমাকে। ইতোমধ্যে হিনা ফিরে এসেছে। মাইমিতির সাথে আমার পরিচয় পর্ব শেষ হতেই সে জানাল, খাবার তৈরি, এখন খেতে বসলেই হয়। মাথা ঝুঁকিয়ে আমার হাত ধরে খাওয়ার ঘরের দিকে এগোল হিটিহিটি।

প্রায় একশো গজ দূরে ঝোপ ঝোপ মত হয়ে থাকা কতগুলো লোহা গাছের নিচে একটা খোলা একচালায় হিটিহিটির খাওয়ার ঘর। পাশেই রান্না ঘর। কোন মহিলা নেই সেখানে। হিটিহিটির রাঁধুনিরা সবাই পুরুষ। খাবার ঘরের আঙিনা পর্যন্ত আমাদের পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেল হিনা আর মাইমিতি। পুরুষদের খাওয়ার ঘরে প্রবেশাধিকার নেই ওদের, এমনকি উপস্থিত থাকা পর্যন্ত নিষিদ্ধ।

তাহিতির পুরুষরা মেয়েদের সঙ্গ খুবই পছন্দ করে। সমাজে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা আছে মেয়েদের, স্বাধীনতাও পুরুষের প্রায় সমান, তবু ইন্ডিয়ানরা বিশ্বাস করে পুরুষরা আকাশ অর্থাৎ স্বর্গ থেকে এসেছে আর নারীর জন্ম পৃথিবীতে। পুরুষরা, অর্থাৎ পবিত্র আর নারী নোয়া, অর্থাৎ সাধারণ। গুরুত্বপূর্ণ দেব-দেবীদের মন্দিরে ঢোকা দূরের কথা, পা রাখাও নারীদের জন্যে নিষিদ্ধ। এই একই কারণে পুরুষের সঙ্গে এক সাথে বসে খাওয়াও নিষিদ্ধ করা হয়েছে নারীর জন্যে। পুরুষের রান্নাটা পর্যন্ত করার অধিকার দেয়া হয়নি নারীকে। এই একটা ব্যাপার ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রে নারী পুরুষে কোন ভেদ নেই তাহিতীয় সমাজে।

মুখোমুখি খেতে বসলাম আমি আর হিটিহিটি। পরিবেশনের দায়িত্বে আছে একাধিক ভৃত্য। শুরুতেই পানিভর্তি দুটো নারকেলের মালা নিয়ে এল একজন। হাত এবং মুখ ধুয়ে নিল আমার তাইও। দেখাদেখি আমিও ধুলাম। এর পর শুরু হলো খাবার দেয়া। প্রথম পরিবেশিত হলো ঝলসানো মাছ, সঙ্গে রান্না করা কলা। এর পর একে একে এল শুয়োরের মাংস, নিরামিষ তরকারি, পুডিং-এর মত এক ধরনের খাবার। এ ছাড়াও দেয়া হলো চালের তৈরি এক ধরনের চাটনি আর ডাবের মিষ্টি সর।

সত্যিই চমৎকার রান্না হিটিহিটির রাঁধুনিদের। তাছাড়া গত কয়েকটা মাস বাউন্টিতে, সত্যিকথা বলতে কি, অর্ধাহারে কাটিয়েছি। আমার ইংল্যান্ডের সম্মান বাঁচানোর জন্যে কম করে খাব ভেবেও তিন জনের সমান খেলাম আমি। কিন্তু আমার তাইও লজ্জায় ফেলে দিল আমাকে। প্রাণপণ চেষ্টায় আমি যখন খাওয়া শেষ করলাম তখনও দেখি সে খেয়ে চলেছে। বিশাল একেক টুকরো মাছ, মাংস মুখে পুরছে আর চিবোচ্ছে। আমি যদি তিন জনের সমান খেয়ে থাকি ও খেলো কমপক্ষে সাতজনের সমান। অবশেষে খাওয়া শেষ হলো তার। লম্বা করে একটা নিশ্বাস ফেলে হাত ধোয়ার পানি চাইল সে।

'খাওয়া শেষ– এবার ঘুম,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল হিটিহিটি।

কাছেই সৈকত। চওড়া একটা মাদুর পেতে দেয়া হলো সেখানকার একটা 'পুরাউ' গাছের নিচে। পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম দু'জন দিবানিদ্রা দেয়ার জন্যে। তাহিতীয়দের রীতিই এই, দুপুরে ভরপেট খাওয়ার পর দিবানিদ্রা না দিলে চলে না তাদের।

আমার জীবনের একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা এইভাবে। আজ এত বছর পরেও যখন সেদিনগুলোর স্মৃতি মনে পড়ে অপূর্ব এক আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠি আমি। পৃথিবীর কোন চিন্তা কোন ভাবনা সে সময় আমার ছিল না, সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলাম অভিধানের কাজে।

হিটিহিটির বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে সেই ছোট্ট নদী, পয়েন্ট ভেনাসে যেটা সাগরে পড়েছে। রোজ ভোরে ঘুম থেকে উঠে ওই নদীতে স্নান করে এসে ফল-মূল দিয়ে হালকা নাশতার পর কাজ শুরু করি। কাজ মানে হিটিহিটির সঙ্গে কথা বলা। বিভিন্ন শব্দ শুনে নিখুঁতভাবে লিখে নেয়ার চেষ্টা করি উচ্চারণগুলো। কোন শব্দ বুঝতে অসুবিধা হলে একাধিকবার উচ্চারণ করতে বলি। তারপর বোঝার চেষ্টা করি অর্থ। হিটিহিটি ছাড়াও এ কাজে আমাকে সাহায্য করছে ওর মেয়ে হিনা আর ভাইঝি মাইমিতি।

যতক্ষণ না মাছ ধরা ক্যানোগুলো সাগর থেকে ফিরে আসে ততক্ষণ অর্থাৎ এগারোটা বারোটা পর্যন্ত চলে আমার এই কাজ। এরপর রাঁধুনিরা রান্না চড়ায়। আরেকবার স্নান করে আসি আমি। এবার সাগর থেকে। এরপর হিটিহিটির সঙ্গে দুপুরের খাওয়া এবং দিবানিদ্রা। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে হিটিহিটি বা তার পরিবারের অন্য কোন সদস্যের সাথে বেড়াতে বেরোই। কখনও সাগর পাড়ে, কখনও পাহাড়ে, কখনও বা ওদের কোন আত্মীয় বা বন্ধুর বাসায় যাই। সন্ধ্যার পর একে একে জ্বলে ওঠে ক্যান্ডল নাটের প্রদীপ। বিরাট মাদুরে বসে গল্প করি হিটিহিটির পরিবারের সদস্যদের সাথে। যতক্ষণ না একে একে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে ততক্ষণ চলে গল্প।

ওদের বাড়িতে প্রথম যেদিন পৌঁছুলাম সেদিন বিকেলে, দিবানিদ্রার পর ঘরে ফিরে আমার জাহাজী সিন্দুকটা খুললাম। পরিবারের প্রতিটি সদস্য ঘিরে দাঁড়িয়েছে আমাকে। অপার কৌতূহল আর বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে। সিন্দুকটা যেন যাদুর বাক্স। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে ওরা ভেতর থেকে কি বের হয় দেখার জন্যে। একে একে বের করলাম আমি রেতি, বড়শি, কাঁচি, ছোট ছুরি; মেয়েদের চুড়ি, হার, কানের দুল ইত্যাদি ইত্যাদি। হিটিহিটির পরিবারের প্রত্যেককে–যার জন্যে যেটা উপযোগী বুঝে দিলাম কিছু না কিছু। কি খুশি যে ওরা হলো–একেবারে বাচ্চা থেকে নিয়ে হিনা, মাইমিতি এমন কি হিটিহিটি পর্যন্ত–ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। কিছুদিন যেতে না যেতে অবশ্য বুঝেছিলাম হিটিহিটির মত ইন্ডিয়ানের বন্ধুত্ব অর্জন করার জিনিস। এ জিনিস কেনা যায় না, সে যত মূল্যই দিতে চাই না কেন। ও, ওর মেয়ে আর ভাস্তি আন্তরিক ভাবে পছন্দ করে আমাকে। নানাভাবে তার প্রমাণ পেয়েছি। আমি নিশ্চয়ই আমার কলম, কালি, কাগজ আর অসংখ্য প্রশ্ন নিয়ে একটা

আপদ বিশেষ ওদের কাছে; কিন্তু কখনও বিরক্ত হতে দেখিনি একজনকেও। অসীম ধৈর্যের সাথে ওরা শোনে আমার প্রশ্ন, সাধ্যমত উত্তর দিয়ে যায়। কখনও কখনও মাইমিতি বা হিনা কপট হতাশার ভঙ্গিতে দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বলে, 'হয়েছে, হয়েছে, এবার শেষ করো, বিয়্যাম, আমার মাথায় আর কিছু আসছে না!' বা হিটিহিটি ঘণ্টা খানেক একটানা আমার প্রশ্নের জবাব দেয়ার পর বলে, 'এবার চলো ঘুমাই, বিয়্যাম! এক দিনে এত চিন্তা ভাবনা করলে নিশ্চয়ই তোমার–সেই সাথে আমারও মাথা বিগড়ে যাবে!' কিন্তু পরদিন সকালে দেখি আবার ওরা তৈরি আমাকে সাহায্য করার জন্যে।

প্রতি রোববার আমি আমার অভিধানের পাণ্ডুলিপি বগলদাবা করে বাউন্টিতে গিয়ে উঠি। মিস্টার ব্লাইকে জানাই আমার কাজের অগ্রগতি। গভীর আগ্রহ নিয়ে আমার কথা শোনেন ব্লাই। পাণ্ডুলিপিটা উল্টে পাল্টে দেখেন। তারপর নিজের কাজ কদ্দূর এগিয়েছে সে সম্পর্কে বলেন দু'চার কথা। হিটিহিটির বাড়ি থেকে প্রথম যে রবিবার বাউন্টিতে গেলাম সেদিন জানতে পারলাম, তীরে মিস্টার ব্লাই-এর নির্দেশে বিরাট এক তাঁবু খাটানো হয়েছে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানী নেলসন আর তার সহকারী ব্রাউন এখন সেখানেই থাকেন। রুটিফলের চারা সংগ্রহ এবং পরিচর্যার জন্যে সাতজন লোক দেয়া হয়েছে ওদের অধীনে। আমার মত নেলসনও দু'তিন দিন পর পর জাহাজে গিয়ে ক্যাপ্টেনকে জানিয়ে আসেন অগ্রগতির খবর।

রুটিফলের চারার খোঁজে রোজ দ্বীপের এখানে ওখানে ঘুরতে হয় নেলসনকে। দ্বীপের সব গোত্রপতি তাদের প্রজাদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছে, নেলসন যখন যা চাইবেন যেন দেয়া হয় তাঁকে। অদ্ভুত এক কৌশল খাটিয়ে ব্যাপারটা সম্ভব করেছেন ব্লাই। মাতাভাই এ নোঙ্গর ফেলার দু'তিন দিন পর এক সকালে তাহিতির সব গোত্রপতিকে বাউন্টিতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তিনি। সবাইকে প্রচুর পরিমাণে উপহার–বেশির ভাগই আমি যে সব জিনিস হিটিহিটির পরিবারের সদস্যদের দিয়েছি সে ধরনের–দিয়ে ব্লাই বলেছিলেন, এসব উপহার তাদের জন্যে শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ পাঠিয়েছেন ইংল্যান্ডের রাজা জর্জ। তারপর তিনি সবিনয়ে জানিয়েছিলেন তাঁর আসার কারণ। শুনে এক সাথে লাফিয়ে উঠছিল সব ক'জন গোত্রপতি। এত সহজে রাজা জর্জকে খুশি করা যাবে যেন ভাবতেই পারেনি তারা। বলেছিল, 'যে মূল্যবান উপহার আমাদের জন্যে পাঠিয়েছেন রাজা জর্জ তার বিনিময়ে যা চেয়েছেন সে অতি সামান্য। যত খুশি রুটিফলের চারা তুমি নিতে পারো, পারাই।'

সমাধান হয়ে গেল সমস্যার। নেলসন দ্বীপে ঘুরে ঘুরে চারা সংগ্রহ করে সাগরতীরের তাঁবুতে নিয়ে আসেন। সেখানে সেগুলোর পরিচর্যা চলে, ছোট ছোট মাটির পাত্রে লাগানো হয়। এখন কেবল সংগ্রহ চলছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক চারা যোগাড় হয়ে গেলে এক সাথে সব নিয়ে যাওয়া হবে জাহাজে।

আমাদের নাবিক যারা জাহাজে আছে তাদের সাথে আলাপ করে মনে হলো ক্যাপ্টেনের দুর্ব্যবহারের কথা ভুলে গেছে তারা। নিয়ম শৃঙ্খলার কড়াকড়ি

অনেক শিথিল করা হয়েছে। অবসর সময়ে যে কেউ ইচ্ছে হলেই দ্বীপে যেতে পারে। একমাত্র সার্জন ওল্ড ব্যাকাস ছাড়া আর সবাই স্থানীয়দের ভেতর থেকে একজন করে তাইও বেছে নিয়েছে। ব্যাকাস তাইও নেননি কারণ তাঁর ধারণা ইন্ডিয়ানদের সাথে বন্ধুত্ব করার চেয়ে কেবিনে বসে মদ খাওয়া ভাল। প্রায় প্রতিদিনই তাইওদের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করতে যায় নাবিকরা। তাইওরা খাওয়ায় প্রাণ খুলে। ছোটখাট তুচ্ছ কিছু উপহারের বিনিময়ে এই সেবা সত্যিই দুর্লভ।

দেখতে দেখতে পনেরো দিন কেটে গেল হিটিহিটির বাড়িতে। তারপর এক সকালে অবাক হয়ে দেখলাম আমার জাহাজী বন্ধুদের কয়েকজন এসেছে আমার সাথে দেখা করতে।

হিনা, মাইমিতি, হিনার স্বামী টুয়াটাউ আর আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম সৈকতে। দূরে নোঙ্গর করে আছে বাউন্টি। একটু আগে একটা জোড়া ক্যানোয় চেপে বাউন্টিতে গেছে আমার তাইও। দুপুরে ব্লাই-এর সাথে খাওয়ার দাওয়াত তার। আমরা এসেছিলাম হিটিহিটিকে ক্যানোয় তুলে দিতে। বেশ কিছুক্ষণ আগে বাউন্টির গায়ে ভিড়েছে ক্যানোটা। খাওয়া দাওয়ার পর ফিরে আসবে হিটিহিটিকে নিয়ে।

কিছুক্ষণ সাগর পাড়ে কাটিয়ে বাড়ির পথ ধরব, এমন সময় হিনা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'বিয়্যাম, দেখ!'

হিনার ইশারা অনুসরণ করে তাকালাম আমি। একটু যেন চমকালাম। তীরের দিকে এগিয়ে আসছে জোড়া ক্যানোটা! কি ব্যাপার?—ব্লাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া হলো নাকি হিটিহিটির? তাছাড়া আর কোন কারণ তো দেখছি না ওর ফিরে আসার।

একটু পরেই অবশ্য উদ্বেগ দূর হলো। ক্যানোটা আধাআধি পথ আসতে খেয়াল করলাম, দাঁড়ীরা ছাড়াও সাদা চামড়ার তিনজন মানুষ বসে আছে ওটার পেছন দিকে। আরেকটু এগিয়ে আসার পর চিনতে পারলাম শ্বেতাঙ্গ তিনজনকে—ক্রিশ্চিয়ান, গোলন্দাজ পেকওভার আর—আর, কি আশ্চর্য, আমাদের ওল্ড ব্যাকাস! ইন্ডিয়ানদের সাথে সময় কাটানোর চেয়ে কেবিনে বসে মদ খাওয়া ভাল মনে হয় যার কাছে সেই ওল্ড ব্যাকাস!

অবশেষে তীরে ভিড়ল ক্যানো। সবার আগে লাফ দিয়ে নামলেন সার্জন। কাঠের পা টেনে টেনে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে।

'আহ্, বিয়্যাম,' বললেন তিনি, 'প্রথমে তো চিনতেই পারিনি তোমাকে! ইন্ডিয়ানদের পোশাক পরে একেবারে ইন্ডিয়ান হয়ে গেছ ক'দিনেই! তারপর, দিনকাল চলছে কেমন?'

'এই তো,' মৃদু হেসে আমি বললাম। 'তা হঠাৎ আপনি এত কষ্ট করে ডাঙায়?'

'হ্যাঁ, ক্রিশ্চিয়ান আর পেকওভারকে আসতে দেখে ভাবলাম আমিও এক চক্কর ঘুরে যাই। অনেকদিন তোমাকে দেখি না। দেখে যাই, সেই সাথে

টেনেরিফের মদ দু'এক বোতল খাইয়েও যাই। কই, পেকওভার, বোতলগুলো নামাও।'

ক্রিশ্চিয়ান এগিয়ে এসে করমর্দন করল আমার সাথে। আমি হিনা, মাইমিতি, ও হিনার স্বামীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম ওর। ওল্ড ব্যাকাস এবং পেকওভারের সাথেও পরিচয় করিয়ে দিলাম। এরপর হিনার নেতৃত্বে হিটিহিটির বাড়ির দিকে এগোলাম আমরা। ভৃত্য শ্রেণীর এক লোক মদের বোতলগুলো নিয়ে আসতে লাগল পেছন পেছন। হাঁটতে হাঁটতে একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম, মাইমিতি একটু পরপরই আড়চোখে দেখছে ক্রিশ্চিয়ানকে। ক্রিশ্চিয়ানও একই ভঙ্গিতে তাকাচ্ছে মাইমিতির দিকে।

অবশেষে হিটিহিটির শীতল বারান্দায় গিয়ে বসলাম আমরা। হিনা গিয়ে রাঁধুনিদের রান্না চড়ানোর নির্দেশ দিয়ে এল। পথে আসতে আসতেই ও জানিয়ে দিয়েছে নতুন অতিথিরা কেউ না খেয়ে ফিরতে পারবে না।

বসতে না বসতেই ভৃত্যের কাছ থেকে একটা বোতল নিয়ে খুলে ফেললেন ব্যাকাস। বলেছিলেন বটে বোতলগুলো এনেছেন আমাকে খাওয়াবেন বলে, কিন্তু সময় মত দেখা গেল আমার কথা মনেই নেই বৃদ্ধ সার্জনের। দীর্ঘ এক চুমুক দিয়ে বোতলটা তিনি এগিয়ে দিলেন পেকওভারের দিকে। হিনার স্বামী তৃষিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে পেকওভার একটা চুমুক দিয়ে ওটা এগিয়ে দিল তার দিকে। একটু পরেই দ্বিতীয়, তারপর তৃতীয় বোতল খোলা হলো। রান্না হতে কিছু সময় লাগবে তাই ওদের ইচ্ছেমত মদ খাওয়ার সুযোগ দিয়ে আমি, ক্রিশ্চিয়ান, মাইমিতি আর হিনা বেরোলাম নদীর পাড় থেকে হেঁটে আসার জন্যে।

আবার শুরু হলো ক্রিশ্চিয়ান আর মাইমিতির চোরা দৃষ্টি বিনিময়।

পাশাপাশি হাঁটছি চারজন। হঠাৎ খেয়াল করলাম, চারজন নয়, দু'জন আছি পাশাপাশি—আমি আর হিনা। কোথায় গেল আর দু'জন? ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, আমাদের খানিকটা পেছনে হাত ধরাধরি করে আসছে ক্রিশ্চিয়ান আর মাইমিতি। এখন আর চোরা চোখে নয়, সরাসরিই তাকাচ্ছে একজন আরেক জনের দিকে।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হাসল ক্রিশ্চিয়ান। বলল:

'প্রত্যেক নাবিকের একজন মনের মানুষ থাকা দরকার। আমার এতদিন ছিল না, এবার পেয়েছি।'

ছয়

মাইমিতির সাথে পরিচয় হওয়ার পর থেকে সুযোগ পেলেই আমাদের সাথে দেখা করতে চলে আসে ক্রিশ্চিয়ান। আসলে আমাদের সাথে তো নয়, আসে মাইমিতির সাথে দেখা করতে। ভাষার ব্যবধান সত্ত্বেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা দু'জন

এক সাথে কাটায়, হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়ায় সৈকতে, পাহাড়ে, বনে। কিছুদিনের ভেতর সবাই মাইমিতির প্রেমিক হিসেবে মেনে নিল ওকে।

যখনই তীরে আসে মাইমিতি এবং অন্যদের জন্যে কিছু না কিছু উপহার নিয়ে আসে ক্রিশ্চিয়ান। সে কারণে সবাই ওকে পছন্দ করে। সত্যি কথা বলতে কি ওর জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে, মাইমিতি তো বটেই, অন্যরাও।

এভাবে কেটে গেল প্রায় এক মাস। তারপর এক রাতে…

আমি তখন ঘুমিয়ে। হঠাৎ কাঁধে কারও আলতো স্পর্শ পেয়ে জেগে উঠলাম। ক্যান্ডল নাটের প্রদীপ জ্বলছে ঘরের ভেতর। তার অস্পষ্ট আলোয় দেখলাম ক্রিশ্চিয়ান ঝুঁকে আছে আমার ওপর। ওর পাশে মাইমিতি।

'সৈকতে এসো, বিয়্যাম,' ফিসফিস করে বলল ক্রিশ্চিয়ান, 'একটা কথা বলব তোমাকে।'

চোখ রগড়ে ঘুম তাড়াতে তাড়াতে চললাম ওদের পেছন পেছন।

নারকেলের ছোবড়া জ্বালিয়ে বড়সড় একটা আগুন তৈরি করা হয়েছে সৈকতে। সদ্য ধরে আনা মাছ ঝলসানো হচ্ছে তাতে। চারপাশে মাদুর বিছিয়ে গোল হয়ে বসেছে হিটিহিটির পরিবার। নিচু স্বরে আলাপ করছে তারা। অবাক হলাম আমি। না, এত রাতে খাওয়ার আয়োজন করতে দেখে নয়–খাওয়া বা ঘুমানোর কোন সময়সূচি নেই তাহিতীয়দের, সাগর থেকে মাছ ধরে আনার পরই সাধারণত খাওয়ার আয়োজন হয়; সে সকালে হোক, কি দুপুরে হোক, কি মাঝ রাতে হোক–আমি অবাক হলাম আমাকে ডাকা হয়নি দেখে।

একটা নারকেল গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসল ক্রিশ্চিয়ান। মাইমিতি বসল ওর এক পাশে, অন্য পাশে আমি।

নিঃশব্দে পেরিয়ে গেল কয়েকটা মিনিট। তারপর হঠাৎ ক্রিশ্চিয়ান বলল, 'ওল্ড ব্যাকাস মারা গেছে, বিয়্যাম।'

'ওহ্ ঈশ্বর! কি বলছ তুমি! কখন? কি…'

'কাল রাতে। সম্ভবত বিষাক্ত মাছ খেয়েছিল। টেতিয়ারোয়া থেকে ক্যানো ভর্তি মাছ নিয়ে এসেছিল কয়েক জন ইন্ডিয়ান। তাদের কাছ থেকে পঞ্চাশ পাউন্ড মত মাছ কিনেছিলাম আমরা। একমাত্র তোমাদের মেসকেই কাল ওই মাছ সরবরাহ করা হয়েছিল। রাতে খাওয়ার কিছুক্ষণ পর থেকেই বমি করতে শুরু করে তোমার মেসমেটরা। হেওয়ার্ড, নেলসন আর মরিসন ছ'ঘণ্টা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে বেঁচে গেছে কোন মতে, বুড়ো সার্জন পারেনি। ক্যাপ্টেনের নির্দেশে আমি এসেছি তোমাকে জানাতে।'

'ওহ্ ঈশ্বর!' আবার উচ্চারণ করলাম আমি।

'ভোরে ওকে কবর দেয়া হবে। তোমাকে থাকতে বলেছেন মিস্টার ব্লাই।'

পয়েন্ট ভেনাসে তাঁকে কবর দেয়া হলো। বিশ বছর আগে ক্যাপ্টেন কুক যেখানে মানমন্দির স্থাপন করেছিলেন তার কাছেই। ইন্ডিয়ানরাই কবর খুঁড়ে দিল আমাদের হয়ে। অবশেষে নামানো হয় ওল্ড ব্যাকাস-এর কফিন। ব্লাই পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ করলেন মৃত আত্মার শান্তির উদ্দেশে। তারপর

মুঠো মুঠো মাটি ছড়িয়ে দিলাম আমরা কফিনের ওপর।

ওল্ড ব্যাকাস-এর মৃত্যুর পর পরই আবার তিরিক্ষি হয়ে উঠল ব্লাই-এর মেজাজ। নিয়ম শৃঙ্খলা যেটুকু শিথিল করা হয়েছিল তা আবার কড়াকড়ি করা হলো। শুধু এ-ই নয় এমন সব ঘটনা বাউন্টিতে ঘটতে শুরু করল যে শেষ পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হলাম, আবার অসন্তোষের বিষ জমতে শুরু করেছে নাবিকদের মনে। কিছু ঘটনা সাপ্তাহিক অগ্রগতির খবর জানাতে গিয়ে আমি নিজের চোখে ঘটতে দেখেছি। কিছু শুনেছি হিটিহিটি আর ক্রিশ্চিয়ানের মুখে।

আগেই বলেছি, জাহাজের প্রতিটি লোকেরই ইন্ডিয়ান বন্ধু আছে। তারা প্রায়ই তাদের তাইওদের কাছে নানা ধরনের উপহার–বিশেষ করে খাবারদাবার পাঠায়। এই উপহার নিয়েই সূত্রপাত গোলযোগের। একদিন হঠাৎ ব্লাই ঘোষণা করে দিলেন ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে উপহার হিসেবে যা-ই আসবে–সে খাবার দাবারই হোক আর অন্য জিনিসই হোক–গণ্য হবে জাহাজের সম্পত্তি হিসেবে। ক্যাপ্টেনের কাছে জমা দিতে হবে সব।

ব্যাপারটা মেনে নেয়া সহজ নয় নাবিকদের পক্ষে। তাদের বন্ধুরা যে জিনিস পাঠাবে কেন তা তারা জাহাজকে মানে ব্লাইকে দিতে যাবে? কারও মনেই সংশয় রইল না, ওসব জিনিস স্রেফ মেরে দেবে ব্লাই।

একদিনের কথা আমার মনে আছে। অভিধানের অগ্রগতি দেখানোর জন্যে গিয়েছি জাহাজে। কিন্তু ব্লাই তখন জাহাজে নেই, রুটিফলের চারা সংগ্রহের তদারকি করতে গেছেন ডাঙায়। অপেক্ষা করতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি ছোট একটা ক্যানোয় চেপে জাহাজের দিকে আসছে টম এলিসন–আমাদের সবচেয়ে কম বয়েসী খালাসী। ক্যানোয় ও ছাড়াও রয়েছে এক ইন্ডিয়ান–ওর তাইও। ক্যানোটা বাউন্টির গায়ে ভিড়তেই টম উঠে এল ডেকে। ইন্ডিয়ানটা এবার এগিয়ে দিতে লাগল তার উপহার–ভি নামের এক ধরনের ইন্ডিয়ান আপেল, তিমির দাঁতের হাতলঅলা একটা হাতপাখা আর কাপড়ের ছোট একটা পোঁটলা। জিনিসগুলো একে একে নিয়ে ডেকের ওপর নামিয়ে রাখল এলিসন।

ইয়ং হ্যালেট নামের এক মিডশিপম্যান আছে আমাদের জাহাজে। ভীষণ কূট স্বাভাবের ছেলে। এই হ্যালেটের ওপর তখন দায়িত্ব ডেক পাহারা দেয়ার। এলিসন জাহাজে উঠতেই সে এগিয়ে গেল। অনুমতির তোয়াক্কা না করে একটা আপেল তুলে নিয়ে খেতে খেতে বলল, 'ক্যাপ্টেনের নির্দেশ মনে আছে তো, এলিসন? এগুলো আমার কাছে দিয়ে দাও, আমি পৌঁছে দেব।'

মুখটা কালো হয়ে গেল এলিসনের। কোন মতে বলল, 'জি, স্যার।'

'আর এই পাখাটা,' এলিসনের হাত থেকে ওটা নিতে নিতে হ্যালেট বলল, 'দেবে আমাকে?'

'না, স্যার। একটা মেয়ে এটা উপহার দিয়েছে আমাকে।'

'ও। তা ওটা কি, দেখি!'

'টাপা কাপড়ের পোঁটলা।'

ঝুঁকে পোঁটলাটা তুলে নিল হ্যালেট। টিপে টিপে দেখল কিছুক্ষণ। ক্রূর

একটা হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। বলল, 'মনে হচ্ছে বাচ্চা শুয়োর। মিস্টার স্যামুয়েলকে ডাকব?' রক্ত ঝলকে উঠল এলিসনের মুখে। ওকে জবাব দেয়ার সুযোগ দিল না হ্যালেট। বলে চলল, 'এসো, একটা চুক্তি করি আমরা—পাখাটা আমাকে দিয়ে দাও, শুয়োর সম্পর্কে কাউকে কিছু বলব না আমি!'

একটা কথাও না বলে পোঁটলাটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে ধুপধাপ পা ফেলে ফোকাসলের দিকে চলে গেল এলিসন, পাখাটা রয়ে গেল হ্যালেটের কাছে। ভয়ঙ্কর ক্রোধে গর্জে উঠতে যাব আমি, এই সময় দেখি কেরানী স্যামুয়েল আসছে। হ্যালেট ওকে থামিয়ে বলল, 'মিস্টার স্যামুয়েল, খানিকটা কচি শুয়োরের মাংস পেতে চান? ফোকাস্‌লে চলে যান। আমার সন্দেহ, এলিসনের কাছে ইন্ডিয়ান কাপড়ে মোড়া বাচ্চা শুয়োর আছে একটা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল স্যামুয়েল ফোকাস্‌লের দিকে।

আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম মাস্তুলের আড়ালে। লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলাম এবার।

'বদমাশের বাচ্চা!' চিৎকার করে উঠলাম।

একটু যেন চমকাল হ্যালেট। চিঁ চিঁ করে বলল, 'আমার ওপর তুমি গোয়েন্দাগিরি করছিলে!'

'করতাম না, যদি না জানতাম কেমন বদস্বভাবের লোক তুমি।' বলে আর দাঁড়ালাম না আমি, চলে গেলাম অন্যদিকে।

একটু পরে ক্যাপ্টেন এলেন। আমার পুঁথি পত্র নিয়ে আমি তৈরি হলাম তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্যে। আধঘণ্টা পর ব্লাইয়ের কামরা থেকে বেরিয়ে ডেকে এসে দেখি গ্যাঙওয়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ক্রিশ্চিয়ান। সদ্য আসা একটা ক্যানো থেকে মাইমিতির পাঠানো বিপুল পরিমাণ খাবার এবং অন্যান্য জিনিস জাহাজে তুলছে। এখানে পাঠকদের অবগতির জন্যে জানিয়ে রাখা ভাল, পেতুক সূত্রে মাইমিতি বিরাট ভূ-সম্পত্তির মালিক। ওর পক্ষে এত উপহার পাঠানো অস্বাভাবিক বা অসুবিধাজনক কিছু নয়। ও পাঠিয়েছে মোটাসোটা এক জোড়া শুয়োর, বড় এক কাঁদি কলা, প্রচুর পরিমাণে টারো এবং অন্যান্য শাক সবজি; এ ছাড়াও সুন্দর কয়েকটা পাটি, ইন্ডিয়ান আলখাল্লা আর এক জোড়া চমৎকার মুক্তা।

ব্লাই কেবিন থেকে বেরিয়ে গ্যাঙওয়ের কাছে আসতেই খেয়াল করলেন শুয়োর দুটো। তক্ষুণি স্যামুয়েলকে ডেকে ওগুলো জাহাজের ভাণ্ডারে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

'মিস্টার ব্লাই,' প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলল ক্রিশ্চিয়ান, 'শুয়োর দুটো আমি আমার নিজের মেসের জন্যে রাখতে চেয়েছিলাম।'

'না!' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন ব্লাই। তারপর পাটি, আলখাল্লা এবং অন্য জিনিসগুলো দেখে আবার কেরানীকে বললেন, 'এগুলোও নিয়ে যাও, স্যামুয়েল। অন্য কোন দ্বীপে এগুলো বদলে দরকারী জিনিস পাওয়া যেতে পারে।'

'না, স্যার,' আবার প্রতিবাদ করল ক্রিশ্চিয়ান, 'এগুলো ইংল্যান্ডে আমার

বাড়ির লোকদের জন্যে দেয়া হয়েছে।'

জবাব দেয়ার বদলে ঘুরে হাঁটতে শুরু করলেন ব্লাই। এই সময় মাইমিতির ভৃত্য টাপা কাপড়ে মোড়া ছোট্ট একটা পুঁটলি ক্রিশ্চিয়ানের হাতে দিতে দিতে ইন্ডিয়ান ভাষায় বলল, 'মুক্তা। আমার মনিব ইংল্যান্ডে আপনার মায়ের জন্যে দিয়েছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে থেমে ঘুরে দাঁড়ালো ক্যাপ্টেন। 'কি বলল ও?—মুক্তা? দেখি, আমাকে দেখাও!'

নিঃশব্দে টাপা কাপড়ের পুঁটলিটা খুলে দেখাল ক্রিশ্চিয়ান। নিখুঁত আকৃতির বড় বড় দুটো মুক্তা। বিস্ময়ের অস্ফুট একটা ধ্বনি বেরোল স্যামুয়েলের গলা দিয়ে। এমন মুক্তা জীবনে দেখেনি সে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে ব্লাই বললেন:

'স্যামুয়েলকে দাও ওদুটো। ফ্রেন্ডলি দ্বীপপুঞ্জে মুক্তার খুব কদর, অনেক জিনিস পাওয়া যাবে এগুলোর...'

'স্যার, আমার মায়ের জন্যে দেয়া হয়েছে এগুলো,' ব্লাইকে শেষ করতে না দিয়ে বলল ক্রিশ্চিয়ান। সাপের মত শীতল ওর গলা।

'স্যামুয়েলকে দাও ওদুটো,' আবার বললেন ব্লাই।

'না!' অতি কষ্টে নিজেকে শান্ত রেখে জবাব দিল ক্রিশ্চিয়ান। তারপর আচমকা মুক্তা ধরা হাতটা মুঠো করে চলে গেল সে। ক্যাপ্টেনের হাত দুটো একবার মুষ্টিবদ্ধ হচ্ছে, একবার খুলছে। কেরানীর দিকে তাকালেন তিনি, যেন কিছু বলবেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য না বলেই চলে গেলেন তিনিও কেবিনের দিকে।

প্রাচুর্যের ভেতরে থেকেও মেপে মেপে খাবার দেয়া হচ্ছে নাবিকদের, স্থানীয় বন্ধুরা উপহার হিসেবে যা দিচ্ছে তা কেড়ে নেয়া হচ্ছে, তীর থেকে যখন জাহাজ আসছে প্রত্যেকের সাথে এমন ব্যবহার করা হচ্ছে যেন ওরা সবাই চোরাচালানি—এই পরিবেশে নাবিকদের মনের অবস্থা কেমন হতে পারে সহজেই অনুমেয়।

জানুয়ারির মাঝামাঝি একদিন জাহাজে গিয়ে দেখি কোয়ার্টার ডেকে অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন ক্রুদ্ধ ক্যাপ্টেন। আমাকে দেখে থেমে দাঁড়ালেন তিনি।

'আজ তোমার পাণ্ডুলিপি ঘাঁটাঘাঁটি করতে পারব না, বিয়্যাম,' বিরক্তির সঙ্গে বললেন ব্লাই। 'মুসপ্র্যাট আর মিলওয়ার্ডকে নিয়ে চার্চিল ভেগেছে। অকৃতজ্ঞ বদমাশের দল! একবার ধরে নেই, তারপর দেখো কেমন করে শায়েস্তা করি শয়তানগুলোকে!'

খুব একটা বিস্মিত হলাম না, এমন কিছু যে ঘটবে তা যেন আমার জানাই ছিল।

'ছোট কাটারটা নিয়ে গেছে বদমাশগুলো,' বলে চললেন ব্লাই। 'আটটা বন্দুক আর কিছু গুলি বারুদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। একটু আগে খবর পেলাম, দ্বীপের ওপাশে এক নির্জন সৈকতে কাটার ফেলে রেখে একটা দেশী পাল তোলা ক্যানোয় চেপে টেতিয়ারোয়ার দিকে গেছে ওরা।' থেমে এক

মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন ব্লাই। তারপর আচমকা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার তাইওর একটা বড় ক্যানো আছে না?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'তাহলে তোমাকেই দেব বদমাশগুলোকে ধরে আনার ভার। হিটিহিটির কাছে ধার চাও ক্যানোটা; কয়েক জন লোকও চাও, আজই রওনা হয়ে যাও টেতিয়ারোয়ার দিকে। চেষ্টা করবে যেন শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই ধরে আনতে পারো। যদি দেখ টেতিয়ারোয়ায় ওরা নেই তাহলে বাতাস অনুকূল থাকলে কালই ফিরে আসবে।'

ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে নিচে নামলাম আমি। স্টুয়ার্ট আর টিঙ্কলারকে দেখলাম বার্থে।

'খবরটা শুনেছ নিশ্চয়ই?' জিজ্ঞেস করল স্টুয়ার্ট।

'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেনের মুখেই শুনলাম। মজার কথা কি জানো, ওদের ধরে আনার দায়িত্ব চেপেছে আমার ঘাড়ে।'

'বেচারা!' জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল স্টুয়ার্ট।

'কাটার নিয়ে পালাল কি করে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ডেক পাহারায় ছিল হেওয়ার্ড। বেটা গর্দভ ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভোরে উঠে দেখে কাটার নেই, আমাদের তিনজন নাবিকও নেই। ওহ্, ব্লাই যে কি খ্যাপা খেপেছিল, যদি দেখতে! এক মাস ওকে শিকলে আটকে রাখার নির্দেশ দিয়েছে।'

ঘণ্টাখানেকের ভেতর হিটিহিটির বাড়িতে পৌঁছে গেলাম আমি। বাড়িতেই পেলাম ওকে। ক্যাপ্টেনের হয়ে ওর বড় ক্যানোটা ধার চাইলাম। কয়েকজন লোকও চাইলাম ক্যানো চালানোর জন্যে। কি কারণে কোথায় যাব বললাম। তক্ষুণি বারো জন লোক সহ ক্যানোটা দিতে রাজি হয়ে গেল হিটিহিটি। এবং জানাল ও নিজেও যাবে আমার সাথে। আপত্তি করার কোন কারণ দেখলাম না। হিটিহিটির মত একজন গোত্রপতি সঙ্গে থাকলে সম্পূর্ণ অজানা, অচেনা টেতিয়ারোয়ায় বিশেষ খাতির যে পাব তাতে সন্দেহ নেই।

দুপুর দুটো নাগাদ আমরা রওনা হয়ে গেলাম।

তাহিতির মাইল ত্রিশেক উত্তরে পাঁচটা নিচু প্রবাল দ্বীপের সমষ্টি টেতিয়ারোয়া, এ অঞ্চলের গোত্রপতিদের অবকাশ যাপন কেন্দ্র। দ্বীপগুলোকে বেষ্টন করে আছে নিচু একটা প্রবাল প্রাচীর। অর্থাৎ চমৎকার একটা লেগুনের মাঝখানে দ্বীপ পাঁচটার অবস্থান। লেগুনের ভেতর স্বচ্ছ টলটলে সাগর শান্ত। এই ছোট্ট দ্বীপপুঞ্জের মালিক তাহিতির সবচেয়ে বড় গোত্রপতি টেইনা। টেইনা তো বটেই, তাহিতি এবং আশপাশের দ্বীপগুলোর অন্যান্য গোত্রপতিরাও বছরে এক বা দু'মাস কাটিয়ে যায় এখানে। অভিজাত পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যেও এখানে নিয়ে আসা হয়।

খুবই দ্রুতগামী হিটিহিটির ক্যানোটা। গতি কম পক্ষে ঘণ্টায় বারো নট, মানে বাউন্টির প্রায় দ্বিগুণ। আড়াই ঘণ্টাও লাগল না আমাদের টেতিয়ারোয়া লেগুনে পৌঁছুতে। দেখতে দেখতে ছোট ছোট ক্যানো আর নগ্নদেহী সাঁতারুর

দল ঘিরে ধরল আমাদের।

একটু চটপটে আর বয়স্ক একজনকে লক্ষ করে আমার হয়ে হিটিহিটি প্রশ্ন করল, পিরিতেন-এর তিনজন সাদা মানুষ ওদের দ্বীপে এসেছে কি না, যদি এসে থাকে তাহলে এখন তারা কোথায়।

লোকটা জবাব দিল, 'হ্যাঁ, তিন জন সাদা মানুষ এসেছিল, তবে বেশিক্ষণ থাকেনি এখানে। আরও সাদা মানুষ পিছু ধাওয়া করে আসতে পারে ভেবে চলে গেছে। সে দু'তিন ঘণ্টা আগের কথা।'

'কোথায় গেছে জানো নাকি?' হিটিহিটি জিজ্ঞেস করল।

'না, তবে দেখলাম পশ্চিম দিকে গেল।'

'আমার মনে হয় এইমিওতে গেছে ওরা,' পাশ থেকে এক সাঁতারু বলে উঠল।

'হতে পারে,' আগের লোকটা বলল। 'তাহিতির পশ্চিম তীরেও যেতে পারে।'

সন্ধ্যা হতে বিশেষ বাকি নেই, বাতাসও পড়ে আসছে ধীরে ধীরে (দক্ষিণ সাগরীয় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যই এই, শেষ বিকেল থেকে বাতাস পড়তে থাকে, সন্ধ্যা হতে হতে থেমে যায় একেবারে)। তাছাড়া চার্চিল ও তার দুই সঙ্গীর গন্তব্যও নিশ্চিত ভাবে জানা যাচ্ছে না; সব দিক বিবেচনা করে হিটিহিটি বলল, 'রাতটা টেতিয়ারোয়ায় কাটিয়ে দেই, কি বলো, বিয়্যাম? কাল ভোরে বাতাস উঠলে আবার রওনা হওয়া যাবে।'

এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব আর হতে পারে না। সুতরাং রয়ে গেলাম টেতিয়ারোয়ায়।

প্রবাল দ্বীপে সে রাতটার কথা আমি জীবনে ভুলব না। আগেই বলেছি টেতিয়ারোয়া এ অঞ্চলের গোত্রপতিদের অবকাশযাপনকেন্দ্র; সে কারণে বছরের প্রায় সব সময়েই কোন না কোন গোত্রপতি এখানে থাকে। কখনও কখনও এক সাথে তিন চারজনও থাকে। এখন আছে তিন জন। হিটিহিটি আসায় হয়েছে চারজন। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো পইনো নামের এক বিখ্যাত যোদ্ধার বাসায়। পইনো এসেছে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে। অত্যধিক 'আভা' (এক ধরনের স্থানীয় মদ) পান করে মরতে বসেছিল বেচারা। মাদুরের ওপর শুয়ে থাকতে দেখলাম ওকে, নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই বললেই চলে, গায়ের চামড়া তুঁতের মত নীল দেখে আমার দম বন্ধ হওয়ার অবস্থা। হিটিহিটি অবশ্য বলল, মাসখানেকের মধ্যে ও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে।

পইনোর সেবা শুশ্রূষার জন্যে এসেছে ওর বেশ কয়েকজন আত্মীয়। এক তরুণী আছে তাদের ভেতর। অপূর্ব সুন্দরী। তাইয়াপুর নাম করা ভেহিয়াটুয়া পরিবারের মেয়ে সে। দুই বৃদ্ধা মহিলা আছে তার দেখাশোনার জন্যে। খাওয়ার সময় দূর থেকে এক পলক দেখলাম মেয়েটাকে। এরপর দেখতে ইচ্ছে হওয়া সত্ত্বেও রাতে হেইভা-র (এক ধরনের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান) আগে আর ওর দেখা পেলাম না।

সন্ধ্যার পর বেড়াতে বেরোলাম আমি আর হিটিহিটি। নারকেল বীথির মাঝ

দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটার পর দূর থেকে ভেসে এল ঢাকের আওয়াজ। আরও কিছু দূর এগিয়ে দেখতে পেলাম মশালের আলো। আমার তাইওর হাঁটার গতি দ্রুত হয়ে গেল। সামনে বিরাট এক টুকরো সমতল ফাঁকা জায়গার এক প্রান্তে ঘষে ঘষে চারকোনা করা প্রবালের টুকরো সাজিয়ে একটা মঞ্চ মত তৈরি করা হয়েছে। তার সমনে বসে আছে কম পক্ষে দু'তিনশো দর্শক। নারকেল পাতার মশাল জ্বেলে উজ্জ্বল আলোকিত করে তোলা হয়েছে জায়গাটা। আমরা যখন সেখানে পৌঁছুলাম তখন দুই ভাঁড়–স্থানীয় ভাষায় ফাআতা–অভিনয় কুশলতার প্রমাণ দিয়ে বিদায় নিচ্ছে। হাসির ঝড় বয়ে যাচ্ছে দর্শকদের ভেতর।

হিটিহিটিকে দেখে পথ করে দিল কিছু দর্শক। মঞ্চের একেবারে সামনে গিয়ে বসলাম আমরা। ভাঁড় দু'জন নেমে যাওয়ার পর মঞ্চে উঠল ছ'জন তরুণী, সঙ্গে চার তুলী। ঢোলের তালে তালে নাচতে লাগল তারা। অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি। কোন কোনটা তো রীতিমত অশ্লীল মনে হলো। হিটিহিটি আমার কানে কানে জানাল জমির উর্বরা শক্তি বাড়ানোর জন্যে নাচা হয় এই নাচ।

অবশেষে শেষ হলো ছয় তরুণীর উন্মাদ উদ্দাম নৃত্য। মঞ্চ এখন শূন্য। আমার তাইও বলল, এবার নাকি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটা নাচ হবে।

দর্শকদের মাঝ দিয়ে এগিয়ে এল নাচের দ্বিতীয় দলটা। দু'জনের দল। প্রতিটি মেয়ের সঙ্গে দু'জন করে বৃদ্ধা আর একজন ঘোষক। ঘোষকরা একে একে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে লাগল নর্তকীদের নাম এবং পদবী, এক এক করে মঞ্চে উঠল দুই মেয়ে। বৃদ্ধারা রইল নিচে। একই রকম সাজসজ্জা করেছে দুটি মেয়ে। তুষার-ধবল টাপা কাপড়ের পোশাক, মাথায় 'টামাউ' নামের বিচিত্র এক ধরনের সাজ। হাতে ছোট হাত পাখা, অদ্ভুত ভাবে বাঁকানো সেগুলোর হাতল। শুধু এ-ই না, নানা ধরনের স্থানীয় প্রসাধনী মেখে উজ্জ্বল করা হয়েছে চোখ, গাল, ত্বক–মোটকথা সৌন্দর্য।

দ্বিতীয় মেয়েটা মঞ্চে উঠতেই একটু যেন থমকালাম আমি। সেই মেয়েটা–পইনোর আত্মীয়া; অভিজাত ইন্ডিয়ানরা সচরাচর যেমন হয়, সাধারণদের চেয়ে এক মাথা উঁচু। সন্ধ্যায় খাওয়ার সময় এক পলক দেখে বুঝতে পারিনি ওর সৌন্দর্য। এখন পারলাম। অপূর্ব মুখশ্রী আর দেহের গঠন। দক্ষ কোন শিল্পীর হাতে গড়া যেন। এমন রূপ ইউরোপীয় মেয়েদের মধ্যেও খুব কমই দেখা যায়। ঘোষক যতক্ষণ তার দীর্ঘ নাম, এবং আরও দীর্ঘ পদবীর তালিকা ঘোষণা করল ততক্ষণ সে নত মুখে গর্বিত অথচ বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল আমাদের মুখোমুখি। এত লম্বা নাম আর পদবীর কিছুই আমি বুঝতে পারব না অনুমান করে হিটিহিটি একটু ঝুঁকে নিচু কণ্ঠে ওর ডাক নামটা জানাল আমাকে।

'তেহানি,' বলল সে, অর্থাৎ 'সুপ্রিয়'। মনে মনে বললাম, যোগ্য নামই বটে।

দু'জনের নাচ 'বুরা'। দুই ঘোষক মঞ্চ থেকে নেমে যেতেই নাচ শুরু করল তেহানি আর অন্য মেয়েটা। ধীর লয়ে বাজছে ঢাক আর স্থানীয় এক ধরনের বাঁশি। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুলছে দুই তরুণী। কি অপূর্ব দেহ

ভঙ্গিমা, বাহুর সঞ্চালন, বঙ্কিম গ্রীবার নড়াচড়া! মুগ্ধ হয়ে দেখলাম আমি।

তেহানি আর তার সঙ্গিনী নেমে যাওয়ার পর মঞ্চে এল দুই ভাঁড়। আবার হাসির হররা উঠল দর্শকদের ভেতর। ইতোমধ্যে তৈরি হতে লাগল বুরা নাচের পরবর্তী জোড়া। কিন্তু আমার মন আর অনুষ্ঠানের দিকে নেই, বাসায় ফেরার জন্যে ব্যস্ত সে তখন; নিশ্চিত জানে, নাচ শেষে সেখানেই গেছে তেহানি।

অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার আগেই প্রায় জোর করে হিটিহিটিকে উঠিয়ে নিয়ে ফিরে এলাম পইনোর বাসায়। কিন্তু তেহানিকে দেখার সৌভাগ্য আর হলো না। দুই বৃদ্ধার পাহারায় আলাদা একটা ঘরে শুয়ে পড়েছে সে।

সূর্যোদয়ের ঘণ্টা দু'য়েক পরে আমরা রওনা হলাম টেতিয়ারোয়া থেকে। সেদিনই দুপুরে মিস্টার ব্লাইকে জানালাম আমার অভিযানের ফলাফল। পরবর্তী তিন সপ্তাহ পলাতকদের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। তারপর নিজেরাই এসে ধরা দিল তারা। আমি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পর সব ইন্ডিয়ান গোত্রপতিকে ডেকে ব্লাই অনুরোধ করে বলেছিলেন, তারা যদি পলাতক তিন বদমাশকে ধরে দেয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে, তিনি খুব খুশি হবেন, ইংল্যান্ডে রাজা জর্জও খুশি হবেন। রাজা জর্জ খুশি হবেন শুনে সাহায্য করতে রাজি হয়েছিল গোত্রপতিরা। এবং সবাই যার যার প্রজাদের নির্দেশ দিয়েছিল, তিন পলাতককে দেখা মাত্র যেন ধরে নিয়ে আসে। ফলে চার্চিল, মুসপ্র্যাট আর মিলওয়ার্ড কোথাও একদিনের বেশি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেনি। ইন্ডিয়ানরা ওদের খবর পাওয়া মাত্র দলে দলে গিয়ে ধাওয়া করে, আর ওরা পালায়। এভাবে সপ্তাহ তিনেক কাটানোর পর আত্মসমর্পণ না করে পারেনি ওরা।

তিন জনকেই চাবকানো হলো–চার্চিলকে দু'ডজন আর মুসপ্র্যাট ও মিলওয়ার্ডকে চার ডজন করে।

মার্চ-এর শেষ দিকে আমি–আমার সতীর্থ নাবিকরাও–মোটামুটি আন্দাজ করতে পারলাম, বাউন্টির যাত্রা করার সময় কাছিয়ে এসেছে। এক হাজারেরও বেশি রুটিফলের চারা যোগাড় হয়েছে, সেগুলো জাহাজে তোলাও হয়ে গেছে। এখন বাউন্টির পেছন দিককার বড় কেবিনটায় ঢুকলে মনে হয় কোন বোটানিক্যাল গার্ডেনে এসে পড়েছি।

যাত্রার অন্যান্য আয়োজন সম্পন্ন প্রায়। প্রচুর শুয়োরের মাংস নুন দিয়ে নেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও নেয়া হয়েছে বিপুল পরিমাণ ইয়াম (এক ধরনের আলু)। একমাত্র ব্লাই জানেন কখন আমরা পাল তুলে দেব। তবে এটুকু স্পষ্ট, রওনা হওয়ার দিন আর বেশি দূরে নয়।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, তাহিতি ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে মনের ভেতর খুব একটা তাড়া অনুভব করছি না আমি। হিটিহিটি আর ওর পরিবারের সাথে একাত্ম হয়ে গেছি এই ক'মাসে। ওরা আমার আত্মীয় হয়ে উঠেছে যেন। দেশে যদি মা না থাকত আর বলা হত বাকি জীবন আমাকে এই আধা সভ্য আধা

অসভ্যদের দেশে কাটাতে হবে, খুশি মনেই আমি মেনে নিতাম প্রস্তাবটা।

এখন আমি স্থানীয় ভাষায় মোটামুটি আলাপ চালাতে পারি। যদিও জানি এই 'মোটামুটি'টাকে 'পুরোপুরি'তে পরিণত করতে হলে বহু বছরের সাধনার প্রয়োজন, কিন্তু সেই সাধনার সময় আমি পাব না—অন্তত এখন নয়। ইংল্যান্ডে গিয়ে স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কসকে জানাতে হবে আমার কাজের ফলাফল, তারপর স্যার জোসেফ চাইলে আবার আমি আসব। যদি জানতাম আগামী ছ'মাস বা এক বছরের ভেতর ইংল্যান্ড থেকে আরেকটা জাহাজ তাহিতিতে আসবে তাহলে হয়তো কাজ শেষ করার জন্যে আমাকে রেখে যাওয়ার অনুরোধ করতাম মিস্টার ব্লাইকে। কিন্তু জাহাজ তাহিতিতে আসবেই এ মুহূর্তে এমন নিশ্চয়তা দেয়ার কেউ নেই হাতের কাছে। সুতরাং মনে মনে প্রস্তুত হলাম কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই তাহিতি ছেড়ে যাওয়ার জন্যে।

ক্রিশ্চিয়ানের অবস্থাও আমার মত। তাহিতি ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না ওর। মাইমিতির সঙ্গে ওর সম্পর্কটা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এখন বিচ্ছেদ দু'জনের জন্যেই খুব কষ্টদায়ক হবে। এক অবস্থা মিডশিপম্যান স্টুয়ার্ট, ইয়ং আর খালাসী আলেকজান্ডার স্মিথেরও। টাউরুয়া নামের এক মেয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ইয়ং-এর। স্টুয়ার্ট ভালবেসেছে এক গোত্রপতির মেয়েকে। মেয়েটাকে ও পেগি বলে ডাকে। স্মিথের ঘনিষ্ঠতা হয়েছে চঞ্চল এক মেয়ের সাথে। তাঁর নাম পারাহা ইটি। এই তিন জনের জন্যেও তাহিতি ছেড়ে যাওয়ার অর্থ কিছু হারানো। আমার ব্যাপারটা অবশ্য অন্য রকম। জাগতিক কিছু আমি হারাব না ঠিক, কিন্তু যা হারাব তার মূল্যও অনুভূতির বিচারে কম নয়। সহজ সরল মানুষদের এই সুন্দর দেশটাকে সত্যিই ভালবেসে ফেলেছি আমি—আরও বেশি ভালবেসেছি হিটিহিটির মত সহৃদয় বন্ধুকে।

বাউন্টি রওনা হওয়ার দিন দুই আগে ইয়ং, স্টুয়ার্ট আর স্মিথকে নিয়ে ক্রিশ্চিয়ান এল আমার কাছে। ওদের দেখেই বুঝলাম কিছু একটা খবর আছে। ক্রিশ্চিয়ান ইতোমধ্যে ইন্ডিয়ানদের রীতিনীতি সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞানার্জন করেছে, ও জানে গুরুত্বপূর্ণ কোন খবর হুট করে জানানো পছন্দ করে না ওরা, আগে কিছু হালকা কথাবার্তা বলে নিতে হয়। তাই সে তক্ষুণি খবরটা ভাঙল না আমার কাছে।

মাইমিতি গভীর আবেগে স্বাগত জানাল প্রেমিককে। বৃদ্ধ হিটিহিটি উঠানের ধারে চালার নিচে নিয়ে গিয়ে মাদুর পেতে বসতে দিল অতিথিদের। ভৃত্যরা ডাব কেটে এনে দিল। স্টুয়ার্ট, ইয়ং আর স্মিথের বান্ধবীরাও এসে গেছে বন্ধুদের খবর পেয়ে। খেতে খেতে আলাপ করতে লাগলাম আমরা। কিছুক্ষণ পর ক্রিশ্চিয়ান মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে।

'তোমার জন্যে খবর আছে, বিয়্যাম,' বলল সে। 'শনিবার মানে পরশু দিন আমরা রওনা হব। ব্লাই তোমাকে শুক্রবার রাতের ভেতর জাহাজে চলে যেতে বলেছে।'

কথাগুলো বুঝতে পারল মাইমিতি। ভার মুখে চাইল আমার দিকে, তারপর প্রেমিকের একটা হাত তুলে নিয়ে শক্ত করে ধরে রইল।

'আমার একদম যেতে ইচ্ছে করছে না,' আবার বলল ক্রিশ্চিয়ান, 'ভালই ছিলাম এখানে।'

'আমারও,' পেগির দিকে এক পলক তাকিয়ে যোগ করল স্টুয়ার্ট।

'আমি বাবা তোমাদের মত ছিচকাঁদুনে নই,' মন্তব্য করল ইয়ং। 'আমি চলে গেলে নিশ্চয়ই শোকে পাথর হয়ে যাবে না টাউরুয়া। কয়েক দিন খারাপ লাগবে, তারপর আস্তে আস্তে সব স্বাভাবিক হয়ে আসবে। হয়তো এখানকার কোন সুপুরুষ ছেলের সাথে শিগগিরই বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলবে আমাকে ভোলার জন্যে।'

পাশেই বসে ছিল মেয়েটা। ভয়ানক ভাবে মাথা নেড়ে সে বোঝাতে চাইল, না, কখনও সে অমন করবে না। ক্রিশ্চিয়ান হাসল।

'আমার মনে হয় ইয়ং ঠিকই বলেছে,' সে বলল। 'মানুষের কোন দুঃখই চিরস্থায়ী নয়। দুঃখ শোক থাকে তবু মানুষ এগিয়ে যায়, মানুষের ধর্মই এই।'

সন্ধ্যার সামান্য আগে ওরা ফিরে গেল জাহাজে। পরদিন সন্ধ্যায় আমিও বিদায় নিলাম হিটিহিটি ও তার পরিবারের কাছ থেকে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, চোখ দুটো আমার ভিজে উঠেছিল তখন, এই ভেবে যে, এই সুন্দর মানুষগুলোকে হয়তো আর কখনও দেখব না।

বাউন্টিতে ফিরে দেখি ইন্ডিয়ানে গিজ গিজ করছে জাহাজ। ডাব, নারকেল, কলা, শুঁয়োর, ছাগলে বোঝাই ডেক। তাহিতির মহা গোত্রপতি টেইনা আর তার স্ত্রী ইটিয়াকেও দেখলাম। ক্যাপ্টেনের অতিথি হয়ে সে রাতটা ওরা থাকল আমাদের জাহাজে। ভোরে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ওদের লঞ্চে করে পৌঁছে দিয়ে আসা হলো তীরে। তারপর আমরা নোঙর তুলে পাল উড়িয়ে দিলাম। বাউন্টি এগিয়ে চলল খোলা সাগরের দিকে।

সাত

আবার আমরা সাগরে ভাসলাম।

তাহিতিকে পেছনে ফেলে যত এগিয়ে চলেছি ততই সেখানকার স্মৃতি স্বপ্নের মত লাগছে। যতক্ষণ না ছোট হতে হতে দিগন্তে বিলীন হয়ে গেল ততক্ষণ আমরা তাকিয়ে রইলাম দ্বীপটার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে, পুরানো নিয়ম মত সবাই লেগে গেলাম যার যার কাজে।

তেইশে এপ্রিল সকালে দেখা পেলাম ফ্রেন্ডলি আর্কিপিলাগোর দ্বীপ নামুকার! ক্যাপ্টেন কুকের সঙ্গে এখানে আগে এসেছেন ব্লাই। এন্ডেভার প্রণালীর দিকে আরও এগোনোর আগে এখান থেকে আমাদের কাঠ আর পানির ভাণ্ডার কিছুটা সমৃদ্ধ করে নিতে চাইলেন তিনি।

দক্ষিণ দিকে বইছে বাতাস, সে কারণে জাহাজ তীরের দিকে চালাতে বেশ বেগ পেতে হলো। নামুকা উপকূলে যখন নোঙর ফেললাম তখন সন্ধ্যা হয়

হয়।

দ্বীপের যে দিকটায় বাউন্টি নোঙ্গর ফেলেছে সেদিকটা পাহাড়ী, গাছপালা শূন্য; পানির উৎস. সেই সাথে লোক বসতিও, কাছাকাছি আছে বলে মনে হলো না। সুতরাং পরদিন সকালে আবার নোঙ্গর তুলতে হলো। কয়েক মাইল পুবে গিয়ে নতুন করে নোঙ্গর ফেললাম আমরা। এবার চারদিক থেকে ইন্ডিয়ানরা ঘিরে ধরল আমাদের। শুধু নামুকা নয়, আশপাশের অন্যান্য দ্বীপ থেকেও এগিয়ে আসতে লাগল ক্যানোর ঝাঁক। কিছুক্ষণের ভেতর বাউন্টির ডেকে এত ইন্ডিয়ান উঠে এল যে আমাদের কাজকর্ম সব বন্ধ হওয়ার যোগাড় হলো। অবশেষে দু'জন গোত্রপতি যখন এল তখন একটু যেন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা গেল জাহাজে। ব্লাই ওদের বোঝাতে পারলেন, ডেকের ওপর এত লোক থাকলে আমাদের পক্ষে কাজ করা অসম্ভব ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপর পরিষ্কার হয়ে গেল ডেক। দুই গোত্রপতি কেবল রইল জাহাজে, বাকি সবাই নেমে গেল যার যার ক্যানোয়। ব্লাই এবার আমাকে ডাকলেন দোভাষীর কাজ করার জন্যে। কিন্তু দেখা গেল আমার তাহিতীয় ভাষার জ্ঞান সামান্যই কাজে আসছে। ফ্রেন্ডলি দ্বীপপুঞ্জের লোকদের ভাষার সঙ্গে বিস্তর পার্থক্য তাহিতীয় ভাষার। যাহোক ইশারা ইঙ্গিত আর কিছু কিছু শব্দ প্রয়োগে শেষ পর্যন্ত দুই গোত্রপতিকে বোঝানো গেল আমরা কি জন্যে এসেছি। চিৎকার করে দু'জন কিছু নির্দেশ দিল তাদের লোকদের উদ্দেশ্যে, অমনি বেশির ভাগ ক্যানো দ্রুত তীরের দিকে এগোতে শুরু করল।

ক্যাপ্টেন কুক অঞ্চলটার নাম দিয়েছিলেন বটে ফ্রেন্ডলি আর্কিপিলাগো, কিন্তু হিটিহিটির মুখে বা এ এলাকা সম্পর্কে ওয়াকেবহাল সতীর্থ দু'একজন নাবিকের কাছে যা শুনেছি তাতে মনে হয় না এখানকার লোকেরা স্বভাবগত ভাবে খুব একটা ফ্রেন্ডলি বা বন্ধুভাবাপন্ন। নামুকা থেকে পানি আর কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রমাণ হয়ে গেল ব্যাপারটা। চরম অসৎ রীতিমত ধড়িবাজ এখানকার মানুষ। সামান্য সুযোগ যদি দেয়া হয় যে কোন জিনিস চুরি করে এমন কি কেড়ে নিয়ে পালাতে পারে এরা। এসব কথা ভেবে ক্রিশ্চিয়ান তীরে যাওয়ার সময় ব্লাইকে বলল সঙ্গে সশস্ত্র রক্ষী দিতে। প্রস্তাব শুনে হাসলেন ক্যাপ্টেন।

'এই অসভ্যগুলোকে ভয় পাচ্ছ তুমি, ক্রিশ্চিয়ান?'

'না, স্যার, ভয় নয়,' জবাব দিল ক্রিশ্চিয়ান, 'আমি চাইছি সাবধান হতে। আমার মতে...'

'তোমার মতে? কে চেয়েছে তোমার মত? তোমার চেয়ে সহকারী হিসেবে একজন মেয়েমানুষকে আনলে ভাল করতাম দেখছি! এসো, নেলসন, ভীতুর ডিমগুলোকে দেখিয়ে দেই, কি করে তীরে যেতে হয়।' বলে আর দাঁড়ালেন না ব্লাই, মই বেয়ে নেমে গেলেন কাটার-এ। নেলসন গেল পেছন পেছন—গত কয়েক দিনে বেশ কিছু রুটিফলের চারা মরে গেছে, শূন্যস্থান পূরণ করার জন্যে নতুন কিছু চারা সংগ্রহ করতে চান উদ্ভিদবিজ্ঞানী।

দুই গোত্রপতি আগেই নেমে গিয়েছিল কাটার-এ। ব্লাই আর নেলসন

নামতেই এবার নাবিকরা দাঁড় টানতে লাগল ডাঙার দিকে।

ছোট ঘটনা, কিন্তু ঘটল জাহাজের বেশির ভাগ নাবিকের সামনে। আমি খেয়াল করলাম কি প্রচণ্ড চেষ্টা করতে হলো ক্রিশ্চিয়ানকে রাগ সামলানোর জন্যে। এই বদ অভ্যাসটা আছে ব্লাইয়ের, যখন তখন এধরনের হুল বেঁধোনো কথা বলে বসেন অফিসারদের, সামনে কে আছে না আছে তা দেখার প্রয়োজন বোধ করেন না।

যা হোক, সেদিন অস্বাভাবিক কিছু ঘটল না। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে ব্লাই যখন তীরে যান তাঁর সাথে ছিল দু'জন গোত্রপতি। তাদের সামনে তাঁকে হেনস্থা করার সাহস কেউ পায়নি। কিন্তু পরদিন যখন আমরা গেলাম তখন ক্রিশ্চিয়ানের ধারণাই সত্য প্রমাণিত হলো।

তীরে নেমে উপযুক্ত গাছ বেছে সবে কাটতে শুরু করেছি, এই সময় আমরা আক্রান্ত হলাম। কয়েকশো দ্বীপবাসী চারদিক থেকে ঘিরে ধরল আমাদের। আমাদের চেহারা পোশাক আশাক দেখে খুব মজা পাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে হাসতে লাগল ওরা। কেউ কেউ এগিয়ে এসে খোঁচা মারল বুকে, পেটে, কোমরে। দু'একজন আরও দুঃসাহসের পরিচয় দিল, আমাদের যারা কাঠ কাটছিল তাদের হাত থেকে কুড়াল কেড়ে নিল। সে এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা, কোনমতে সসম্মানে পালিয়ে আসতে পারলে বাঁচি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ব্লাই সশস্ত্র রক্ষী দিয়েছিলেন সঙ্গে, তবে তাদের ওপর কড়াকড়ি নির্দেশ জারি করে দিয়েছিলেন, যেন কোন অবস্থাতেই গুলি চালানো না হয়। সেজন্যে হাতে অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও আমরা লেজ গুটিয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হলাম।

জাহাজে পৌঁছে ক্রিশ্চিয়ান সব বলল ব্লাইকে। শুনে তাঁর চেহারা যা হলো সে দেখার মত। তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে লাগলেন।

'তুমি একটা–তুমি একটা অযোগ্য কাপুরুষ গাধা!' চিৎকার করে উঠলেন তিনি। 'কয়েকটা অসভ্য বদমাশের ভয়ে পালিয়ে এলে, সঙ্গে অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও?'

'ব্যবহার করতে নিষেধ করে অস্ত্র দিলে লাভ কি,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল ক্রিশ্চিয়ান।

কথাটা যেন কানেই ঢুকল না ব্লাইয়ের। এমন গালাগালির তুবড়ি ছোটালেন যে পালিয়ে বাঁচল বেচারা ক্রিশ্চিয়ান।

আগেও দেখেছি, আজ আবার দেখলাম, রেগে গেলে একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যান ব্লাই। কিছুই তখন তাঁর মনে থাকে না। নিজে যে কথা বলেছিলেন তাও ভুলে যান অবলীলায়। এধরনের মানুষকে যদি কোন প্রতিষ্ঠানের মাথায় বসিয়ে দেয়া হয়, সে প্রতিষ্ঠানের কপালে যে দুর্ভোগ নেমে আসবে তাতে সন্দেহ নেই। বাউন্টির ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়নি।

পরদিন অর্থাৎ ছাব্বিশ এপ্রিল বিকেলে আমরা রওনা হলাম নামুকা থেকে। বাতাস হালকা বলে জাহাজ খুব দ্রুত এগোচ্ছে না। সারা রাত আর পরের সারা দিন জাহাজ চালিয়েও উপকূল থেকে সাত আট লিগের বেশি দূরে আসতে

পারলাম না।

সাতাশ তারিখ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কেবিনেই কাটালেন ব্লাই। বিকেলের শুরুতে ডেকে বেরিয়ে এলেন স্যামুয়েলকে কিছু নির্দেশ দেয়ার জন্যে। তাহিতি থেকে আনা জিনিসপত্রের বেশিরভাগই এখনও ছড়িয়ে আছে ডেকের ওপর। কোয়ার্টার ডেকে কামানগুলোর মাঝখানে স্তূপ করা রয়েছে বিপুল সংখ্যক নারকেল। স্যামুয়েল তখন হিসেব করে দেখছে তা থেকে দু'একটা খোয়া গেছে, বা নষ্ট হয়েছে কিনা। ব্লাইকে দেখেই সে কলকল্ করে উঠল:

'নারকেল কয়েকটা কম মনে হচ্ছে, স্যার!'

'ভাল করে গুনে দেখেছ?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

তক্ষুণি সব অফিসারকে ডেকে আসার নির্দেশ দিলেন ব্লাই। তারপর একে একে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন তারা ব্যক্তিগত ভাবে কে কতগুলো নারকেল কিনেছে, এবং কোয়ার্টার ডেক থেকে কাউকে নারকেল চুরি করতে দেখেছে কিনা ইত্যাদি। সবাই বলল তারা দেখেনি। এদিকে খেপতে শুরু করেছেন ব্লাই। তাঁর ধারণা, চোরকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে অফিসাররা। অবশেষে ক্রিশ্চিয়ানের সামনে এলেন তিনি।

'এবার, মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান, বলো, ঠিক কতগুলো নারকেল কিনেছিলে তুমি?'

'গুনে দেখিনি, স্যার,' জবাব দিল ক্রিশ্চিয়ান। 'কিন্তু তাই বলে আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন না আমি আপনারগুলো থেকে চুরি করেছি?'

'হ্যাঁ, শয়তানের বাচ্চা! আমি তা-ই ভাবছি। নিশ্চয়ই আমার নারকেল তুমি চুরি করেছ, না হলে নিজেরগুলোর হিসেব ঠিক মত দিতে পারতে! তুমি–তুমি শুধু না, তোমরা সবাই চোর–জঘন্য চোর, বদমাশ। আজ নারকেল চুরি করেছ, কাল করবে ইয়াম–তোমরা না করলেও তোমাদের হয়ে তোমাদের স্যাঙাৎ খালাসীরা করবে! কিন্তু ভেবো না এত সহজে আমি ছেড়ে দেব! কি ভাবে তোমাদের মত কুকুরদের শায়েস্তা করতে হয়, আমি জানি।'

টকটকে লাল হয়ে উঠেছে প্রত্যেকটা অফিসারের মুখ। কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না। দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইল সব ক'জন। দু'হাত পেছনে নিয়ে পায়চারি করছেন ব্লাই। মুঠো একবার খুলছে একবার বন্ধ হচ্ছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁক ছাড়লেন তিনি:

'স্যামুয়েল!'

'জি, স্যার?'

'পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এই বদমাশগুলোর মদ বন্ধ রাখবে! আর ইয়াম দেবে মাথা পিছু এক পাউন্ডের জায়গায় আধ পাউন্ড করে! পরের আদেশটা জাহাজের সবার জন্যে প্রযোজ্য হবে। বোঝা গেছে?'

'জি, স্যার।'

অফিসারদের দিকে তাকালেন ব্লাই। 'খোদার কসম বলছি, আর যদি কিছু

খোয়া যায় সিকি পাউন্ডে নামিয়ে আনব বরাদ্দ, দেখে নিও!'

এখানেই ক্ষান্ত হলেন না ব্লাই। এরপর তিনি আদেশ দিলেন যার কাছে যত নারকেল আছে সব জমা দিতে হবে জাহাজের ভাণ্ডারে। অফিসার নাবিক সবাইকেই। একটা শব্দ উচ্চারণ করল না কেউ—না নাবিকরা, না অফিসাররা, যার যে ক'টা নারকেল ছিল এনে জমা দিল স্যামুয়েলের কাছে।

নীরব নিথর একটা সন্ধ্যা এল জাহাজে। ইংল্যান্ড থেকে রওনা হওয়ার পর এমন নীরব সন্ধ্যা বাউন্টিতে আর এসেছে বলে আমার মনে পড়ে না। সবার মনে এক চিন্তা, এখনও দীর্ঘ সময় সাগরে থাকতে হবে। হয়তো ছ'মাস, হয়তো এক বছর। কেমন কাটবে সে দিনগুলো?

মাঝরাতে যখন আমার কাজের সময় শেষ হলো তখন চারপাশে সাগর পুকুরের মত শান্ত। কাচের মত চকচকে জলের উপর প্রতিফলিত হচ্ছে আকাশের তারা।

নিচে নেমে টের পেলাম আমাদের ছোট্ট কুঠুরিটা জলন্ত চুল্লীর মত হয়ে আছে। কয়েক দিন ধরে বাতাস নেই বললেই চলে। উপরে খোলা ডেকেই গরমে তিষ্ঠানো দায়, তো নিচে বদ্ধ জায়গায় অবস্থা কেমন হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এমনিতে মনে নানা রকম দুশ্চিন্তা, তার ওপর এই গরম-ঘুম আসবে না ভেবে আবার ডেকে উঠে এসে রেলিংয়ের ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম।

তাকিয়ে আছি কালো সাগরের দিকে। হঠাৎ পাশে কারও নিশ্বাস ফেলার শব্দ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, টিঙ্কলার।

'নিচে বড্ড গরম,' সে বলল।

বেশ কিছুক্ষণ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইলাম দু'জন। হঠাৎ টিঙ্কলার ফিসফিস করে ডাকল আমাকে:

'বিয়্যাম!'

ঘাড় ফেরালাম আমি। সতর্ক চোখে চারদিকে তাকাচ্ছে টিঙ্কলার। আশেপাশে কেউ নেই, নিশ্চিত হয়ে ও আবার ডাকল:

'বিয়্যাম!'

'হ্যাঁ, বলো।'

'আমি একটা জঘন্য লোক, বিশ্বাস করো তুমি?'

'মানে!?'

'ক্যাপ্টেনের খোয়া যাওয়া নারকেলের একটা আমি চুরি করেছি।'

'তাহলে তুমিই সেই হতভাগা, আমাদের এই দুর্ভোগের জন্যে দায়ী?'

'হ্যাঁ, বিয়্যাম.' ভাঙা গলায় বলল টিঙ্কলার। 'তবে আমি একা নই, আরও দু'জন ছিল আমার সঙ্গে, নাম বলব না। ভীষণ পিপাসা পেয়েছিল বুঝলে, কিন্তু এমন আলসেমী লাগছিল মাস্তুলে উঠতে—এদিকে সামনে রয়েছে কচি ডাবগুলো, লোভ সামলাতে পারলাম না। জাহান্নামে যাক বুড়ো নেলসনের রুটিফলের বাগান!'.

রুটিফলের চারাগুলো সম্পর্কে আমাদের সবার মনের অবস্থা কম বেশি এরকম। কারণও আছে তার। পিপসার সময় নাবিকরা পানি পাক না পাক, চারাগুলোতে নিয়মিত পানি দিতেই হবে, না হলে মরে যাবে ওগুলো। সেজন্যে দিনে দু'বারের বেশি পানি খাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন ব্লাই। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এতেও ক্ষান্ত হননি তিনি, আমরা যাতে বাধ্য হয়েই পানি কম খাই সেজন্যে অদ্ভুত এক কৌশলও অবলম্বন করেছেন। বড় একটা মগ ঝুলিয়ে রেখেছেন প্রধান মাস্তুলের মাঝামাঝি জায়গায়, সেই সাথে আদেশ জারি করে দিয়েছেন, কাজের সময় পানি খেতে হলে-সে যে-ই হোক না কেন-ওই মগ পেড়ে এনে খেতে হবে, তারপর আবার মগটা রেখে আসতে হবে জায়গা মত। ব্লাই-এর বুদ্ধিটা যে কাজে লেগেছে তাতে সন্দেহ নেই। খুব বেশি তেষ্টা না পেলে পানি খাওয়ার কথা ভুলেও ভাবে না কেউ। বেচারা টিঙ্কলার-অন্য দু'জনও-এই কষ্টটুকুর হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে করে বসেছে অপকর্মটা।

'বাবা, বড় বাঁচা বেঁচে গেছি, আমাকে সন্দেহ করেনি,' বলে চলল টিঙ্কলার। 'অবশ্য যদি করতও আমি সোজা অস্বীকার করতাম। কিন্তু, ভাই, ক্রিশ্চিয়ানের জন্যে দুঃখ হচ্ছে আমার। আমি তো জানি ও দোষ করেনি।'

'ক্রিশ্চিয়ান জানে, তুমি যে ডাব নিয়েছ কয়েকটা?'

'কয়েকটা না-মাত্র একটা! আগেই তো বললাম, আমার সাথে আরও লোক ছিল। হ্যাঁ, ক্রিশ্চিয়ান জানে। ও দেখে ফেলেছিল আমাকে ডাব নিতে।'

'কিছু বলেনি?'

'না। না দেখার ভান করে অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল-যে কোন ভদ্র অফিসার এক্ষেত্রে তা-ই করত। এমন কোন অপরাধ আমি করিনি যার কথা ক্যাপ্টেনকে নালিশ করতে হবে। কয়েক হাজার নারকেলের ভেতর থেকে একটা মাত্র সরিয়েছি-তা-ও পিপাসায় অস্থির হয়ে। এর জন্যে যে শাস্তি ঈশ্বর আমাকে দেবেন আমি খুশি মনে ভোগ করব।'

কোয়ার্টার ডেকের একটা কামানের কাছে চলে গেল টিঙ্কলার। একটা হাতকে বালিশ বানিয়ে শুয়ে পড়ল। আর দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না, এবার আমারও উচিত কোথাও শুয়ে পড়া, ভেবে ঘুরে দাঁড়াতেই ডেকের উল্টোদিকে দেখতে পেলাম পেকওভারকে। কেমন একটু অস্বস্তি হলো আমার। টিঙ্কলারের কথা কি শুনে ফেলেছে ও? যদি শুনে থাকে তাহলে কি ক্যাপ্টেনকে জানাবে আসলে নারকেল চুরি করেছে টিঙ্কলার আর আরও দু'জন যাদের নাম ও বলেনি?

এই সব সাত পাঁচ ভাবছি এমন সময় নিচে নামার মইয়ের মুখে দেখতে পেলাম একটা ছায়া মূর্তি। মূর্তিটা ক্রিশ্চিয়ানের। বার ক'য়েক ডেকের এমাথা ওমাথা পায়চারি করার পর আমাকে দেখতে পেল ও।

'এখনও ঘুমাওনি, বিয়্যাম?' আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল ক্রিশ্চিয়ান।

'নাহ্, নিচে এত গরম...'

'হুঁ...।' চুপ করে গেল সে। অনেকক্ষণ পর হঠাৎ বলল, 'রাতে আমাকে

খেতে ডেকেছিল. জানো? বিকেলে গায়ে থুতু দিয়ে রাতে ডেকেছে খেতে! কেন বলতে পারো, বিয়্যাম?'

'আপনি যাননি?'

'মাথা খারাপ! আমার গায়ে তো কুত্তার চামড়া নয়!'

ওর গলায় এমন গভীর হতাশার সুর, আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ক্রিশ্চিয়ান আবার বলল, 'আমরা সবাই ওর হাতের মুঠোয়। অফিসার নাবিক সবাই। কুত্তার চেয়ে ভাল কিছু আমাদের ও মনে করে না। জানো, বিয়্যাম, এক মুহূর্তও আর এ জাহাজে থাকতে ইচ্ছে করে না আমার?'

আবার চুপ হয়ে গেল ক্রিশ্চিয়ান। অনেকক্ষণ পর বলল, 'আমার একটা কাজ করে দেবে তুমি, বিয়্যাম?'

'কি?'

'দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় কখন কি ঘটে কেউ বলতে পারে না। কোন কারণে, ধরো, আমি দেশে ফিরতে পারলাম না, তখন কি তুমি কাম্বারল্যান্ডে আমার বাড়ির লোকদের সাথে একটু দেখা করতে পারবে?'

'পারব না কেন?' আমি জবাব দিলাম।

'যেদিন বাউন্টিতে যোগ দিতে আসি সেদিন আসার আগে বাবা বলেছিলেন, জাহাজের কারও সাথে যেন এই ব্যবস্থা করে রাখি। যদি আমার কিছু ঘটে যায়, বাবা বলেছিলেন, আমার কোন বন্ধুর সাথে আলাপ করতে পারলে আর কিছু না হোক মনে অন্তত একটু স্বস্তি পাবেন তিনি। আমি কথা দিয়েছিলাম বাবাকে। এতদিন এ নিয়ে কাউকে কিছু বলিনি, এখন মনে হচ্ছে বলা দরকার।'

'আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন, স্যার,' ওর হাত ধরে একটু নেড়ে আমি বললাম।

'বেশ, তাহলে, এই কথা রইল।'

পেছন থেকে ভেসে এল একটা গলা, 'এখনও জেগে আছ, মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান!'

সাঁ করে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি আর ক্রিশ্চিয়ান। খুব বেশি হলে এক গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছেন ব্লাই। খালি পা, সেজন্যে তাঁর পায়ের আওয়াজ আমরা শুনতে পাইনি।

'হ্যাঁ, স্যার,' শীতল কণ্ঠে জবাব দিল ক্রিশ্চিয়ান।

'আর তুমি, বিয়্যাম, ঘুম আসছে না?'

'নিচে ভীষণ গরম, স্যার।'

'তাতে কী? একটা কথা তোমার জেনে রাখা দরকার, মিস্টার বিয়্যাম, সত্যিকারের নাবিক হতে হলে, প্রয়োজন বোধে চুল্লীর ভেতর বা বরফের ওপর ঘুমানোর জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।'

একথার কোন জবাব হয় না। হলেও ক্যাপ্টেনের মুখের ওপর তা দেয়া যায় না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। মিস্টার ব্লাইও দাঁড়িয়ে রইলেন, যেন

জবাব আশা করছেন। তারপর হঠাৎই ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেলেন মইয়ের দিকে।

শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিল ক্রিশ্চিয়ান।

কামানের পাশে গাঢ় ছায়ায় শুয়ে ছিল টিঙ্কলার। এবার উঠে বসল। দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে হাই তুলল লম্বা করে।

'নিচে যাও, বিয়্যাম, প্রমাণ করো, তুমি সত্যিই সত্যিকারের নাবিক! যত্তসব, ঘুমটা যেই লেগে এসেছে অমনি হাজির ব্যাটা।'

'তুমি শুনেছ ওঁর কথা?'

'হ্যাঁ, ক্রিশ্চিয়ানের কথাও। আমার বাবা ওর বাবার মত কোন অনুরোধ করেনি। তাতে কি প্রমাণ হয়?– আমার বাবা বেচারা ধরেই নিয়েছিল আমি ফিরব না···একটু পানি খাওয়া দরকার। এক ঘণ্টা ধরে শুয়ে শুয়ে এই একটা কথাই ভাবছিলাম। কি করি বলো তো? দু'বার পানি খাওয়া হয়ে গেছে, সকালের আগে আর খেতে পাব না। আমার জায়গায় তুমি হলে কি করতে?'

'পেকওভার নিচে গেছে,' আমি বললাম, 'সুযোগটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

'তাই নাকি?' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল টিঙ্কলার। বিড়ালের মত নিঃশব্দে, বানরের মত দ্রুত উঠে গেল মাস্তুল বেয়ে। মগ পেড়ে এনে পানি খেল। ওটা আবার মাস্তুলে রেখে মাত্র ও নিচে নেমেছে এই সময় পেকওভারকে আবার দেখা গেল ডেকের ওপর। ওর দিকে একবারও না তাকিয়ে মইয়ের দিকে এগোলাম,আমি আর টিঙ্কলার। নিচে নামতে নামতে শুনলাম ঘণ্টার শব্দ। তিন বার। মানে রাত তিনটা। মাস্তুলের ওপর থেকে ভেসে এল পাঞ্জেরীর (পাহারাদার) চিৎকার: 'সব ঠিক আছে!'

হ্যামকে উঠে শুয়ে পড়লাম আমি।

আট

দিনের আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে কি করেনি।

কাঁধে কারও জোর ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল আমার। উঠে বসতে না বসতেই ওপর থেকে ভেসে এল ভারী পায়ের ধুপধাপ আওয়াজ আর অনেক মানুষের সম্মিলিত চিৎকার। মিস্টার ব্লাইয়ের গলাও আছে তার ভেতর। হতবুদ্ধি হয়ে ভাবছি, কি হতে পারে, এই সময় লক্ষ করলাম বাউন্টির মাস্টার অ্যাট আর্মস চার্চিল দাঁড়িয়ে আমার হ্যামকের পাশে, হাতে পিস্তল। থম্পসন বেওনেট লাগানো একটা মাস্কেট হাতে দাঁড়িয়ে আছে মেইন হ্যাচের কাছে, তার পাশেই মুখ খোলা অবস্থায় পড়ে আছে অস্ত্র এবং গোলা-বারুদ রাখার একটা সিন্দুক। ব্যাপার কি কিছু বুঝতে পারছি না। ভাবলাম চার্চিলকে জিজ্ঞেস করি। কিন্তু

আমি মুখ খোলার আগেই দু'জন খালাসী ছুটতে ছুটতে ঢুকল আমাদের বার্থে। তাদের একজন চিৎকার করে উঠল:

'আমরা আছি তোমাদের সাথে, চার্চিল! অস্ত্র দাও আমাদের!'

দ্রুত দুটো মাস্কেট তুলে দিল থম্পসন দু'জনের হাতে। আবার ডেকের ওপর উঠে গেল ওরা।

আমার পাশের হ্যামকটা স্টুয়ার্টের। উঠে পড়েছে সে-ও। কিন্তু ইয়ং এত হৈ-চৈ, সত্ত্বেও ঘুমাচ্ছে নিশ্চিন্তে।

'কি হয়েছে, চার্চিল? কেউ আক্রমণ করেছে আমাদের?' অবশেষে আমি জিজ্ঞেস করতে পারলাম।

'তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নাও, মিস্টার বিয়্যাম,' ও জবাব দিল। 'আমরা জাহাজ দখল করে নিয়েছি, ক্যাপ্টেন ব্লাই এখন আমাদের হাতে বন্দী।'

ঘুম ঘুম ভাব ভাল করে কাটেনি আমার। বোধহয় সে কারণেই কথাগুলোর মর্ম সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পারলাম না। বোকার মত মুখ করে তাকিয়ে রইলাম চার্চিলের দিকে।

'ওরা বিদ্রোহ করেছে বিয়্যাম!' চিৎকার করে বলল স্টুয়ার্ট। 'হায় ঈশ্বর! চার্চিল, তোমরা পাগল হয়ে গেছ? যা করছ, তার ফলাফল সম্পর্কে কোন ধারণা আছে তোমাদের?'

'কি করছি, ভাল করেই জানি আমরা,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল চার্চিল। 'ব্লাই নিজে তার এ পরিণতি ডেকে এনেছে। ওর বারোটা এবার আমরা বাজিয়ে ছাড়ব, খোদার কসম বলছি!'

'কুত্তাটাকে গুলি করে মারব আমরা,' ভয় দেখানো ভঙ্গিতে মাস্কেটটায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল থম্পসন। 'তোমরা যদি কোন রকম চালাকির চেষ্টা করো, কয়েকটা খুন বেশি করতে হবে আমাদের! চার্চিল, বেঁধে ফেল দুটোকে! ওদের বিশ্বাস করা ঠিক হবে না।'

'বেশি বকবক না করে যা বলেছি তাই করো,' জবাব দিল চার্চিল। 'সিন্দুকটার দিকে খেয়াল রাখো। মিস্টার বিয়্যাম, জলদি কাপড় পরে নাও। কুইনটাল, তুমি ওই দরজার কাছে দাঁড়াও! আমার হুকুম ছাড়া কেউ যেন সামনে আসতে না পারে—বুঝেছ?'

'জি, জি, স্যার!'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, বার্থের পেছন দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ম্যাথ্যু কুইনটাল। যে মুহূর্তে আমি তাকিয়েছি ঠিক সেই সময় স্যামুয়েল এসে দাঁড়িয়েছে ওর পেছনে; পরনে কেবল ট্রাউজার, মাথার চুলগুলো উস্কখুস্ক হয়ে আছে, মুখটা ফ্যাকাসে।

'মিস্টার চার্চিল!' স্যামুয়েল ডাকল।

'যা ভাগ, ভটকু শুয়োর, নইলে তোর ভুঁড়ি আমি ফাঁসিয়ে দেব!' চেঁচাল কুইনটাল।

'মিস্টার চার্চিল, স্যার!' আবার ডাকল স্যামুয়েল, 'আমার দুটো কথা শুনুন দয়া করে।'

'ভাগাও বদমাশটাকে,' চার্চিল বলল, এবং তক্ষুণি কুর্নইটাল এমন এক হিংস্র ভঙ্গি করল মাস্কেট নেড়ে যে বেচারা কেরানী অদৃশ্য হয়ে গেল আর একটা কথাও না বলে।

'কষে একটা লাথি লাগাও, কুইনটাল, হারামীটার পাছায়,' কেউ একজন চিৎকার করল ওপর থেকে। মুখ তুলতেই দেখলাম আরও দু'জন সশস্ত্র মানুষ উঁকি দিচ্ছে হ্যাচের ভেতর দিয়ে।

চার্চিলের আদেশ পালন করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখলাম না আমি আর স্টুয়ার্ট। চার্চিল, থম্পসন দু'জনেই শক্ত সমর্থ শক্তিশালী পুরুষ। যদি নিরস্ত্র থাকত তবু ওদের সাথে লড়ার কথা ভাবতাম না আমরা। সুতরাং আর দেরি না করে কাপড় পরে নিলাম দু'জনেই। চার্চিল এবার আমাদের সামনের মইয়ের দিকে এগোনোর নির্দেশ দিল, ও আসতে লাগল পেছন পেছন। থম্পসন রইল বার্থে অন্য যারা ছিল তাদের পাহারায়।

মই বেয়ে উপরে উঠে দেখলাম সামনের হ্যাচের কাছে দাঁড়িয়ে আছে বেশ ক'জন সশস্ত্র লোক। সবার অস্ত্র মিস্টার ব্লাইয়ের দিকে তাক করা।

ক্যাপ্টেন ব্লাই, গায়ে কাপড় বলতে একমাত্র জামা—ভাগ্য ভাল তাঁর জামার ঝুলটা হাঁটু পর্যন্ত—দু'হাত পেছনে বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন সামনের মাস্তুলের কাছে। ক্রিশ্চিয়ান দাঁড়িয়ে তাঁর সামনে, এক হাতে ধরে আছে ব্লাইয়ের হাত বাঁধা হয়েছে যে রশি দিয়ে তার এক প্রান্ত, অন্য হাতে একটা বেওনেট। বেশ কয়েকজন খালাসী তার চারপাশে, সবাই সম্পূর্ণ সশস্ত্র। লোকগুলোকে চিনতে পারলাম আমি—জন মিলস, আইজাক মার্টিন, রিচার্ড স্কিনার এবং টমাস বারকিট।

'এখানে দাঁড়াও,' আমাদের উদ্দেশ্যে বলল চার্চিল। 'আমাদের বিরুদ্ধে যদি না যাও তোমাদের কিছু করব না আমরা।' বলে চলে গেল সে।

বুঝতে পারলাম, তাহিতিতে থাকতে জাহাজ ছেড়ে পালানোর অপরাধে যে কঠিন শাস্তি ওকে ব্লাই দিয়েছিলেন তার শোধ নিচ্ছে এখন চার্চিল। কিন্তু ক্রিশ্চিয়ান!—ও কি করে যোগ দিল বিদ্রোহীদের সাথে! যত দুর্ব্যবহারই পেয়ে থাক, ওর মত অফিসার এ কাজ করতে পারে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

মিস্টার ব্লাই তারস্বরে চিৎকার করছেন। জীবনে যত কুৎসিত শব্দ শিখেছেন সব ব্যবহার করে গালাগাল দিচ্ছেন বিদ্রোহীদের। আমি আর স্টুয়ার্ট কয়েক পা এগিয়ে যেতেই শুনতে পেলাম ক্রিশ্চিয়ানের শান্ত গলা, 'দয়া করে, স্যার, চুপ করবেন আপনি, না কি জোর খাটাতে হবে চুপ করানোর জন্যে?'

'বিদ্রোহী কুত্তা!' আগের চেয়ে জোরে চেঁচালেন ব্লাই। 'আমি তোকে দেখে নেব! তোকে ফাঁসি দেব! চাবকে তোর চামড়া মাংস···'

হাতের বেওনেটটা ঝট করে ব্লাইয়ের গলায় ঠেকিয়ে ক্রিশ্চিয়ান গর্জে উঠল, 'চুপ করো এক্ষুণি। নইলে মৃত্যু তোমার কেউ ঠেকাতে পারবে না!'

'কুত্তাটার ভুঁড়ি ফাসিয়ে দাও!' কেউ একজন চিৎকার করল।

'ঠিক, ঠিক, মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান!' সমর্থন করল একজন।

'সাগরে ফেলে দাও বদমাশটাকে!' আরেক জন বলল।

'হাঙর দিয়ে খাওয়াও!' যোগ করল অন্য একজন।

এবার যেন পরিস্থিতিটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন ব্লাই। চুপ করে একবার চারপাশে তাকালেন। তারপর বললেন, 'মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান, আমার কথা শোনো,' এখন অনেক শান্ত তাঁর গলা। 'আমাকে ছেড়ে দাও—অস্ত্র সমর্পণ করো! আমরা আবার বন্ধু হতে পারি! কথা দিচ্ছি, দেশে ফিরে এ সম্পর্কে একটা কথাও উচ্চারণ করব না আমি।'

'কে চায় তোমার বন্ধু হতে?' জবাব দিল ক্রিশ্চিয়ান। 'আর তোমার কথা—ও জিনিসের যদি কোন দাম থাকত অবস্থা এতদূর গড়াত না কখনও।'

নীরব ব্লাই। একটু পরে আবার বললেন, 'আমাকে নিয়ে কি করতে চাও তোমরা?'

'গুলি করব তোমাকে, শয়তানের বাচ্চা!' হাতের মাস্কেটে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চিৎকার করল বারকিট।

'না, না, তাহলে তো ও বেঁচে যাবে। মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান, আমাদের একটা সুযোগ দাও, চাবুকের ঘা খেতে কেমন ওকে দেখিয়ে দেই!'

'ঠিক, ঠিক! বাঁধো শালাকে! ওর নিজের বিষ নিজে একটু চেখে দেখুক!'

'চামড়া ছিলে নাও ওর!'

'হয়েছে, এবার তোমরা চুপ করো!' কড়া গলায় আদেশ করল ক্রিশ্চিয়ান; তারপর ব্লাইয়ের দিকে তাকিয়ে: 'তোমার ওপর সুবিচার করা হবে, আমাদের ওপর কক্ষনো যেটা তুমি করোনি। আমরা তোমাকে শিকল বেঁধে ইংল্যান্ডে নিয়ে যা···'

একসঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠস্বর প্রতিবাদ করে থামিয়ে দিল ওকে।

'ইংল্যান্ডে! কক্ষনো না! না, মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান, এটা আমরা হতে দেব না!'

শুরু হলো হৈ-চৈ। দেখা গেল বিদ্রোহীদের সবাই ক্রিশ্চিয়ানের প্রস্তাবের বিপক্ষে। ব্লাইকে নিয়ে এমন গুরুতর পরিস্থিতির মুখোমুখি কেউ হয়নি কখনও, ব্লাই নিজেও না। বিদ্রোহীরা সব বুনো হয়ে উঠেছে প্রতিহিংসায়। সামান্য ছুতো পেলে সত্যি সত্যিই ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবে ব্লাইয়ের।

ভাগ্য ভাল কয়েক মিনিট পরেই সবার মন অন্য দিকে ঘুরে যাওয়ার মত একটা ঘটনা ঘটল। হাতে বেওনেট নাচাতে নাচাতে ছুটে এল এলিসন। বয়স খুব কম ছেলেটার। এখনও কৈশোর পেরোয়নি। ভীষণ চঞ্চল স্বভাবের। যখন যা মনে আসে করে বসে, পরিণাম নিয়ে ভাবাভাবির ধার খুব একটা ধারে না। ও এসেই এমন সব হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি শুরু করল যে মুহূর্তে হালকা হয়ে গেল থমথমে ভাব। বিদ্রোহীরা সবাই এক সঙ্গে চিৎকার করে উঠল:

'হুররে, টমি! তুই কি আমাদের দলে?'

অর্বাচীন না হলে কেউ এমন প্রশ্নের জবাব দেয়?—মুখে এরকম একটা ভাব ফুটিয়ে তুলে ক্রিশ্চিয়ানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল এলিসন।

'আমার হাতে ছেড়ে দিন, মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান,' সে বলল। 'আমি পাহারা দেই ওকে! এমন পাহারা দেব!' বলে হাতের বেওনেটটা নাড়তে নাড়তে তিড়িংবিড়িং করে লাফাতে লাগল সে। সেই সাথে চিৎকার: 'ব্যাটা বদমাশ!'

বুড়ো শয়তান! আর চাবুক মারবে আমাদের? মদ বন্ধ করে দেবে? ঘাস খাইয়ে তবে ছাড়বে না?'

শুনে হৈ-হৈ করে উঠল বিদ্রোহীরা। 'চালিয়ে যা, টমি! আমরা আছি তোর পেছনে! লাগা শালার পেটে একটা খোঁচা!'

'তুমি আর তোমার স্যামুয়েল–চোরে চোরে মাসতুতো ভাই দু'জন। আমাদের খারাপ জিনিস খাইয়ে ভালগুলো খেতে তোমরা! আর খাবে? কী, পাকা চোর?–কথা নেই কেন মুখে? ছোট্ট একটা নৌকায় করে সাগরে ছেড়ে দেয়া উচিত তোমাদের।'

এলিসনের শেষ কথাটায় চট করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল ক্রিশ্চিয়ানের মাথায়। ছেলেটাকে থামিয়ে দিয়ে সে বলল:

'কাটারটা পরিষ্কার করে দাও! মিস্টার চার্চিল!'

'এই যে, এখানে, স্যার!'

'মিস্টার ফ্রায়ার আর মিস্টার পার্সেলকে নিয়ে এসো। বারকিট!'

'জি, স্যার!'

'তুমি আর সামনার আর মিলস আর মার্টিন–এখানে থাকো, মিস্টার ব্লাইকে পাহারা দাও।'

বিশাল লোমশ একটা হাত বাড়িয়ে ক্রিশ্চিয়ানের কাছ থেকে রশির প্রান্তটা নিল বারকিট।

'নিশ্চিন্ত থাকুন, স্যার, এক চুল নড়তে দেব না শালাকে।'

'আপনি ঠিক কি করতে চাইছেন, মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান? নিশ্চয়ই আমাদের জানার অধিকার আছে,' বলল সামনার।

দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল ক্রিশ্চিয়ান। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'তোমাকে যা বলেছি তাই করো, সামনার! এখন আমি এ জাহাজের ক্যাপ্টেন! কই, কাটারটা পরিষ্কার হলো?'

বেশ কয়েকজন লোক একসঙ্গে হাত লাগাল ছোট নৌকাটার ভেতর থেকে ইয়াম, মিষ্টি আলু ইত্যাদি নামিয়ে রাখার কাজে। অন্য কয়েকজন দড়ি-দড়া ঠিক করতে লাগল কাটারটাকে সাগরে ভাসানোর জন্যে।

বারকিট দাঁড়িয়ে গেছে ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের সামনে। হাতের বেওনেটটার আগা তাঁর বুক থেকে খুব বেশি হলে এক ইঞ্চি দূরে। ওর পেছনে সামনার মাস্কেট হাতে তৈরি। অন্য দু'জন তার দু'পাশে। তাদের হাতেও একটা করে মাস্কেট। ব্লাই চুপ। হম্বিতম্বি দূরে থাক, একটা শব্দও করছেন না। অন্য বিদ্রোহীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ডেকের বিভিন্ন জায়গায়। দুই মইয়ের মুখে আছে তিনজন করে। সবকিছু এমন সুশৃঙ্খলভাবে চলছে যে আমি না ভেবে পারলাম না, ব্যাপারটা পূর্ব পরিকল্পিত। কিন্তু পূর্ব পরিকল্পিতই যদি হবে আমরা কিছু টের পেলাম না কেন? এতগুলো লোক একজোট হয়েছে অথচ কোন ঘটনায়ই তা প্রকাশ পায়নি,তা কি করে সম্ভব?

ব্লাইকে কেন্দ্র করে যে ঘটনাগুলো এতক্ষণ ঘটছিল সব আমি এমন মগ্ন হয়ে দেখছিলাম যে স্টুয়ার্টের কথা মনেই ছিল না। খেয়াল হতে দেখলাম ও

নেই আমার পাশে। ওর খোঁজে তাকাতে লাগলাম চারদিকে। এই সময় প্রথম বারের মত আমাকে দেখল ক্রিশ্চিয়ান। তক্ষুণি আমার কাছে এল সে। গলার স্বর শান্ত শোনালেও আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, ভেতরে ভেতরে উত্তেজনায় ফুটছে সে।

'বিয়্যাম,' ক্রিশ্চিয়ান বলল, 'জাহাজে কি ঘটছে এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছ। নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, কাউকে কিছু বলা বা করা হবে না,– তবে কেউ যদি আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করার চেষ্টা করে তাহলে কি হবে আমি বলতে পারি না। সুতরাং কিছু করলে বুঝে শুনে নিজের দায়িত্বে করবে।'

'কি করতে চান আপনি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি চেয়েছিলাম ব্লাইকে বন্দী করে ইংল্যান্ডে নিয়ে যাব। কিন্তু মনে হচ্ছে না তা সম্ভব, আমার সাথীরা তা হতে দেবে না। এখন ঠিক করেছি, কাটারটা ওকে দিয়ে দেব, যেখানে খুশি চলে যাক। মিস্টার ফ্রায়ার, হেওয়ার্ড, হ্যালেট আর স্যামুয়েলকেও যেতে হবে ওর সঙ্গে।'

আর কথা বলার সময় পেলাম না। মিস্টার ফ্রায়ার আর পার্সেলকে নিয়ে এসেছে চার্চিল। মাস্টার, ছুতোর মিস্ত্রী–দু'জনেরই মুখে আতঙ্কের ছাপ, তবে দিশেহারা হয়ে পড়েনি কেউ। দু'জনই আইনের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান। সুযোগ পেলে ওরা যে জাহাজ পুনর্দখলের চেষ্টা করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ক্রিশ্চিয়ানের তাই ওদের কড়া পাহারায় রাখতে সে ভোলেনি।

'মিস্টার বিয়্যাম, তুমি নিশ্চয়ই নেই এসবের ভেতর?' ফ্রায়ার জিজ্ঞেস করল।

'আপনার চেয়ে বেশি না, স্যার,' আমি জবাব দিলাম।

'হ্যাঁ, বিয়্যাম এসবের কিছু জানে না,' বলল ক্রিশ্চিয়ান। 'মিস্টার পার্সেল...'

ফ্রায়ার বাধা দিল ওকে।

'তুমি! তুমি, ক্রিশ্চিয়ান! ওহ্, ঈশ্বর! কি করেছ, যদি জানতে! এখনও সময় আছে, এ পাগলামি সরাও মাথা থেকে, আমি কথা দিচ্ছি, আমরা সবাই তোমার স্বার্থ আমাদের নিজের স্বার্থ বলে মনে করব। আমাদের খালি ইংল্যান্ডে পৌঁছাতে...'

'না, মিস্টার ফ্রায়ার,' শান্ত কণ্ঠে বলল ক্রিশ্চিয়ান, 'তা আর সম্ভব নয়। গত কয়েকটা সপ্তাহ নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছি আমি। সত্যি বলছি, আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।'

'ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তোমার ব্যক্তিগত ঝগড়ার কারণে আমাদের সবাইকে দুর্ভোগের ভেতর টেনে আনবে তুমি?'

'বেশি কথা না বলে চুপ করে থাকুন, মিস্টার ফ্রায়ার। পার্সেল, তুমি যাও, নিচে থেকে তোমার যন্ত্রপাতি আর সহকারীদের নিয়ে এসে কাটারটা ঠিক ঠাক করে দাও। চার্চিল, ওকে নিচে যেতে দাও, সঙ্গে পাহারাদার দিতে ভুলো না।'

পার্সেলকে নিয়ে সামনের মইয়ের দিকে এগিয়ে গেল চার্চিল।

'আমাদের সাগরে ভাসিয়ে দিতে চাও?' ফ্রায়ার জিজ্ঞেস করল।

'ডাঙা এখান থেকে নয় লিগের বেশি হবে না,' জবাব দিল ক্রিশ্চিয়ান। 'এমন শান্ত সাগরে এটুকু পথ সহজেই পাড়ি দিতে পারবেন আপনারা।'

'আমি জাহাজেই থাকব।'

'না, মিস্টার ফ্রায়ার, ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের সাথে যাবেন আপনি। উইলিয়ামস! মাস্টারকে কেবিনে নিয়ে যাও। যতক্ষণ না আমি ডেকে পাঠাই ততক্ষণ ওখানেই রাখবে ওকে।'

এই সময় ফিরে এল ছুতোর মিস্ত্রী পার্সেল, পেছনে কাটারের সাজসরঞ্জাম হাতে তার দুই সহকারী নরম্যান আর ম্যাকইন্টশ। সোজা আমার কাছে এল পার্সেল।

'মিস্টার বিয়্যাম, আমি জানি তুমি ওদের দলে নও। তবু মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান তোমার বন্ধু–অন্তত ছিল; আমাদের হয়ে একটু অনুরোধ করো না ওকে, লঞ্চটা যেন দেয়। কাটারটার অবস্থা এমন খারাপ, কিছুতেই ওটা ডাঙা পর্যন্ত পৌঁছাবে না।'

সত্যি খুবই দুরবস্থা কাটারটার। অসংখ্য ফুটো তলায়; জায়গায় জায়গায় কাঠ পচে, পোকায় খেয়ে ফোঁপড়া করে ফেলেছে। এই কাটার নিয়ে কিছুতেই তীরে পৌঁছুতে পারবেন না ব্লাই।

'তুমিও চলো আমার সঙ্গে,' পার্সেলকে বললাম।

'না,' ও জবাব দিল, 'আমাকে ক্রিশ্চিয়ান পছন্দ করে না। আমি অনুরোধ করেছি টের পেলে না-ও দিতে পারে লঞ্চটা।'

আর সময় নষ্ট না করে তক্ষুণি আমি গেলাম ক্রিশ্চিয়ানের কাছে। লঞ্চের কথা বলতেই ও রাজি হয়ে গেল।

'ঠিক আছে, লঞ্চই পাবে,' ক্রিশ্চিয়ান বলল। 'ছুতোরকে বলো, ঠিকঠাক করে দিক ওটা।' এরপর ও চিৎকার করল, 'এই তোমরা! কাটার থাক। লঞ্চটা পরিষ্কার করো!'

চার্চিলের নেতৃত্বে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানাল কয়েকজন বিদ্রোহী।

'লঞ্চ! কি বলছেন আপনি, মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান?'

'না, স্যার, লঞ্চ দেয়া চলবে না! ওটা পেলে ঠিকই দেশে পৌঁছে যাবে বুড়ো শেয়ালটা।'

'হ্যাঁ, ওটাই যদি দিলাম তো আর শাস্তি হলো কি ব্যাটার?'

এমনি সব বক্তব্য, মন্তব্য আসতে লাগল। কোনটায় কান দিল না ক্রিশ্চিয়ান। শেষ পর্যন্ত ওর জেদের কাছে হার মানল লোকগুলো।

পরিস্থিতি এখন পুরোপুরি বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে। ক্রিশ্চিয়ান এবার ওর দলে নয় এমন সবাইকে ডেকে নিয়ে আসার নির্দেশ দিল।

প্রথমেই আনা হলো স্যামুয়েলকে। নাবিকদের সব অপমান টিটকারি নীরবে হজম করে সোজা সে ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল নির্দেশের অপেক্ষায়। কিন্তু ক্যাপ্টেন তাকে কি নির্দেশ দেবেন?–নির্দেশ দিল ক্রিশ্চিয়ান।

'যাও, কেবিনে গিয়ে তোমার স্যারের জামা কাপড় সব নিয়ে এসো,' বলল সে।

ক্যাপ্টেনের ব্যক্তিগত ভৃত্য জন স্মিথকে নিয়ে চলে গেল স্যামুয়েল। সঙ্গে গেল সশস্ত্র এক বিদ্রোহী।

একটু পরেই এল হেওয়ার্ড আর হ্যালেট। দু'জনেরই মুখ শুকনো, চোখে ভীতি। হ্যালেট তো কাঁদছেই ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে। কে একজন আমার কাঁধে হাত রাখল। ঘাড় ফেরাতেই দেখি মিস্টার নেলসন।

'যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে দূরে চলে এসেছি বাড়ি থেকে, কি বলো, বিয়্যাম? আমাদের নিয়ে কি করবে ওরা জানো নাকি?'

আমি যা জানি বললাম তাঁকে। শুকনো একটু হাসি ফুটল নেলসনের মুখে। দূরে দিগন্ত রেখার কাছে অস্পষ্ট একটা রেখার মত দেখা যাচ্ছে তোফোয়া দ্বীপ। হাত তুলে সেদিকে ইশারা করে তিনি বললেন, 'ক্যাপ্টেন ব্লাই বোধহয় ওখানে নিয়ে যাবেন আমাদের।'

মইয়ের মুখে ছুতোর মিস্ত্রীকে দেখা গেল। পেছনে কসাই ল্যাম্ব। দু'জন ধরাধরি করে তুলে আনছে ছুতোর মিস্ত্রীর যন্ত্রপাতির বাক্স।

'এই যে ঘটনাটা ঘটছে,' পার্সেল বলল, 'এর সব কৃতিত্ব কার বলে মনে হয় আপনার, মিস্টার নেলসন?'

'আমাদের কপালের, আর কি বলব বলো?'

'না, স্যার, কপাল টপাল কিছু না। এসবের জন্যে দায়ী আমাদের মিস্টার ব্লাই, আর কেউ না। লোকটা যা শুরু করেছিল এমন কিছু না ঘটলেই আমি বরং আশ্চর্য হতাম।'

ব্লাইয়ের সম্পর্কে ঘৃণা–গভীর ঘৃণা ছাড়া আর কিছু নেই পার্সেলের মনে। ভ্যান ডিয়েমেনস ল্যান্ডে সেই ঘটনার পর একান্ত প্রয়োজন না হলে কখনও সে কথা বলেনি তাঁর সাথে। তবু মিস্টার নেলসন যখন বললেন, সে ইচ্ছে করলে থেকে যেতে পারে জাহাজে তখন তার মুখের অবস্থা যা হলো সে দেখার মত।

'জাহাজে থেকে যাব?' আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল পার্সেল। 'বদমাশ দস্যুদের সাথে? না, স্যার, তার চেয়ে ওই জঘন্য লোকটার সাথে যেতেই আমি বেশি পছন্দ করব।'

এই সময় হঠাৎ চার্চিলের চোখ পড়ল আমাদের ওপর।

'ওটা কি তোমার সাথে, পার্সেল?' গর্জে উঠল সে। 'আমাদের সব যন্ত্রপাতি চুরি করার মতলব এঁটেছ?'

'তোমাদের যন্ত্রপাতি, নচ্ছারের দল! এগুলো আমার; আমি যেখানে যাব এগুলোও সেখানে যাবে।'

'জাহাজ থেকে একটা পেরেকও তুমি সরাতে পারবে না,' জবাব দিল চার্চিল। এর পর সে একজনকে পাঠিয়ে ডাকিয়ে আনল ক্রিশ্চিয়ানকে। শুরু হলো বিতর্ক, শুধু যন্ত্রপাতি নয় স্বয়ং ছুতোর মিস্ত্রীকে নিয়েও। মিস্ত্রীগিরিতে ওর দক্ষতার কথা বিবেচনা করে ক্রিশ্চিয়ান ভাবছে ওকে রেখে দেবে জাহাজে। কিন্তু বাকি সবাই এর ঘোর বিরোধী। মেজাজের দিক থেকে কোন অংশে কম নয় সে ব্লাইয়ের চেয়ে। তাই ওদের ধারণা পার্সেলকে সঙ্গে রাখলে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই হবে বেশি।

'স্যার, ব্লাইয়ের চেয়ে কম নয় ও বদমায়েশিতে,' একজন বলল।

'ওর সহকারী দু'জনকে রেখে দিন, মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান,' আরেক জনের পরামর্শ, 'আমাদের যা প্রয়োজন ওরাই মেটাতে পারবে।'

'জোর করে হলেও ওকে নৌকায় তুলে দিতে হবে,' বলল আরেক জন।

'জোর করবি, গুণ্ডার দল?' চিৎকার করল পার্সেল, 'আমি এমনিই যাব, দেখি কে আমাকে ঠেকায়!'

দুর্ভাগ্যক্রমে পার্সেল লোকটা নির্ভীক হলেও একটু মাথা মোটা ধরনের। ব্লাইয়ের দলের সুবিধা অসুবিধার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সে হাম্বড়ার মত চিৎকার করতে লাগল বিদ্রোহীদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া মাত্র সে কি করবে না করবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

'আমার কথা শুনে রাখ, বদমাশরা!' চেঁচাল সে। 'তোদের সব ক'টাকে কাঠগড়ায় তুলে তবে ছাড়ব! আমাদের ভাসিয়ে দিবি?—দে। তাতে আমাদের কচু হবে। আমরা জাহাজ একটা বানিয়ে…'

'ঠিক, মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান,' অনেকগুলো লোক এক সাথে চিৎকার করে উঠল, 'শালা এত ভাল মিস্ত্রী, যন্ত্রপাতি সঙ্গে থাকলে ঠিকই জাহাজ বানিয়ে ফেলবে।'

বড়াই করতে করতে কি করে ফেলেছে যখন পার্সেল বুঝল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস অনেক যন্ত্রপাতিই ওকে দিত ক্রিশ্চিয়ান—প্রতিটা যন্ত্র দুটো তিনটে করে আছে জাহাজে, সুতরাং দিলে বিদ্রোহীদের খুব একটা অসুবিধা হত না—কিন্তু এখন, জাহাজ বানিয়ে নেবে এই কথা শোনার পর সে ঝুঁকি আর নিল না ক্রিশ্চিয়ান। যন্ত্রপাতির বাক্সটা নিচে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল তার লোকদের। ছোট একটা কুঠার, একটা হাতুড়ি আর এক থলে পেরেক কেবল সাথে রাখতে দিল পার্সেলকে।

লঞ্চটা খালি করা হয়ে গেছে। পাল, মাস্তুল, দড়ি-দড়া, দাঁড়, বৈঠা—যা যা দরকার ওটা চালানোর জন্যে সব এবার উঠিয়ে দেয়া হলো। কিছু খাবার, মদ এবং পানিও দেয়া হলো। তারপর ক্রিশ্চিয়ানের নির্দেশে পানিতে নামিয়ে দেয়া হলো লঞ্চটা।

প্রথম যাকে লঞ্চে নামতে বলা হলো সে স্যামুয়েল। তারপর হেওয়ার্ড আর হ্যালেট। এখন দু'জনই কাঁদছে। হাত জোড় করে ক্ষমা ভিক্ষা করছে হাউ মাউ করে। কেউ কর্ণপাত করল না ওদের কথায়। টেনে হিঁচড়ে রেলিংয়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো দু'জনকে। নামিয়ে দেয়া হবে লঞ্চে, এই সময় হেওয়ার্ড তাকে ধরে থাকা লোকটার হাত থেকে কোন মতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ফিরল ক্রিশ্চিয়ানের দিকে।

'আমি আপনার কি করেছি, মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান,' কাঁদতে কাঁদতে সে বলল, 'যে আমার সাথে এমন ব্যবহার করছেন? আপনার দুটো পায়ে ধরি, আমাকে জাহাজে থাকতে দিন!'

'তোমাকে ছাড়াও আমরা কাজ চালিয়ে নিতে পারব,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ক্রিশ্চিয়ান। 'যাও নেমে পড়ো লঞ্চে, দুজনই!'

এরপর গেল পার্সেল। ওকে কোন রকম পীড়াপীড়ি করতে হলো না। বিদ্রোহীদের দখল করা জাহাজে থাকার চেয়ে মরতে রাজি ও। ওর পেছন পেছন গেল সারেং কোল। এর পর ব্লাইকে রেলিংয়ের ধারে নিয়ে আসার নির্দেশ দিল ক্রিশ্চিয়ান।

আনা হলো ব্লাইকে। দু'হাতের বাঁধন খুলে দেয়া হয়েছে।

'এবার, মিস্টার ব্লাই,' ক্রিশ্চিয়ান বলল, 'ওই যে আপনার নৌকা তৈরি, যান উঠে পড়ুন!'

'ক্রিশ্চিয়ান,' শান্ত কণ্ঠে ব্লাই বললেন, 'শেষবারের মত তোমাকে অনুরোধ করছি, আরেকবার ভেবে দেখ! আমি কথা দিচ্ছি–ঈশ্বরের কসম খেয়ে বলছি, অস্ত্রসমর্পণ করো, একথা আমি ভুলে যাব। আমার স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েদের কথা একবার ভাবো!'

'না, মিস্টার ব্লাই, এ ঘটনা ঘটার আগে আপনারই ভাবা উচিত ছিল আপনার স্ত্রী-পরিবারের কথা। আর আপনার কসমের মূল্য কতটুকু সে আমাদের জানা আছে। যান, স্যার, নৌকায় উঠে পড়ুন।'

অনুনয় বিনয় অর্থহীন বুঝতে পেরে আর কথা বাড়ালেন না ব্লাই। মই বেয়ে নেমে গেলেন লঞ্চে। পেকওভার আর নর্টন গেল পেছন পেছন। এরপর একটা সেক্সট্যান্ট আর মানচিত্রের বই ছুঁড়ে দিল ক্রিশ্চিয়ান ব্লাইয়ের দিকে। বলল, 'আমার মনে হয় এগুলো দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতে পারবেন। কম্পাস তো আছেই আপানার কাছে।'

বিদ্রোহীদের হাতের বাইরে গিয়েই আবার স্বমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করলেন ব্লাই।

'তোমাকে আমি দেখে নেব, বদমাশ!' আঙুল উঁচিয়ে ক্রিশ্চিয়ানের দিকে নাড়তে নাড়তে চিৎকার করলেন তিনি। 'মনে রেখো, অকৃতজ্ঞ শয়তান! প্রতিশোধ আমি নেবই। দু'বছরের ভেতর তোমাকে ফাঁসিকাঠে তুলব! তোমার সঙ্গের বদমাশগুলোকেও!'

ভাগ্য ভাল ব্লাইয়ের, ক্রিশ্চিয়ানের মনোযোগ তখন অন্য দিকে। ও খেয়াল করতে পারল না কথাগুলো। তবে বিদ্রোহীদের কয়েক জন জরাব দিল ওর হয়ে। ব্লাইয়ের ভঙ্গি অনুকরণ করেই তারা চিৎকার করল: 'যা ব্যাটা ছুঁচো, যা পারিস করিস!'

হাতে বন্দুক থাকা সত্ত্বেও কেন যে সেদিন কেউ গুলি করে বসেনি ভেবে আজও আমি বিস্মিত বোধ করি।

যা হোক, একটু পরেই বুঝতে পারলাম, আরও অনেককে, অর্থাৎ যে যেতে চাইবে তাকেই, যেতে দেয়া হবে ব্লাইয়ের সাথে। ক্রিশ্চিয়ান হয়তো ভেবেছে, ব্লাইয়ের পক্ষের বা নিরপেক্ষ লোক জাহাজে যত কম থাকে ততই মঙ্গল। লোকগুলোকে চোখে চোখে রাখার ঝামেলা থেকে তারা রেহাই পাবে। এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলাম না আমি। মিস্টার নেলসন দাঁড়িয়ে ছিলেন কাছেই, তাঁকে নিয়ে দ্রুত এগোলাম পেছনের মইয়ের দিকে; নিচ থেকে দু'চারটা কাপড়-চোপড় নিয়ে এসে উঠে পড়ব লঞ্চে। মইয়ের মুখে আমাদের

থামাল ক্রিশ্চিয়ান।

'মিস্টার নেলসন,' সে বলল, 'আপনি আর বিয়্যাম ইচ্ছে হলে থাকতে পারেন জাহাজে।'

'যে দুর্ভোগ তুমি ভুগেছ সেজন্যে সত্যিই আমি সহানুভূতিশীল তোমার প্রতি,' জবাব দিলেন নেলসন। 'কিন্তু তার অর্থ এই নয়...'

'আপনার কাছে সহানুভূতি আমি চেয়েছি?' বাধা দিয়ে বলল ক্রিশ্চিয়ান। 'বিয়্যাম, কি করবে তুমি?'

'ক্যাপ্টেনের সাথে যাব।'

'তাহলে তাড়াতাড়ি, তোমরা দু'জনেই।'

'দু'একটা কাপড়-চোপড় নেয়ার অনুমতি পাব তো?' জিজ্ঞেস করলেন নেলসন।

'হ্যাঁ। কিন্তু সাবধান, কোন রকম চালাকির চেষ্টা করলে কিন্তু বেঘোরে মারা পড়বেন।'

নিচে নেমে নেলসন তাঁর কেবিনের দিকে চলে গেলেন, আমি ঢুকলাম মিডশিপম্যানদের বার্থে। থম্পসন এখনও পাহারা দিচ্ছে অস্ত্রের সিন্দুকটা। টিঙ্কলার আর এলফিনস্টোনকে সকাল থেকে দেখিনি একবারও। গেল কোথায় দু'জন? ডান দিকের বার্থে নেই তো? একবার খুঁজে দেখি, ভেবে যে-ই পা বাড়িয়েছি অমনি থম্পসনের গলা শুনতে পেলাম।

'না! ওদিকে যাবে না। কাপড় নিতে এসেছ, নিয়ে ভেগে পড়ো তাড়াতাড়ি!'

ডান দিকের বার্থে আর যাওয়া হলো না, কাপড় গোছাতে শুরু করলাম দ্রুত। হঠাৎ একটা জিনিস দেখে ভীষণ অবাক হলাম আমি। ইয়ং এখনও ঘুমাচ্ছে তার হ্যামকে। রাত বারোটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত কাজ করেছে ইয়ং। নিয়ম মত এটা ওর ঘুমানোর সময়। কিন্তু জাহাজে যে হৈ-হট্টগোল চলছে তার ভেতর কি করে ও ঘুমাচ্ছে আমি ভেবে পেলাম না। নিঃশব্দে গায়ে ঠেলা দিয়ে ওকে জাগানোর চেষ্টা করলাম। লাভ হলো না। অসম্ভব গাঢ় ইয়ংয়ের ঘুম। ওকে ছেড়ে দিয়ে আবার আমার জিনিসপত্র নিয়ে পড়লাম। যে সব জিনিস সবচেয়ে জরুরী, না নিলেই নয় সেগুলো বাছাই করছি এমন সময় চোখ গেল বার্থের কোনায় খাড়া করে রাখা কয়েকটা ইন্ডিয়ান লাঠির দিকে। ইন্ডিয়ানরা ওগুলো লড়াইয়ের সময় ব্যবহার করে। নামুকার জংলীদের কাছ থেকে আমি যোগাড় করেছিলাম লোহাকাঠের এই লাঠিগুলো। ওগুলো দেখেই একটা চিন্তা খেলে গেল আমার মাথায়: 'এর একটা দিয়ে যদি মারি থম্পসনের মাথায়, জ্ঞান হারাবে না?'

আমি জানি, বেশি ভাবনা চিন্তা করতে গেলে অনেক কাজই অনেক সময় করা হয় না। সুতরাং বেশি ভাবাভাবির ধার না ধেরে তুলে নিলাম একটা লাঠি। দরজার কাছে গিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখলাম, থম্পসন বসে আছে সিন্দুকের ওপর। মাস্কেটটা দু'পায়ের মাঝে খাড়া করে রাখা। আমাকে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখে ও চিৎকার করে উঠল:

'সাবধান, বেরিয়ে এসো ওখান থেকে! এক্ষুণি!'

দুই বার্থের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখলাম মরিসনকে। আর কি কপাল, ঠিক তখনই ওপর থেকে কে যেন ডাকল থম্পসনের নাম ধরে। ও ওপরে তাকাতেই আমি হাতের ইশারায় মরিসনকে ডাকলাম। এবং থম্পসন মুখ নামানোর আগেই মরিসন ঢুকে পড়ল আমার বার্থে। কোন কথা না বলে আমি একটা লাঠি ধরিয়ে দিলাম ওর হাতে। তারপর দু'জনে মিলে শেষ বারের মত একবার চেষ্টা করলাম ইয়র্ককে জাগানোর। তাতে সময়ই নষ্ট হলো শুধু। হ্যামক থেকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে প্রায় নামিয়ে ফেললাম, কিন্তু ঘুম ভাঙল না ওর। বাইরে থেকে থম্পসনের চিৎকার ভেসে এল: 'ও, স্যার, কাপড় গোছাচ্ছে, পাঠিয়ে দিচ্ছি এক্ষুণি।'

দরজার এক পাশে গিয়ে দাঁড়াল মরিসন। আমি অন্য পাশে। দু'জনই উঁচিয়ে ধরেছি লাঠি। দু'জনই আশা করছি, আমাকে ডাকতে ভেতরে ঢুকবে থম্পসন। কিন্তু না, খুবই হুঁশিয়ার সে। বাইরে থেকেই চিৎকার করল: 'বেরিয়ে এসো, বিয়্যাম, এক্ষুণি!'

'আসছি,' বলে আমি আবার উঁকি দিলাম। যা দেখলাম তাতে ধড়াস করে উঠল বুকের ভেতর। বিশালদেহী বারকিট আর ম্যাককয় এগিয়ে আসছে হ্যাচের দিক থেকে। দু'জনেরই হাতে মাস্কেট। থম্পসনের কাছে পৌঁছে থামল ওরা। আশা নেই বুঝতে পেরেও আরও মিনিট দুয়েক কাটালাম বার্থের ভেতর। তিন বিদ্রোহীও রইল যেখানে ছিল সেখানে। হ্যাচের কাছ থেকে চিৎকার শুনতে পেলাম নেলসনের: 'বিয়্যাম। জলদি করো, নইলে কিন্তু রয়ে যাবে তুমি!'

এক মুহূর্ত পর টিঙ্কলারের গলা? 'আসলে এসো, বিয়্যাম! আমরা গেলাম!'

আর কিছু করার রইল না আমাদের। লাঠি দুটো যেখানে ছিল সেখানে রেখে ছুটে বেরিয়ে গেলাম বার্থ থেকে। এতক্ষণে থম্পসন আসছে ব্যাপার কি দেখার জন্যে। ওর সাথে ধাক্কা খেতে খেতে বেঁচে গেল মরিসন।

'আরে, মরিসন! তুমি এখানে কি করছ?' চিৎকার করল থম্পসন।

জবাব দেয়ার জন্যে দাঁড়ালাম না আমরা। এক ছুটে মাঝের পথটুকু পেরিয়ে পৌঁছুলাম মইয়ের গোড়ায়। তাড়াহুড়ো করে উঠতে গিয়ে দু'বার পা হড়কাল। কোন মতে যখন ডেকে পৌঁছুলাম, চার্চিল এসে ধরল আমাকে।

'অনেক দেরি করে ফেলেছ, বিয়্যাম,' সে বলল। 'তুমি যেতে পারছ না।'

'যেতে পারছি না! মানে?' চিৎকার করে উঠে চার্চিলের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করলাম। ভীষণ অবস্থা তখন আমার। চোখের সামনে দেখছি লঞ্চটা পেছনে চলতে শুরু করেছে, অথচ আমি এখনও দাঁড়িয়ে আছি ডেকের ওপর। বিদ্রোহীদের একজন লঞ্চ বাঁধা রশিটা উঁচু করে নিয়ে চলেছে পেছন দিকে। বারকিট আর কুইনটাল ধরে রেখেছে কোলম্যানকে। আমার মত হাত পা ছুঁড়ছে সে-ও। মরিসন যুঝছে চার পাঁচ জনের সঙ্গে।

আমরা সত্যি সত্যিই দেরি করে ফেলেছি। লঞ্চটা এখন কানায় কানায়

ভর্তি বলতে যা বোঝায় তাই। ওতে যদি আর একজনও ওঠে সব ক'জনেরই জীবন বিপন্ন হবে। ব্লাইয়ের চিৎকার শুনতে পেলাম: 'আর কাউকে নিতে পারছি না! দুশ্চিন্তা কোরো না, ইংল্যান্ডে যদি পৌঁছাতে পারি তোমাদের যাতে সুবিচার হয় আমি দেখব!'

পেছনে চলছে লঞ্চ। রশি হাতে বিদ্রোহী যেতে যেতে চলে গেছে জাহাজের একেবারে শেষ মাথায়। এবার সে রশির প্রান্তটা ছুঁড়ে দিল লঞ্চের দিকে। লঞ্চের কেউ একজন টেনে তুলে নিল সেটা। আমরা যারা বিদ্রোহী নই অথচ কপাল দোষে জাহাজে রয়ে গেছি তারা হুড়মুড় করে গিয়ে দাঁড়ালাম রেলিং ঘেঁষে। আকুল নয়নে তাকিয়ে আছি লঞ্চটার দিকে। আমাদের সর্বস্ব যেন রাহাজানি করে নিয়ে যাচ্ছে ওটা। ব্লাইকে দেখলাম, পেছন দিকের একটা আড় কাঠে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্যদের কেউ কেউ বসে, কেউ কেউ দাঁড়িয়ে। নৌকাটা এমন বোঝাই হয়েছে, খুব বেশি হলে সাত কি আট ইঞ্চি জেগে আছে জলের ওপর। জাহাজ এবং লঞ্চ দু'দিক থেকেই ছুটছে চিৎকার আর গালাগালির তুবড়ি। ব্লাইয়ের গলাও শোনা যাচ্ছে মাঝে মধ্যে, নৌকায় তাঁর সঙ্গীদের আদেশ নির্দেশ দিচ্ছেন চিৎকার করে।

বিদ্রোহীদের কয়েকজন গম্ভীর, কিছুটা চিন্তিত মুখে তাকিয়ে আছে। অন্যরা প্রাণ-খুলে বিদ্রূপ করছে ব্লাইকে। একজনকে চেঁচাতে শুনলাম: 'এবার যাও, পরখ করে দেখ আধ পাউন্ড ইয়ামে দিন চলে কি না, ব্যাটা বুড়ো উল্লুক!'

'ঈশ্বরের দোহাই, মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান, আমাদের কিছু অস্ত্রশস্ত্র দাও!' ফ্রায়ার চিৎকার করল। 'একবার ভাবো আমরা কোথায় যাচ্ছি! অন্তত প্রাণ বাঁচানোর জন্যে লড়ার একটা সুযোগ আমাদের দাও!'

'মামা বাড়ির আবদার, না?' জাহাজ থেকে কেউ একজন চিৎকার করল।

'অস্ত্রের কোন দরকার তোমাদের হবে না,' অন্য একজন।

'বুড়ো শয়তানটা তো জংলীদের দোস্ত, ও-ই বাঁচাবে তোমাদের।'

কোলম্যান দাঁড়িয়ে ছিল আমার পাশে। ওকে নিয়ে ক্রিশ্চিয়ানের কাছে গিয়ে অনুরোধ করলাম কয়েকটা মাস্কেট আর কিছু গুলি বারুদ যেন দেয়া হয় ব্লাইকে।

'না!' বলল ক্রিশ্চিয়ান। 'কোন আগ্নেয়াস্ত্র ওদের দেয়া হবে না।'

'তাহলে অন্তত কয়েকটা তলোয়ার দিন, মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান,' মিনতি করল কোলম্যান, 'নইলে ডাঙায় পা রাখা মাত্র হয়তো খুন হয়ে যাবে সব ক'জন। নামুকার কথা একবার ভাবুন!'

এই প্রস্তাবে রাজি হলো ক্রিশ্চিয়ান। চারটে তলোয়ার একটা দড়ির মাথায় বেঁধে ছুঁড়ে দেয়া হলো লঞ্চে।

'কাপুরুষের দল!' রাগে গর্জন করে উঠল পার্সেল। 'এছাড়া আর কিছু দিবি না?'

'আর কি চাও, বাবা ছুতোর?' উইলিয়াম ব্রাউন চেঁচাল, 'অস্ত্রের পুরো সিন্দুকটাই নামিয়ে দেব ভাবছ নাকি?'

ম্যাককয় বলল, 'আরও চায়? পেটটা ওর সীসা দিয়ে ভরে দাও দেখি!'

শোনা মাত্র মাস্কেট তুলে তাক করল বারকিট। ক্রিশ্চিয়ানের নির্দেশে তাড়াতাড়ি দু'তিন জন এসে ওর হাত থেকে কেড়ে নিল মাস্কেটটা। ওকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হলো নিচে।

চুপ করে গেল পার্সেল। এদিকে ফ্রায়ার এবং অন্যরা শিগগির শিগগির জাহাজের কাছ থেকে লঞ্চ সরিয়ে নেয়ার জন্যে ব্লাইকে তাড়া দিতে শুরু করেছে। বিদ্রোহীদের গতিক সুবিধার নয়, যে কোন মুহূর্তে গুলি গোলা চালিয়ে বসতে পারে। ব্যাপারটা ব্লাই-ও বুঝেছেন। সবাইকে দাঁড় তুলে নেয়ার নির্দেশ দিলেন তিনি।

একটু পরেই লঞ্চের মুখ ঘুরে গেল। ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে বাউন্টির কাছ থেকে। ওটার মুখ এখন প্রায় দশ লিগ উত্তরপুবে তোফোয়া দ্বীপের দিকে। এতদিন কখনোই আমরা বারো জনের বেশি উঠিনি লঞ্চটায়–ভাবতাম এর বেশি উঠলে বিপদ ঘটতে পারে, অথচ ওটাই এখন উনিশ জনকে বয়ে নিয়ে চলেছে। তাছাড়া কিছু মালপত্র, খাদ্য এবং পানীয় তো আছেই।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমরা দেরি করে ফেলেছিলাম, বিয়্যাম!' মরিসন বলল আমার পাশ থেকে।

'মন থেকে বলছ এ কথা?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

একটু যেন থতমত খেল মরিসন। ভাবল এক মুহূর্ত। তারপর বলল, 'না, বিয়্যাম, এমনি কথার কথা বললাম। সুযোগ পাইনি, পেলে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতাম। যদিও জানি তাতে লাভ কিছু হত না–ওরা কখনোই ইংল্যান্ডে পৌঁছুতে পারবে না।'

আধঘণ্টার ভেতর লঞ্চটা বিলীন হয়ে গেল দিগন্তে। ক্রিশ্চিয়ানের নির্দেশে পাল তুলে দেয়া হলো বাউন্টির। বাতাস এখনও কাল রাতের মতই হালকা। পালগুলো ফুললও না ভাল মত। ধীর গতিতে এগিয়ে চলল জাহাজ, পশ্চিম-উত্তর পশ্চিম দিকে।

নয়

ভাগ হয়ে গেছে বাউন্টির নাবিকরা।

ব্লাই ছাড়াও মাস্টার জন ফ্রায়ার, সহকারী সার্জন টমাস লেডওয়ার্ড, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডেভিড নেলসন, গোলন্দাজ পেকওভার, সারেং উইলিয়াম কোল, মাস্টারের মেট উইলিয়াম এলফিনস্টোন, ছুতোর উইলিয়াম পার্সেল; মিডশিপম্যান টমাস হেওয়ার্ড, জন হ্যালেট, রবার্ট টিঙ্কলার; দুই কোয়ার্টার মাস্টার জর্জ নর্টন, পিটার লেঙ্কলেটার; কোয়ার্টার মাস্টারের মেট জর্জ সিম্পসন, পালনির্মাতা লয়েন্স লেবোগ, কেরানী স্যামুয়েল, কসাই ল্যাম্ব, বাবুর্চি জন স্মিথ আর টমাস হলকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে লঞ্চে।

বাকিরা রয়েছে জাহাজে। তাদের ভেতরও দুটো ভাগ–একদল সক্রিয়ভাবে

বিদ্রোহে অংশ নিয়েছে, আর একদল বিদ্রোহে অংশ না নিয়েও কপাল দোষে রয়ে গেছে জাহাজে।

বিদ্রোহে যারা সক্রিয় অংশ নিয়েছে তারা হলো: ভারপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট ফ্লেচার ক্রিশ্চিয়ান, গোলন্দাজের মেট জন মিলস, মাস্টার অ্যাট আর্মস চার্লস চার্চিল, মালী উইলিয়াম ব্রাউন; খালাসী টমাস বারকিট, ম্যাথ্যু কুইন্টাল, জন সামনার, জন মিলওয়ার্ড, উইলিয়াম ম্যাককয়, হেনরি হিলব্রান্ডট, আর্লেকজান্ডার স্মিথ, জন উইলিয়ামস, টমাস এলিসন, আইজাক মার্টিন, রিচার্ড স্কিনার আর ম্যাথ্যু থম্পসন।

যারা বিদ্রোহে অংশ না নিয়েও জাহাজে থেকে যেতে বাধ্য হয়েছে তাদের দলে আছে: মিডশিপম্যান এডওয়ার্ড ইয়ং, জর্জ স্টুয়ার্ট; সারেং-এর সহকারী জেমস মরিসন, আর্মারার জোসেফ কোলম্যান; ছুতোর মিস্ত্রীর দুই সহকারী চার্লস নরম্যান ও টমাস ম্যাকইন্টশ আর খালাসী উইলিয়াম মুসপ্র্যাট। এছাড়াও আছে সেই প্রায় অন্ধ নাবিক মাইকেল বায়ার্ন আর আমি।

যারা সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহে অংশ নিয়েছে তারা যারা নেয়নি তাদের সন্দেহের চোখে দেখবে, বা নাজেহাল করবে এটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল বিদ্রোহীদের কেউই খুব একটা দুর্ব্যবহার করল না আমাদের সাথে। চার্চিল কেবল বলল, 'তোমাদের নিয়ে কি করা হবে যতক্ষণ না ঠিক হচ্ছে ততক্ষণ ডেকেই থাকবে তোমরা।'

কিছুক্ষণ পর নিচ থেকে ছাড়া পেয়ে টমাস বারকিট ওপরে এল। মাস্কেট তুলেও গুলি করতে পারেনি বলে মেজাজটা ওর খিঁচড়ে ছিল। এবার আমাদের ওপর চোখ পড়তেই আগুন হয়ে উঠল, যেন ও গুলি করতে পারেনি সেটা আমাদেরই দোষ। কুৎসিত একটা গালাগাল দিয়ে আমাদের নিয়ে ঠাট্টা মশকরা শুরু করল সে। ওর সাথে যোগ দিল থম্পসন, ম্যাককয় আর জন উইলিয়ামস। কয়েক মিনিটের ভেতর আমাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। হাতাহাতি লেগে যায় আর কি দু'দলে। হৈ-চৈ শুনে এগিয়ে এল ক্রিশ্চিয়ান। রাগে ওর চোখ দুটো জ্বলছে ভাঁটার মত।

'থম্পসন, তুমি তোমার কাজে যাও,' গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করল সে। 'আর, বারকিট, আর যদি ঝামেলা পাকাও, তোমাকে শিকলে বাঁধার নির্দেশ দিতে বাধ্য হব আমি!'

'আচ্ছা! তাই নাকি?' বিদ্রূপ করল থম্পসন। 'দেখুন, মিস্টার ক্রিশ্চিয়ান, আরেকজন ক্যাপ্টেন ব্লাইকে ঘাড়ের ওপর বসানোর জন্যে আমরা বিদ্রোহ করিনি, কথাটা আপনার জেনে রাখা দরকার!'

'ঠিক, আর কোন ব্লাইকে আমরা চাই না,' জুড়ে দিল উইলিয়ামস।

কোন কথা বলল না ক্রিশ্চিয়ান। ওদের দিকে তাকাল শুধু। আমি দেখলাম, ওর চোখে ক্রোধ নেই তিরস্কার নেই; যা আছে তার একটাই নাম দেওয়া যেতে পারে—কর্তৃত্ব। একে একে চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হলো চারজন।

আরও কয়েকজন বিদ্রোহী এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের আশেপাশে। তাদের

ভেতর থেকে আলেকজান্ডার স্মিথকে ডেকে ক্রিশ্চিয়ান বলল, 'সবাইকে ডেকে আসতে বলো।'

এল সবাই। একে একে প্রত্যেকের দিকে তাকাল ক্রিশ্চিয়ান। কোন রকম ভাব বা অনুভূতি নেই ওর চোখে।

'একটা ব্যাপার চিরদিনের জন্যে ফয়সালা হয়ে যাওয়া দরকার,' শান্ত কণ্ঠে শুরু করল সে, 'কে এই জাহাজের ক্যাপ্টেন হবে। তোমাদের সাহায্য নিয়ে আমি একে দখল করছি। কেন? একজন স্বেচ্ছাচারী, যে আমাদের প্রত্যেকের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে। এখন থেকে নিজেদের সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা মনে ঠাঁই দেয়া আমাদের উচিত হবে না। আমরা বিদ্রোহী। বিদ্রোহ করে আমরা রাজার জাহাজ দখল করে নিয়েছি। রাজার আর কোন জাহাজ যদি আমাদের খোঁজ পায়, এবং কোন মতে ধরে ইংল্যান্ডে নিয়ে যেতে পারে, তোমরা নিশ্চিত থাকতে পারো, মৃত্যু ছাড়া আর কোন শাস্তি আমাদের দেয়া হবে না। তোমাদের কেউ কেউ হয়তো ভাবছ, সে সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কিন্তু সত্যি কথাটা হলো, সম্ভাবনা আছে এবং বেশ ভাল পরিমাণেই আছে। ব্লাই যদি কোন মতে ইংল্যান্ডে ফিরতে পারে, ও পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খোঁজে যুদ্ধ জাহাজ পাঠানো হবে। ও যদি না পৌঁছায়, তবু এক বা দু'বছরের ভেতর যদি বাউন্টি না ফেরে যুদ্ধ জাহাজ পাঠানো হবে। আর কিছু না হোক বাউন্টির গায়েব হয়ে যাওয়ার কারণ খোঁজার জন্যে হলেও পাঠানো হবে। সুতরাং আমাদের সামনে আসলে খুশি হওয়ার মত তেমন কিছু নেই। একটা কথা তোমরা মনে গেঁথে নিতে পারো, ইংল্যান্ড থেকে আমরা চিরদিনের জন্যেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। ওখানে ফেরার কথা স্বপ্নেও আমাদের মনে ঠাঁই দেয়া উচিত হবে না।

'এখন প্রশ্ন, তাহলে আমরা কী করব? আমাদের সামনে পেছনে, ডানে বাঁয়ে বিশাল প্রশান্ত মহাসাগর। এই মহাসমুদ্রের কোথায় কি আছে সে সম্পর্কে এত সামান্য আমরা জানি যে, যদি আমরা নিজেদের দোষে ধরা না পড়ি তো আমার মনে হয় না কেউ আমাদের খুঁজে বের করে ধরতে পারবে। সুতরাং এই মুহূর্তে আমাদের যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো একজন নেতা, যার নির্দেশ কোন রকম প্রশ্ন না তুললেই আমরা মেনে নেব। আমাকে যদি তোমরা নেতা নির্বাচন করো, আমি নিঃশর্ত বাধ্যতা চাইব তোমাদের কাছে–হ্যাঁ, নিঃশর্ত বাধ্যতা। বিনিময়ে আমি শুধু এটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি, তোমাদের কারও ওপর কোন অন্যায় আমি করব না; যথার্থ কারণ না থাকলে কাউকে শাস্তি দেব না। আমি এমন কোন কাজ করব না–অন্তত আমার জ্ঞান মতে–যাতে তোমাদের কারও কোন ক্ষতি হয়।

'এখন বলো তোমরা কি করবে? আমি চাই তোমরাই ঠিক করবে কে পরিচালনা করবে বাউন্টিকে। যদি মনে করো আমার চেয়ে যোগ্য লোক তোমাদের ভেতর আছে, নাম বলো, তার সমর্থনে আমি ছেড়ে দেব আমার নেতৃত্বের দাবি। আর যদি মনে করো, আমিই যোগ্য তাহলে আমার ওই কথা–কোন প্রশ্ন না তুলে মেনে নিতে হবে আমার আদেশ–সে যেকোন

পরিস্থিতিতে যেকোন আদেশই হোক।'

থামল ক্রিশ্চিয়ান। চুপ সবাই। কি বলবে বা বলা উচিত কেউ যেন বুঝতে পারছে না। 'হ্যাঁ, বলো, কি বলার আছে তোমাদের?' অবশেষে নীরবতা ভাঙল চার্চিল।

'আমার মনে হয় মিস্টার ক্রিশ্চিয়ানই সবচেয়ে যোগ্য লোক আমাদের ভেতর,' স্মিথ বলল।

সঙ্গে সঙ্গে স্মিথের সমর্থনে 'হ্যাঁ, হ্যাঁ' করে উঠল বেশির ভাগ বিদ্রোহী। বাদ রইল কেবল থম্পসন আর উইলিয়ামস। তবে ক্রিশ্চিয়ান যখন হাত তুলতে বলল তখন অন্যদের সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলল ওরাও।

'আর একটা ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে,' বলে চলল ক্রিশ্চিয়ান। 'আমাদের সঙ্গে এমন কয়েকজন লোক রয়েছে যারা জাহাজ দখলের ব্যাপারে কোন ভূমিকা নেয়নি। সুযোগ পেলে ব্লাইয়ের সঙ্গে চলে যেত...'

'শিকল দিয়ে বেঁধে রাখুন,' বলে উঠল মিলস। 'নয়তো সুযোগ পেলেই আমাদের ক্ষতি করবে ওরা।'

'এই জাহাজে সত্যিকারের কারণ না থাকলে কোন দিনই কাউকে আর শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হবে না,' জবাব দিল ক্রিশ্চিয়ান। 'আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়নি মানেই ওরা দোষ করেছে তা আমি মনে করি না। ওদের কাছে যা ভাল মনে হয়েছে তা-ই ওরা করেছে; ওদের সিদ্ধান্তকে আমি সম্মান করি। কিন্তু এখন–যখন আমাদের আর ওদের ভাগ্য এক সূত্রে বাঁধা হয়ে গেছে তখন যদি কোনরকম ছল-চাতুরী বা বিশ্বাসঘাতকতা করে কি শাস্তি ওদের দিতে হবে তা আমি জানি। ওদের ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি ঠিক করার ভার–ওরা কি করবে।'

এর পর এক একে আমাদের প্রত্যেককে আলাদা ভাবে ডেকে ক্রিশ্চিয়ান জিজ্ঞেস করল, আমরা এই জাহাজের একজন হিসেবে অন্যদের সাথে সহযোগিতা করতে রাজি আছি কি না। আমরা বললাম, নতুন ক্যাপ্টেনের নির্দেশ আমরা মেনে চলব, আমাদের সাধ্যমত সাহায্য করব জাহাজ পরিচালনায়, এবং বিশ্বাসঘাতকতা করার কোন রকম চেষ্টা করব না–অন্তত যতক্ষণ জাহাজে আছি ততক্ষণ না।

'এটুকুই যথেষ্ট,' আমাদের সবার বক্তব্য শোনার পর ক্রিশ্চিয়ান বলল। 'তোমাদের কাছ থেকে এর বেশি কিছু চাই না আমি।'

এর পর নতুনভাবে বাউন্টির অফিসারদের নির্বাচন করা হলো। ইয়ংকে করা হলো মাস্টার, স্টুয়ার্টকে মাস্টারের মেট, আমাকে কোয়ার্টার মাস্টার, মরিসনকে সারেং আর আলেকজান্ডার স্মিথকে সারেং-এর মেট। চার্চিল যা ছিল তা-ই রইল, অর্থাৎ মাস্টার অ্যাট আর্মস। বারকিট আর হিলব্রান্ডটকে করা হলো কোয়ার্টার মাস্টারের মেট। মিলওয়ার্ড আর বায়ার্নের ওপর দায়িত্ব দেয়া হলো রান্নাঘরের। আগের মতই তিন চৌকিতে ভাগ করা হলো আমাদের।

এই সব খুঁটিনাটি বিষয়গুলো মীমাংসা হয়ে যেতেই আমরা লেগে গেলাম যার যার কাজে। নিচের বড় কেবিনটা ফাঁকা করা হলো প্রথমে। রুটিফলের

ারাগুলো সব ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হলো সাগরে। এই কেবিনেরই এক অংশে সামান্য কিছু অদলবদল করে ক্রিশ্চিয়ানের থাকার জায়গা করা হলো। অস্ত্রের সিন্দুকটা নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে। ক্রিশ্চিয়ান ওটাকে চৌকি হিসেবে ব্যবহার করতে লাগল। সিন্দুকটার চাবি ও নিজের কাছে রাখল। বিদ্রোহীদের একজনকে রাতদিন পাহারা দেয়ার জন্যে বসিয়ে দেয়া হলো কেবিনটার দরজায়।

বিকেল পর্যন্ত আগের গতিপথেই চলল বাউন্টি। অর্থাৎ পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে। তারপর দিক বদলানোর নির্দেশ দিল ক্রিশ্চিয়ান। সোজা পুব দিকে চললাম আমরা।

কয়েক ঘণ্টার ভেতর সম্পূর্ণ অজানা–যেখানে আগে কখনও কোন ইংলিশ জাহাজ আসেনি এমন সাগরে এসে পড়ল বাউন্টি। ক্রিশ্চিয়ানের মনোভাব আমি যদ্দূর অনুমান করতে পারছি; নির্জন বা এখন পর্যন্ত সভ্য দুনিয়ার কাছে অনাবিষ্কৃত কোন দ্বীপে পৌঁছুতে চাইছে ও।

দিন কাটছে নিরুত্তাপ নিরুদ্বেগে। বাউন্টিতে ওঠার পর এমন নিরুদ্বেগ দিন আমি বা আর কোন নাবিক কাটিয়েছে বলে মনে পড়ে না। ব্লাইয়ের অনুপস্থিতি আমাদের–যারা বিদ্রোহ করেছে, যারা করেনি, সবার জীবনে পরম এক স্বস্তি এনে দিয়েছে যেন। আগের মত সারাক্ষণ মানসিক চাপের ভেতর থাকা নেই; ক্যাপ্টেন ডেকে এলেই কি ঘটবে, কি ঘটবে–এই দুশ্চিন্তা নেই, নাবিকদের ভেতর নেই কোন অসন্তোষ, চাপা বিক্ষোভ। ক্রিশ্চিয়ানও ব্লাইয়ের মতই কড়াকড়ি ভাবে শৃঙ্খলা রক্ষা করে, কিন্তু সেজন্যে তার কথায় কথায় নাবিকদের চাবকানোর প্রয়োজন পড়ে না। ক্রিশ্চিয়ান জন্ম নেতা। চাবুক না মেরেও কি করে মানুষকে বশে রাখতে হয়, সুশৃঙ্খল রাখতে হয় সে জানে। একমাত্র ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা যদি সারাক্ষণ আমাদের মনকে কুরে কুরে না খেত তাহলে বলতে পারতাম ভালই আছি ক্রিশ্চিয়ানের অধীনে।

বেশ কয়েকটা দিন চলে গেল এভাবে। তারপর এক ভোরে মাস্তুলের ওপর থেকে চিৎকার ভেসে এল পাঞ্জেরীর:

'ডাঙা দেখা যায়!'

বিকেল নাগাদ দ্বীপটার কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম আমরা। বাইরে থেকে যতটুকু বুঝলাম, মাইল আটেক লম্বা দ্বীপ। ভেতরের অংশ তাহিতির মতই পাহাড়ী, যদিও পাহাড়গুলো তাহিতির মত অত উঁচু নয়। উপকূলের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে বেশ কতকগুলো ক্যানো। বাউন্টিকে দেখে এগিয়ে এল কয়েকটা। প্রত্যেকটায় দশ বারো জন করে মানুষ। গায়ের রঙ, দেহের গঠন, চেহারা ইত্যাদি তাহিতীয়দের মতই। সবার চোখে অদ্ভুত এক বিস্ময়ের ভাব। বুঝতে অসুবিধা হলো না, এর আগে কখনও ইউরোপীয় জাহাজ দেখেনি ওরা।

ক্রিশ্চিয়ানের নির্দেশে ওদের সাথে তাহিতীয় ভাষায় আলাপ করলাম আমি। আমার কথা সহজেই বুঝতে পারল লোকগুলো। ওদের দেশের নাম জিজ্ঞেস করতে জানাল 'রারোটোঙ্গা'। একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই রারোটোঙ্গার মানুষগুলোর ভেতর দেখলাম, ওরা কেউ আমাদের জাহাজে উঠতে চাইল না।

নানাভাবে আমরা ওদের ডাকলাম, উপহার দিলাম। কিন্তু লাভ হলো না। উপহারগুলো নিল, নিয়ে খুশিও হলো, কিন্তু জাহাজে উঠল না একজনও। শেষমেষ ক্রিশ্চিয়ান পাল তুলে দেয়ার নির্দেশ দিল। হতাশ হলো নাবিকরা। রারোটোঙ্গা তাহিতির চেয়ে মোটেই কম সুন্দর নয়। লোকগুলোকেও বন্ধুভাবাপন্নই মনে হলো। তাছাড়া তাহিতি থেকে কম পক্ষে সাতশো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে দ্বীপটা, আমরা ছাড়া এখন পর্যন্ত আর কোন ইউরোপীয় এটার খোঁজ পেয়েছে বলে মনে হয় না। তবু ক্রিশ্চিয়ান কেন যে দ্বীপটাকে লুকিয়ে থাকার জন্যে পছন্দ করল না আমি বুঝতে পারলাম না।

কয়েক দিন পর এক সন্ধ্যায় ভীষণ অবাক করে দিয়ে ক্রিশ্চিয়ান ওর সঙ্গে খেতে ডাকল আমাকে।

আমি যখন কেবিনে ঢুকলাম ও তখন গভীর মনোযোগ দিয়ে ক্যাপ্টেন কুকের তৈরি করা একটা মানচিত্র দেখছে। সাড়া পেয়ে মুখ তুলে তাকাল। রক্ষীকে বিদায় করে দরজা বন্ধ করল। বিদ্রোহের আগে আমাদের সম্পর্ক যেমন সহজ ছিল তেমনি সহজ ভঙ্গিতে হাসল একটু।

'আমার সাথে খেতে ডেকেছি তোমাকে, বিয়্যাম,' বলল ক্রিশ্চিয়ান। 'অবশ্য ইচ্ছে না হলে আমার আমন্ত্রণ তুমি না-ও গ্রহণ করতে পারো।'

সত্যি কথা বলতে কি বিদ্রোহের আগে ক্রিশ্চিয়ান সম্পর্কে আমার যে ধারণা ছিল এখন তা নেই। আমাদের এতগুলো জীবন নষ্ট করে দেয়ার মূলে রয়েছে ও, কথাটা আমি ভুলতে পারি না কিছুতেই। মনে তাই একটা বিতৃষ্ণার ভাব আমার আছে ওর সম্পর্কে। তবে এখন তা প্রকাশ করলাম না। শুধু বললাম, 'না, না, গ্রহণ না করার কি আছে!'

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম আমরা। তারপর একসময় ক্রিশ্চিয়ান বলল, 'ব্লাই সম্পর্কে যখন ভাবি, কোন রকম অনুশোচনা হয় না আমার। বিন্দুমাত্র না। কিন্তু যখনই ওর সঙ্গে যারা গেছে তাদের কথা মনে হয়...'

কথাটা শেষ না করে চোখ বুজে দু'হাতে কপাল চেপে ধরল ও। মৃদু মৃদু নড়তে লাগল মাথাটা। খানিকক্ষণ পর আবার বলল, 'আমার মত হঠাৎ উত্তেজনা বা আবেগের বশে কোন কাজ কখনও করে বোসো না, বিয়্যাম। জীবনে শান্তি বলে আর কিছু থাকবে না তাহলে।'

'সুপরিকল্পিত একটা বিদ্রোহকে আপনি আবেগের বশে করা কাজ বলছেন!' রূঢ় শোনালেও ক্রিশ্চিয়ানের মুখের ওপর আমি কথাটা না বলে পারলাম না।

'কি বলছ তুমি!' সবিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল সে। 'ভেবেছ আগে থাকতে আটঘাট বেঁধে আমরা বিদ্রোহ করেছি?'

'তাছাড়া আর কি?' আমি জবাব দিলাম। 'ঘটনাটা যখন ঘটে তখন আপনার চৌকির ওপর জাহাজের ভার। চার্চিলের ধাক্কাধাক্কিতে ঘুম ভেঙে উঠে দেখলাম পুরো জাহাজ আপনার দখলে; হ্যাচের মুখে, ডেকের কোনায় কোনায় দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র লোক। এর পরও কি করে ভাবব বিদ্রোহটা পূর্ব পরিকল্পিত ছিল না?'

'কিন্তু সত্যিই ওটা পূর্বপরিকল্পিত ছিল না,' বলল ক্রিশ্চিয়ান। 'ঘটনা ঘটার মাত্র পাঁচ মিনিট আগেও আমি ভাবিনি বিদ্রোহ করব। তাহলে বলি তোমাকে···সে রাতে তোমার সাথে আমার কি কি কথা হয়েছিল, মনে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি বলেছিলাম, আমার যদি কিছু হয়, আমার বাড়িতে গিয়ে দেখা কোরো আমার আত্মীয় স্বজনদের সাথে। কেন বলেছিলাম ওকথা জানো? আমি পালাতে চেয়েছিলাম বাউন্টি থেকে।'

'আচ্ছা!'

'হ্যাঁ, নর্টন ছাড়া আর কেউ জানত না এ কথা। ও আমার জন্যে একটা ছোট্ট ভেলা তৈরি করেছিল। ভেবেছিলাম ওই ভেলা নিয়ে আমি তোফোয়ায় পৌঁছে যেতে পারব।'

'সত্যি!'

'হ্যাঁ, বিয়্যাম সত্যি। আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না ব্লাইকে। জন নর্টন নিজের ইচ্ছায় ব্লাইয়ের সঙ্গে গেছে। ও আমাকে পালাতে সাহায্য করতে চেয়েছিল, কিন্তু আমার সঙ্গে যোগ দিয়ে বিদ্রোহ করতে চায়নি। ও থাকলে ওর কাছেই শুনতে পেতে আমি সত্যি বলছি কি না।'

'তারপর?'

'ভাগ্য আমার সহায় ছিল না, আর কি! সে রাতে কেমন গরম ছিল তোমার মনে আছে? তোমার মত জাহাজের বেশির ভাগ লোকই ছিল ডেকে। ফলে ভেলাটাকে জলে ভাসানোর কোন সুযোগই আমি পাইনি।

'ভোর চারটেয় যখন পেকওভারের কাছ থেকে ডেকের দায়িত্ব নিলাম তখনও কিন্তু বিদ্রোহের কথা আমার মনে আসেনি। বিশ্বাস করো, আমি সত্যি কথা বলছি! কিছুক্ষণ পায়চারি করলাম একা একা। আমার মনে তখন হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে ব্লাইয়ের অপমানকর কথাগুলো। সে-সময় একবার ওকে খুন করার কথাও ভেবেছিলাম। সত্যি সত্যি খুন! তাহলে বুঝে দেখ, আমার মনের অবস্থা তখন কোথায় পৌঁছে ছিল!

'মনটাকে শান্ত করার জন্যে জাহাজের সামনে গেলাম। ওখানে তখন পাহারায় থাকার কথা হেওয়ার্ডের। দেখি আরও তিনজন নাবিকের সঙ্গে ও ঘুমিয়ে আছে। কাজে গাফিলতির জন্যে ওর ওপর আমার রেগে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আশ্চর্য, একটুও রাগ হলো না আমার। বরং একটু স্বস্তির ভাব হলো মনে। এবং তখনই কে যেন আমার কানে কানে বলে গেল কথাগুলো, "ব্লাইও এখন ঘুমিয়ে, দখল করে নাও না জাহাজটা!"

'মুহূর্তে সচেতন হয়ে উঠলাম আমি। কথাটা নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলাম মনে মনে। দ্রুত একবার চক্কর দিলাম সারা জাহাজে। বেশির ভাগ লোকই ঘুমিয়ে আছে। একমাত্র বারকিটকে দেখলাম জেগে থাকতে। বহুবার ব্লাইয়ের কাছে শাস্তি খেয়েছে ও। তাই মনে হলো ওকে হয়তো বিশ্বাস করা যায়। বারকিটের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বললাম, "চার্চিল, মার্টিন, থম্পসন আর কুইনটালকে জাগাতে পারবে অন্য কাউকে বিরক্ত না করে?"

' "হ্যাঁ, স্যার," জবাব দিল বারকিট। "কিন্তু কেন।"

'আমি বললাম, "কারণ আছে, ওদের নিয়ে সামনের মইয়ের কাছে এসো, বলব।"

'বারকিটকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি গিয়ে দাঁড়ালাম কোলম্যানের হ্যামকের কাছে। নিঃশব্দে ওকে জাগিয়ে অস্ত্রের সিন্দুকের চাবিটা চাইলাম। কারণ দেখালাম, জাহাজের আশপাশে একটা হাঙর ঘোরাঘুরি করছে, ওটা মারার জন্যে একটা মাস্কেট বের করব। কোলম্যান চাবিটা আমার হাতে দিয়ে পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

'অস্ত্রের সিন্দুকের কাছে গিয়ে দেখি, হ্যালেট শুয়ে আছে তার ওপর। ওরও তখন কাজের সময়, ঘুমানোর কথা নয়। তাই ধমকে ওকে ডেকে পাঠিয়ে দেয়া কঠিন কিছু হলো না। বেচারা ধরা পড়ে এমন ভয় পেয়েছিল যে প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে গেল ডেকে। সামনের মইয়ের কাছে চলে গেলাম আমি। বারকিট এবং অন্যরা তখন পৌঁছে গেছে ওখানে। ওদের খুলে বললাম আমার পরিকল্পনার কথা—হ্যাঁ এর ভেতরে একটা পরিকল্পনা আমি খাড়া করে ফেলেছি মনে মনে। ওরা এক কথায় রাজি হয়ে গেল। শুধু রাজি নয়, উৎসাহে রীতিমত টগবগ করতে লাগল। অস্ত্রের সিন্দুক খুলে আমরা সবাই মাস্কেট, পিস্তল—যার যেমন পছন্দ—হাতে তুলে নিলাম। এবার ম্যাককয়, উইলিয়ামস, আলেকজান্ডার স্মিথ এবং অন্যদের জাগানো হলো। ওদেরও অস্ত্র দিলাম। কে কোথায় কি দায়িত্ব পালন করবে বুঝিয়ে দিয়ে আমি ঢুকলাম ব্লাইয়ের কেবিনে। বাকিটা তো তুমি জানো।'

চুপ করল ক্রিশ্চিয়ান। আমিও চুপ।

'আপনার কি মনে হয় ব্লাই ইংল্যান্ডে পৌঁছাতে পারবেন?' কিছুক্ষণ পর আমি প্রশ্ন করলাম।

'সম্ভাবনা কম। খুব কম। টিমোর ছাড়া সাহায্য পাওয়ার মত কোন জায়গা আশেপাশে নেই। যেখানে ওদের ছেড়েছি সেখান থেকে টিমোরের দূরত্ব কমপক্ষে বারোশো লিগ। সুতরাং বুঝতে পারছ···। আমি অবশ্য সাগরে ভাসিয়ে দিতে চাইনি। ভেবেছিলাম, বন্দী করে ওকে নিয়ে যাব ইংল্যান্ডে। কিন্তু অন্যরা রাজি হলো না—তুমি নিজেই তো দেখেছ।'

'আমরা যারা বিদ্রোহ করিনি অথচ কপাল দোষে বলুন আর যে কারণেই বলুন জড়িয়ে গেছি আপনাদের সাথে তাদের নিয়ে কি করবেন, ভেবেছেন কিছু?'

'এ প্রশ্ন যে তুমি করবে আমি জানতাম,' বলে উঠে দাঁড়াল ক্রিশ্চিয়ান। পেছন দিকের একটা জানালার পর্দা তুলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সাগরের দিকে। তারপর আবার ঘুরল আমার দিকে।

'তোমাদের যদি তাহিতিতে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেই, আমি জানি, তোমরা কেউই বিদ্রোহের কথা গোপন রাখবে না। তাই দুঃখের সাথে হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমাদের সাথে থাকতে হবে তোমাদের। আপাতত এর বেশি কিছু বলতে পারছি না।'

*

আটাশ মে–বিদ্রোহের ঠিক চার সপ্তাহ পর সকাল বেলা জাহাজ থেকে প্রায় ছ'লিগ দূরে একটা দ্বীপ দেখতে পেলাম আমরা। সারাদিন জাহাজ চালিয়ে দ্বীপটার পশ্চিম উপকূলের মাইল তিনেকের ভেতর পৌছানো গেল। ওখানেই নোঙর ফেলে রাতটা অপেক্ষা করে ভোরে আবার পাল তুলে পৌছুলাম তীরের কাছে। আমাদের স্টুয়ার্টের স্মরণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ। কোন মানচিত্রে কোন দ্বীপের অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ একবার দেখলে ভোলে না কখনও। ও ওর স্মৃতি হাতড়ে জানাল দ্বীপটার নাম টুপুয়াই। ক্যাপ্টেন কুক আবিষ্কার করেছিলেন এ দ্বীপ।

একটানা দুমাস সাগরে কাটিয়ে আমরা সবাই–কি বিদ্রোহী কি অবিদ্রোহী–তখন ডাঙায় নামার জন্যে উদগ্রীব। কিন্তু দুর্ভাগ্য, টুপুয়াইবাসীরা সে সুযোগ আমাদের দিল না। বাউন্টি তীরের কাছাকাছি হতেই ক্যানোয় চেপে এসে ওরা হামলা চালাল আমাদের ওপর। কমপক্ষে একশো হবে ক্যানোর সংখ্যা। প্রতিটায় আট থেকে দশজন করে ইন্ডিয়ান। তাদের হাতে বর্শা, লাঠি। কারও কারও হাতে দু'রকমই আছে। ক্যানোগুলো বোঝাই ছোট ছোট নুড়ি পাথরে। বুঝলাম ভোরে দূর থেকে আমাদের জাহাজ দেখেই ওরা প্রস্তুত হয়েছে যুদ্ধের জন্যে।

বাউন্টি নুড়ি পাথর বা বর্শার পাল্লায় না পৌছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করল ওরা। তারপর আচমকা অনেকটা হা-রে-রে-রে ধরনের শব্দ করে ছুঁড়তে শুরু করল পাথর আর বর্শা। কিছুক্ষণের ভেতর আমাদের জনা চারেক নাবিক আহত হলো। আঘাত খুব সামান্য যদিও তবু আঘাত তো। তীরের কাছ থেকে জাহাজ সরিয়ে নিলাম আমরা। কয়েকজন বিদ্রোহী কামান দাগার প্রস্তাব দিল। তা যদি করা হত সন্দেহ নেই বহু জংলী হতাহত হত, যারা বেঁচে থাকত তারা এমন আতঙ্কিত হয়ে পড়ত যে সহজেই তাদের বশ মানিয়ে আমরা এ দ্বীপে থেকে যেতে পারতাম। কিন্তু দুটোর একটাও ক্রিশ্চিয়ানের ইচ্ছা নয়।

কোয়ার্টার ডেকে নিজের দলের লোকদের নিয়ে আলোচনায় বসল ও। আমরা যারা অবিদ্রোহী তাদের পাঠিয়ে দেয়া হলো সামনে, যেন ওদের আলাপ শুনতে না পাই। মিনিট পনেরো পরেই দেখলাম হাসতে হাসতে যে যার কাজে লেগে গেল বিদ্রোহীরা। উত্তর দিকে চলতে শুরু করল বাউন্টি।

কেউ আমাদের কিছু বলেনি তবু উত্তর দিকে এগোনো দেখে বুঝতে পারলাম বাউন্টির গন্তব্য একটাই হতে পারে–তাহিতি।

সেদিনই বিকেলে মরিসন, স্টুয়ার্ট আর আমি বার্থে বসে ফিসফিস করে যুক্তি করলাম, সত্যি যদি তাহিতিতেই আমাদের নিয়ে যায় ক্রিশ্চিয়ান, যে করে হোক পালাব আমরা। আজ হোক কাল হোক সভ্য দুনিয়ার কোন জাহাজ ওখানে আসবে। তখন আশা করা যায় দেশে ফেরা কঠিন হবে না আমাদের জন্যে।

দশ

পরদিন ক্রিশ্চিয়ান আবার আমাকে ডেকে পাঠাল ওর কেবিনে। গিয়ে দেখলাম চার্চিলও আছে। আমি ঢুকতেই রক্ষীকে বিদায় করে দরজা বন্ধ করে দিল সে।

'তোমাকে একটা কথা বলার জন্যে ডেকেছি, বিয়্যাম,' ক্রিশ্চিয়ান শুরু করল। 'আমরা এখন তাহিতির দিকে এগোচ্ছি। ওখানে সপ্তাহ খানেক থেকে খাবার, পানি ইত্যাদি সংগ্রহ করব।'

আমার মুখ দেখেই মনের খবর আঁচ করতে পারল যেন ক্রিশ্চিয়ান। মাথা নেড়ে বলল, 'না, তোমাদের ছেড়ে দেব না তাহিতিতে। প্রথমে অবশ্য তা-ই ভেবেছিলাম। কিন্তু আমার সাথীরা কেউ রাজি হলো না।'

'হ্যাঁ, মিস্টার বিয়্যাম,' বলল চার্চিল। 'কাল অনেক রাত পর্যন্ত আমরা আলাপ করেছি তোমাদের নিয়ে। একটা ব্যাপারে সবাই এক মত, তোমাদের ভাল ছাড়া খারাপ আমরা কেউ চাই না। তবু ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়।'

'কারণটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?' জিজ্ঞেস করল ক্রিশ্চিয়ান। 'ছেড়ে যাওয়া তো পরের কথা, তাহিতিতে নামতেই দেয়া হবে না তোমাদের। ওরা বলছিল নিচে আটকে রাখতে। কিন্তু আমি তা চাই না। তাই ওদের বলেছি, বিদ্রোহ সম্পর্কে তাহিতীয়দের কাছে মুখ খুলবে না এরকম প্রতিশ্রুতি যদি দাও, তোমাদের ডেকে থাকতে দিতে আপত্তি করা উচিত হবে না। ওরা রাজি হয়েছে আমার কথায়।'

'বুঝতে পেরেছি, স্যার,' আমি বললাম, 'যদিও আমি মনে করি আমাদের তাহিতিতে নামিয়ে দিয়ে গেলেই আপনারা...'

'অসম্ভব!' ক্রিশ্চিয়ান বলল। 'যদিও ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাদের ধরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আমি একদম মানতে পারছি না, তবু এছাড়া কোন উপায় নেই। তোমাদের ছেড়ে দিলেই ইন্ডিয়ানদের জানাবে বিদ্রোহের কথা। তখন ওরা আমাদের খাবার, পানি দেবে? দেবে না।'

'দেবে তো না-ই, হয়তো হামলা করে বসবে,' বলল চার্চিল।

'তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে,' আমি বললাম, 'সারা জীবন আমরা আপনাদের সাথেই থাকব?'

'আঁ–হ্যাঁ। সভ্য দুনিয়ার কাছে এখনও অজানা এমন কোন দ্বীপে নেমে আমরা ধ্বংস করে দেব বাউন্টিকে। বাকি জীবন ওই দ্বীপেই কাটাতে হবে আমাদের। তোমাদেরও।'

'হ্যাঁ,' চার্চিল বলল, 'এছাড়া কোন পথ খোলা নেই আমাদের সামনে।'

উঠে দাঁড়াল ক্রিশ্চিয়ান। অর্থাৎ, 'এবার তুমি বিদায় হতে পারো।'

সুতরাং আমি বিদায় নিলাম।

ডেকের ওপর এসে বিষণ্ন মুখে তাকিয়ে রইলাম খোলা সাগরের দিকে।

মনের ভেতর ঘুর পাক খাচ্ছে ক্রিশ্চিয়ানের কথাগুলো।–প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, বিদ্রোহের কথা ফাঁস করব না ইন্ডিয়ানদের কাছে। তার মানে পালানোর আশা নেই বললেই চলে। বিদ্রোহীরা নিশ্চয়ই চোখ রাখবে আমাদের ওপর। এর পর যদি পালাব না এই প্রতিশ্রুতি চেয়ে বসে?

বার্থে ফিরে স্টুয়ার্টকে একা পেয়ে বললাম ক্রিশ্চিয়ান যা যা বলেছে। শুনেই গম্ভীর হয়ে গেল স্টুয়ার্ট। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'অন্তত পেগির সঙ্গে একবার দেখা করতে পারব তো।'

'তা বোধ হয় পারবে, যদি প্রতিশ্রুতি দাও।'

'দেব। পেগিকে এক পলক দেখার জন্যে হলেও দেব।' হঠাৎ করেই উঠে পায়চারি শুরু করল স্টুয়ার্ট। আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ। বলল, 'পেগি হয়তো পালানোর ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে আমাদের।'

লাফ দিয়ে উঠলাম আমি। 'হ্যাঁ পারবে, স্টুয়ার্ট! পারলে ও-ই পারবে। ওর সঙ্গে দেখা হলে এক ফাঁকে জানাবে, চার্চিল যেমন অন্যদের নিয়ে পালিয়েছিল আমরাও তেমনি পালাতে চাই, ও যেন গভীর রাতে একটা বড় ক্যানো নিয়ে চলে আসে জাহাজের কাছে। ক্যানোয় চেপে অন্য কোন দ্বীপে চলে যাব আমরা।'

'হ্যাঁ, পেগিই আমাদের একমাত্র ভরসা,' বলল স্টুয়ার্ট। 'মাত্র দশটা মিনিট ওর সাথে একা থাকতে পারলে আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলতে পারব। বলব, ক্যানো চালানোর সময় বেশি শব্দ যেন না হয়। অবশ্য হলেও তেমন অসুবিধা নেই। ইন্ডিয়ানরা মাছ ধরার সময় দিন রাতের বাছ বিচার তো করে না। সুতরাং কে সন্দেহ করবে? ডেকে যে পাহারায় থাকবে তাকে বোকা বানানো শক্ত হবে না। নিঃশব্দে আমরা নেমে যাব পানিতে। ডুব সাঁতার দিয়ে ক্যানোর কাছে পৌঁছুতে পারব সহজেই। তারপর ওটার আড়ালে আড়ালে জাহাজের দৃষ্টিসীমার বাইরে গিয়ে উঠব ক্যানোয়।'

'হ্যাঁ, স্টুয়ার্ট, আমার বিশ্বাস, পারব আমরা!'

'পারতেই হবে।'

জুনের পাঁচ তারিখ বিকেলে আমরা তাহিতির দেখা পেলাম। পরদিন বিকেলে পয়েন্ট ভেনাসের কাছে নোঙ্গর ফেলল বাউন্টি। ইন্ডিয়ানরা ক্যানোয় চেপে এসে ঘিরে ধরল আমাদের। এত তাড়াতাড়ি আবার আমরা এসেছি দেখে অবাক সবাই। টেইনা, হিটিহিটি, এবং আরও কয়েকজন গোত্রপতি উঠে এল জাহাজে। তাদের মুখে প্রশ্ন, এত তাড়াতাড়ি আমরা ফিরে এলাম কেন। ক্রিশ্চিয়ানের হয়ে জবাব দিলাম আমি। যা বললাম তার মর্মার্থ হলো; আইটুটাকিতে ব্লাইয়ের বাবা মানে ক্যাপ্টেন কুকের সাথে দেখা হয়ে যায় আমাদের। ওই দ্বীপে একটা ইংরেজ উপনিবেশ গড়ে তুলছেন কুক। সেজন্যে ব্লাই, নেলসন এবং আরও কয়েকজনকে নিজের জাহাজে তুলে নিয়েছেন। রুটিফলের চারাগুলোও তিনি রেখে দিয়েছেন, এবং আমাদের পাঠিয়েছেন তাহিতি থেকে আরও খাবার দাবার এবং জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্যে। এবার.

আমরা বেশির ভাগই জ্যান্ত জীব জানোয়ার নিতে চাই, জানাতে ভুললাম না।

এই ব্যাখ্যা শুনে পুরোপুরিই সন্তুষ্ট হলো ইন্ডিয়ানরা। শুরু হলো বিনিময় এবং ব্যবসা।

সেদিন সন্ধ্যায় ক্রিশ্চিয়ান, আর আমার তাইও হিটিহিটির সাথে খেতে বসেছি আমি। ক্রিশ্চিয়ানের মনের মানুষ মাইমিতিও আছে। ও খাচ্ছে না–ইন্ডিয়ান নারীরা পুরুষের সঙ্গে খায় না কখনও। গল্প করতে করতে খাওয়া চলল।

'ডাঙায় আমার বাড়িতে থাকো, বিয়্যাম,' এক সময় হিটিহিটি বলল।

জবাব দেয়ার সময় ক্রিশ্চিয়ানের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ছোঁয়া অনুভব করলাম আমি।

'না, হিটিহিটি,' জবাব দিলাম, 'এবার বোধহয় তা সম্ভব হবে না। মাত্র কয়েকদিন থাকব এখানে। তাছাড়া আমাদের লোক অনেক কমে গেছে। আমি তোমার বাড়িতে গেলে জাহাজের কাজে অসুবিধা হবে।'

অবাক হয়ে ক্রিশ্চিয়ানের দিকে তাকাল হিটিহিটি।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে ক্রিশ্চিয়ান বলল, 'জাহাজে ওকে দরকার হবে আমার।'

ব্রিটিশ জাহাজের শৃঙ্খলা সম্পর্কে জানে হিটিহিটি, তাই এ নিয়ে আর কথা বাড়াল না।

বিকেলেই পেগি জাহাজে এসে উঠেছে। খাওয়ার পর ডেকে গিয়ে দেখি ও আর স্টুয়ার্ট পাশাপাশি বসে আছে প্রধান মাস্তুলের গোড়ায়। ইন্ডিয়ান ভাষায় কথা বলছে দু'জন। পেগি চলে যাওয়ার পর স্টুয়ার্ট, মরিসন আর আমি পূর্বপরিকল্পনা মত মিলিত হলাম প্রধান হ্যাচের কাছে।

'পেগিকে সব বুঝিয়ে বলেছি,' স্টুয়ার্ট বলল। 'ও ভেবেছে ওর জন্যেই আমি পালাতে চাইছি জাহাজ ছেড়ে–একেবারে মিথ্যে নয় কথাটা। আর তোমাদের ব্যাপারটা ভেবেছে, ইন্ডিয়ান জীবন খুব পছন্দ হয়ে গেছে তাই তোমরা পালাতে চাইছ।'

'যা-ই ভাবুক, ও সাহায্য করবে কিনা তাই বলো,' আমি বললাম।

'হ্যাঁ। কিন্তু সমস্যা হয়েছে, ওদের পরিবারের একমাত্র বড় ক্যানোটা এখন টেতিয়ারোয়ায়। কাল যদি বাতাস অনুকূল থাকে একটা ছোট ক্যানো ও পাঠাবে ওটা নিয়ে আসার জন্যে।'

'আচ্ছা, ছোট ক্যানোয় করে পালাতে পারি না আমরা?' জিজ্ঞেস করল মরিসন।

'উঁহু, ছোট ক্যানোয় বেশি দূর যাওয়া যাবে না।'

'তার মানে অনুকূল বাতাসের জন্যে প্রার্থনা করা ছাড়া আপাতত আর কিছু করার নেই আমাদের?' বলল মরিসন।

'হ্যাঁ।'

রাতে খুশি মনে ঘুমাতে গেলাম। প্রায় নিশ্চিত, আমরা পালাতে পারব। তারপর এক বা দু'বছর বড় জোর ইন্ডিয়ানদের ভেতর কাটাতে হবে। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন জাহাজ এসে যাবে ইংল্যান্ড থেকে।

পরদিন সকালে দু'জন শক্ত পোক্ত মানুষ পেগির ছোট ক্যানোটা নিয়ে চলে গেল উত্তরে টেতিয়ারোয়ার দিকে। রাতের ভেতরেই আশা করা যায় বড় ক্যানোটাকে নিয়ে ফিরে আসবে ওরা। সারা দুপুর উদ্বেগের সঙ্গে আবহাওয়ার ভাব চাল খেয়াল করলাম আমরা। তারপর যা ভেবেছিলাম ঠিক তা-ই ঘটল; বিকেল থেকে মেঘ জমতে শুরু করল আকাশে। সন্ধ্যা নাগাদ শুরু হয়ে গেল তুমুল ঝড়। এই ঝড়ে কোন ক্যানোর তীরে আসার কথা কল্পনাও করা যায় না।

ন'দিন পর থামল ঝড়। আকাশ আবার আগের মত ঝকঝকে নীল। দুপুরের সামান্য আগে পেগির বড় ক্যানোটা ফিরে এল টেতিয়ারোয়া থেকে। ন'দিন ধরে মনের ওপর চেপে বসে থাকা উদ্বেগ দূর হয়ে গেল মুহূর্তে। পেগি এল জাহাজে। ঠিক হলো সে-রাতেই পালাব আমরা।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে আরও একবার ভাগ্য আমাদের সাথে প্রবঞ্চনা করল। বিকেল তিনটের সময় কারও সাথে কোন পরামর্শ না করে আচমকা নোঙর তোলার নির্দেশ দিল ক্রিশ্চিয়ান। তাহিতি পেছনে ফেলে এগিয়ে চলল বাউন্টি।

প্রথমবারের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও টুপুয়াইএ-ই বসতি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্রিশ্চিয়ান। এবার আমাদের সাথে রয়েছে নানা প্রজাতির অনেকগুলো করে জীব জন্তু–দ্বীপে ওগুলোকে ছেড়ে দেয়া হবে, যাতে ইচ্ছেমত বংশবৃদ্ধি করে আমাদের ভবিষ্যৎ খাবারের চাহিদা মেটাতে পারে। আরও আছে তিনজন ইন্ডিয়ান রমণী–ক্রিশ্চিয়ানের মাইমিতি, ইয়ং-এর টাউরুয়া, আর আলেকজান্ডার স্মিথের পারাহা ইটি। মাইমিতি আর টাউরুয়া এসেছে স্বেচ্ছায়, পারাহা ইটিকে অনেক বলে কয়ে আসতে রাজি করিয়েছে স্মিথ।

তাহিতি দৃষ্টিসীমার আড়ালে হারিয়ে যাওয়ার বেশ কয়েক ঘন্টা পর আবিষ্কার করলাম, শুধু ওই তিনজন নয় আরও ইন্ডিয়ান আছে জাহাজে। নারী পুরুষ দুরকমই। ন'জন পুরুষ, বারোজন নারী আর আটটা ছেলে। কখন যে ওরা জাহাজে উঠে খোলের ভেতর লুকিয়েছে আমরা টেরও পাইনি।

অবশেষে টুপুয়াই-এ পৌঁছুলাম আমরা। এবার আর আগের মত মারমুখী হয়ে উঠল না স্থানীয় অধিবাসীরা। আমাদের সাথের তাহিতীয় লোকগুলোই তার কারণ। আমাদের ওপর প্রথম দর্শনে যে অবিশ্বাস জন্মেছিল, ওদের দেখে তা বোধহয় দূর হয়েছে টুপুয়াইবাসীদের। আমাদের সঙ্গী তাহিতীয়রা ওদের বোঝাল, আমরা ওদের দেশে বসতি করতে চাই, ওদের সাথে শত্রুতা আমাদের কাম্য নয়, আমরা থাকলে ওদের অনেক সুবিধা হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। ওরা মেনে নিল।

প্রচণ্ড পরিশ্রম করে জাহাজটাকে ডাঙায় টেনে তুললাম আমরা। সূর্য থেকে ডেকগুলোকে রক্ষা করার জন্যে ওপরে লতা পাতার চালা তুলে দিলাম। এরপর স্থানীয় এক গোত্রপতির কাছ থেকে সাগর তীরে এক টুকরো জমি কিনে একটা দুর্গ তৈরি করা হলো। দুর্গ মানে পাতায় ছাওয়া কুটির কয়েকটা, আর পুরো এলাকা ঘিরে চারপাশে শক্ত কাঠের বেড়া আর পরিখা। বিশ ফুট গভীর, চল্লিশ ফুট চওড়া পরিখাটা খোঁড়ার কাজে হাত লাগাতে হলো সবাইকে। বেশির ভাগ

লোকই এই ভয়ানক পরিশ্রমসাধ্য কাজের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল। জবাবে ক্রিশ্চিয়ান শুধু বলল, 'আমার নেতৃত্ব সম্পর্কে তোমরা প্রশ্ন তুলছ?' ব্যস চুপ হয়ে গেল সবাই।

পরিখার কাজ শেষ হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই প্রমাণ পাওয়া গেল ক্রিশ্চিয়ানের দূরদৃষ্টির।

দ্বীপে নেমেই আমাদের আনা জন্তু জানোয়ার সব ছেড়ে দিয়েছিলাম পাহাড়ে, বনে। ইতোমধ্যে সেগুলোর কোন কোনটা বাচ্চা দিয়েছে। এখন আর শুধু বনের খাবারে কুলায় না তাদের। বন ছেড়ে এসে হামলা চালায় দ্বীপবাসীদের টারো খেতে। ওদের ধরতে বা মারতে ব্যর্থ হয়ে দ্বীপবাসীরা ক্রিশ্চিয়ানের কাছে প্রতিকার চাইল। প্রথমবার ক্রিশ্চিয়ান বুঝিয়ে দিল, 'একটু সহ্য করো, ক'দিন পরেই আর তোমাদের খাবারের অভাব থাকবে না।'

কয়েক দিন পর আবার এল জংলীরা। এবার ওরা মারমুখী। বলল, 'মারো ওগুলোকে, না হলে তোমাদেরই এদেশ ছাড়া করে ছাড়ব।'

এবার আমরা বুঝতে পারলাম কেন এত পরিশ্রম করে পরিখা খুঁড়িয়েছিল ক্রিশ্চিয়ান। কয়েক সপ্তাহ আমরা বন্দী হয়ে রইলাম দুর্গের ভেতর। বেরোনোর চেষ্টা করলেই বাধা দেয় হিংস্র টুপুয়াইবাসীরা। একটু একটু করে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে শুরু করেছিল সবাই। অবশেষে একদিন আমাদের ডেকে হাত তুলতে বলল ক্রিশ্চিয়ান। টুপুয়াই ছেড়ে যাওয়ার পক্ষে মত দিল সব ক'জন। ষোলো জন তাহিতিতে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা জানাল, বাকিরা জনশূন্য কোন দ্বীপের সন্ধানে পাড়ি জমাতে চাইল বাউন্টিতে চেপে। যারা বাউন্টিতে থাকবে বলে ঠিক করল তারা হলো: ফ্রেচার ক্রিশ্চিয়ান, জন মিলস, এডওয়ার্ড ইয়ং, উইলিয়াম ব্রাউন, আইজাক মার্টিন, উইলিয়াম ম্যাককয়, জন উইলিয়ামস, ম্যাথ্যু কুইনটাল, আর আলেকজান্ডার স্মিথ।

আমরা টুপুয়াই ছেড়ে চলে যাব জানাতেই ইন্ডিয়ানরা অবরোধ তুলে নিতে রাজি হলো। আবার অমানুষিক পরিশ্রম করে বাউন্টিকে জলে ভাসানো হলো। খাবার, পানি, এবং অন্যান্য জিনিসপত্র বোঝাই দেয়া হলো। ছেড়ে দেয়া জন্তু জানোয়ারের যতগুলোকে সম্ভব ধরে খাঁচায় পোরা হলো, বাকিগুলোকে মেরে মাংস নুন দিয়ে নেয়া হলো। তারপর আবার পাল তুলল বাউন্টি এবং পাঁচদিন পর নোঙ্গর ফেলল মাতাভাই উপসাগরে শেষ বারের মত।

হিটিহিটির বাড়িতে ফিরে এলাম আমি।

সব জিনিসপত্র বিশেষ করে অভিধানের অমূল্য পাণ্ডুলিপিটা (এত কিছুর ভেতরেও আমি সযত্নে সংরক্ষণ করেছি ওটা) সহ যখন পৌঁছুলাম সবাই ঘিরে ধরল আমাকে। বিশ্রামেরও সময় দেবে না, এতদিন কোথায় ছিলাম, কি করেছি তা শোনাতে হবে। বারান্দায় বসে শুরু করলাম আমার কাহিনী। বিদ্রোহের অংশটুকু ছাড়া (ক্রিশ্চিয়ানকে আমরা কথা দিয়েছি, ইন্ডিয়ানদের কাছে বিদ্রোহের কথা কোন দিন প্রকাশ করব না) আর সব বলে গেলাম।

চোখ বড় বড় করে শুনল ওরা। তারপর হিনা প্রশ্ন করল, 'এবার তোমরা

কি করবে? কিছুদিন থাকবে আমাদের এখানে?'

'কাল অথবা পরশু ক্রিশ্চিয়ান আর অন্য আটজন আইটুটাকির পথে রওনা হয়ে যাবে। আমরা বাকিরা–যারা তোমাদের দ্বীপটাকে ভালবেসে ফেলেছি, থেকে যাব এখানে। বাকি জীবন এখানেই কাটিয়ে দেব যদি তোমরা অনুমতি দাও।'

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই হিনা ঝুঁকে জড়িয়ে ধরল আমাকে। নাকে নাক ঠেকিয়ে লম্বা করে কয়েকবার শ্বাস টানল ওদের রীতিতে। তারপর বলল, 'আহ, রিয়্যাম, কি খুশি যে হয়েছি তোমাকে পেয়ে! আমরা সবাই। তুমি চলে যাওয়ায় আমাদের বাড়িটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল একেবারে।'

'হ্যাঁ,' বলল হিনার স্বামী। 'এখন থেকে তুমি আমাদের একজন। তোমাকে আমরা আর কোথাও যেতে দেব না!'

সন্ধ্যার সামান্য আগে ক্রিশ্চিয়ান এল মাইমিতিকে নিয়ে। মাইমিতি সম্ভবত শেষ বারের মত এসেছে আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা করতে। ক্রিশ্চিয়ানের সঙ্গে ও-ও অজানার পথে বেরিয়ে পড়বে, ঠিক করেছে। হিটিহিটির বাড়িতে কিছুক্ষণ বসে আমাকে নিয়ে সৈকতের দিকে এগোল ক্রিশ্চিয়ান। মাইমিতি রইল বাড়িতে।

গোধূলি বেলার ম্লান আলোয় বালুবেলার ওপর দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে চললাম আমি আর ক্রিশ্চিয়ান। দু'জনই নিশ্চুপ।

'এই আমাদের শেষ দেখা,' অনেকক্ষণ পর আচমকা বলে উঠল ক্রিশ্চিয়ান। 'কাল ভোরেই আমরা রওনা হয়ে যাচ্ছি।'

'বিদ্রোহের কাহিনী শুনিয়েছি তোমাকে,' বলে চলল ও। 'মনে রেখো, আমি–হ্যাঁ, একমাত্র আমিই দায়ী ও ব্যাপারে! আর কেউ না! ব্লাই আর তার সঙ্গে যারা গেছে বোধহয় অনেক আগেই তারা মারা পড়েছে, হয় ডুবে নয়তো জংলীদের হাতে। ব্লাইয়ের জন্যে আমার কোন দুঃখ নেই। ওর মত লোক পৃথিবীতে থাকা না থাকা সমান। কিন্তু অন্য যারা বিনা কারণে ওর সঙ্গে প্রাণ দিতে বাধ্য হলো তাদের স্মৃতি আমার বুকের ওপর পাথরের মত চেপে আছে। কোন দোষ করেনি বেচারিরা। তবু…

'কি পরিস্থিতিতে আমি অমন ভয়ানক কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলাম তুমি জানো। আর সবাইও জানে। তবু, আমি জানি, আমাকে কেউ ক্ষমা করতে পারবে না। আমার জন্যে দুঃখ বোধ করবে সবাই, সেই সাথে আমার অপরাধটাও দেখিয়ে দেবে চোখে আঙুল দিয়ে। তাই সবার চোখের আড়ালেই চলে যাব আমি। নিজে বাঁচার চেয়ে যারা আমার সঙ্গে তাদের জীবন জড়িয়ে নিয়েছে তাদের বাঁচানো আমার কাছে বড় এখন। বিশাল এই প্রশান্ত মহাসাগরের কোন না কোন অজানা দ্বীপে আমাদের ঠাঁই হবে। বাউন্টিকে ধ্বংস করে দিয়ে সেখানে আমরা থেকে যাব জীবনের জন্যে। আমাদের আর কখনও দেখবে না তোমরা। তোমাদের এই দুর্বিপাকে ফেলার জন্যে অন্তর থেকে আমি অনুতপ্ত। ক্ষমা আমি চাইব না। যদি জানতাম পাবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা আছে তাহলে চাইতাম।'

আবার নৈঃশব্দ্য গ্রাস করল আমাদের। সৈকতে সাগরের ঢেউ ভেঙে পড়ার মৃদু শব্দ আর নারকেল পাতার মৃদু সর সর আওয়াজ কেবল শোনা যাচ্ছে।

'আজ হোক কাল হোক,' অনেকক্ষণ পর আবার শুরু করল ক্রিশ্চিয়ান, 'কোন ব্রিটিশ জাহাজ এখানে নোঙ্গর ফেলবে। তোমরা যারা বিদ্রোহে জড়িত ছিলে না, সেই জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে বোলো সত্যি কথাটা। আমার মনে হয় না তোমাদের কোন ক্ষতি হবে। কেন হবে? তোমরা তো নিরপরাধ।

'সেই অনুরোধটা আরেকবার তোমাকে করতে চাই, বিয়্যাম–যদি কখনও দেশে ফিরতে পারো কষ্ট করে একটু দেখা কোরো আমার বুড়ো বাবার সাথে। তাকে বুঝিয়ে বোলো, কি পরিস্থিতিতে আমি ওই জঘন্য কাজটা করতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমার বাবার নাম চার্লস ক্রিশ্চিয়ান। কাম্বারল্যান্ডের মেয়ারল্যান্ডক্রের-এ খোঁজ করলেই পাবে তাঁকে।'

এক মুহূর্ত থেমে অনুনয়ের সুরে ও বলল, 'বিয়্যাম, করবে না এটুকু আমার জন্যে?'

'করব,' মাথা ঝাঁকিয়ে আমি বললাম।

হিটিহিটির বাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে ক্রিশ্চিয়ান ডাকল, 'মাইমিতি!'

ডাকটার জন্যে যেন উন্মুখ হয়ে ছিল মেয়েটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একগুচ্ছ নারকেল গাছের আড়াল থেকে সে বেরিয়ে এল। দু'জন হাত ধরাধরি করে গিয়ে উঠে পড়ল সৈকতে ঠেকে থাকা একটা ক্যানোয়। আমিও গেলাম ওদের পেছন পেছন। ক্রিশ্চিয়ান আমার হাত ধরে বলল, 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

দাঁড় টানতে শুরু করল দাঁড়িরা। যতক্ষণ না ক্যানোটা গিয়ে ভিড়ল বাউন্টির গায়ে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম অন্ধকার সৈকতে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরে এলাম বাড়িতে।

পরদিন ভোরে স্নান করার জন্যে সাগর তীরে গিয়ে দেখি রওনা হয়ে গেছে বাউন্টি। সবগুলো পাল মেলে দিয়ে ছুটে চলেছে উত্তর দিকে।

এগারো

আজকাল বেশির ভাগ সময়ই মনটা ভার হয়ে থাকে নানা চিন্তায়। মায়ের কথাই বেশি মনে পড়ে। আমার তাইও হিটিহিটির বাড়িতে খুব যে কষ্টে আছি তা নয়, বরং উল্টোটাই। তবু মনে শান্তি নেই। বার বার ঘুরে ফিরে মনে হানা দেয় কথাটা–কি থেকে কি হয়ে গেল! মাঝে মাঝে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দিহান হয়ে উঠি। মনে হয়, এমন কোন পাপ তো জীবনে করিনি যার জন্যে এত কঠিন শাস্তি আমাদের প্রাপ্য হবে।

এই সব মন ভার করা ভাবনা ভুলবার জন্যে একদিন বাক্স থেকে বের

করলাম আমার পাণ্ডুলিপিটা। প্রথমে মন বসাতে কষ্ট হলেও কয়েক দিনের মধ্যেই আবার ডুবে গেলাম কাজে।

বাউন্টি চলে যাওয়ার দিন দশেক পর এক শেষ রাতে হঠাৎ, কোন কারণ ছাড়াই জেগে গেলাম আমি। আর ঘুম এল না। বেশ কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করার পর পয়েন্ট ভেনাস থেকে ঘুরে আসি, ভেবে বিছানা থেকে নেমে এলাম। সকাল হতে ঘণ্টাখানেক বাকি। আকাশে তখনও তারার মেলা। মৃদু উষ্ণ উত্তুরে হাওয়া ভেসে আসছে বিষুবীয় অঞ্চল থেকে। দীর্ঘ ধনুকের মত বাঁকানো সৈকতের ওপর দিয়ে এগিয়ে চললাম আমি।

তাহিতির যে ক'টা জায়গা আমার প্রিয় তার ভেতর প্রিয়তম এই পয়েন্ট ভেনাস। এমনিতেই রোজ ভোরে আমি চলে আসি এখানে। সূর্যোদয় দেখি। আজ একটু আগে এসেছি এই যা। সরু নদীটা, যার নাম তাইপুপু, যেখানে সাগরে মিশেছে সেখানে ছোট্ট এক টুকরো সৈকত। জায়গাটা এখন জনশূন্য দেখে ভাল লাগল আমার। উঁচু একটা বালিয়াড়ির ওপর উঠে বসলাম পুবমুখী হয়ে।

একটু পরেই ভোরের প্রথম আলোর রেখা দেখা দিল দিগন্তে। তারপর আস্তে আস্তে রাঙা হয়ে উঠতে লাগল পুবের আকাশ, সেই সাথে সাগর। দু'চোখ মেলে তাকিয়ে রইলাম আমি। সূর্য যখন পুরোপুরি উঠে এল দিগন্ত রেখার ওপরে তখন নেমে এলাম বালিয়াড়ি থেকে। তাইপুপুর পাড় ধরে এগিয়ে চললাম পয়েন্টের পশ্চিম দিকে যেখানে সাগরে মিশেছে নদীটা। মোহনার কাছেই নদীর একটা জায়গা অদ্ভুত শান্ত। স্রোত আছে কি নেই বোঝাই যায় না। অন্তত বিশ গজ চওড়া জায়গাটা। গভীরতা প্রায় দেড় মানুষ সমান। সাঁতার কাটার আদর্শ স্থান। লোকালয় থেকে দূরে এমন একটা নির্জন জায়গা পেয়ে আমি রীতিমত ভাগ্যবান মনে করি নিজেকে। রোজ সকালে সূর্যোদয় দেখার পর এখানে কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে, স্নান করে বাড়ি ফিরি।

গায়ের ইন্ডিয়ান আলখাল্লাটা খুলে রেখে আস্তে আস্তে নেমে পড়লাম নদীতে। দু'হাতে নিঃশব্দে জল কেটে এগোলাম ভাটির দিকে। হঠাৎ অদ্ভুত অপরূপ এক দৃশ্য দেখে জমে গেলাম যেন আমি। প্রাচীন একটা গাছের নদীর দিকে বেরিয়ে আসা একটা মোটা শিকড়ের ওপর বসে আছে এক তরুণী। প্রথম দর্শনে মনে হলো জলদেবী বুঝি। নিশ্চয়ই কোন শব্দ করে ফেলেছিলাম, কারণ মুহূর্ত পরেই দেখি চমকে সে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছে আমার দিকে। চমকে উঠলাম আমিও। এ সেই তেহানি!–চার্চিলদের ধরতে গিয়ে যার নাচ দেখেছিলাম টেতিয়ারোয়ায়। সংকোচ বা লজ্জার কোন চিহ্ন নেই চেহারায়। থাকার কথাও নয়। এখানকার সমাজে ওর মত মেয়েরা যে সম্মান বা মর্যাদা ভোগ করে তার তুলনা হয় না। বিরক্ত বা অপমান করেছে বলে কারও বিরুদ্ধে ও যদি অভিযোগ করে মৃত্যু ছাড়া আর কোন শাস্তি তাকে দেয়া হবে না। নিরাপত্তার এই নিশ্চয়তা আছে বলেই তেহানির মত মেয়েরা যখন যেখানে খুশি ওয়া আসা করে নিঃসংকোচে।

চমক ভাঙতেই ইন্ডিয়ান রীতিতে আমি বললাম, 'বেঁচে থাকো অনেক দিন!'

'তুমিও!' মৃদু হেসে জবাব দিল তেহানি। 'তুমি কে আমি জানি! তুমি বিয়্যাম, হিটিহিটির তাইও, না?'

'হ্যাঁ। তুমি কে বলি? তুমি তেহানি, পইনোর আত্মীয়। টেতিয়ারোয়ায় তোমার নাচ দেখেছিলাম।'

এবার শব্দ করে হেসে উঠল মেয়েটা। 'সত্যিই আমাকে দেখেছিলে? কেমন লেগেছিল আমার নাচ?'

'এত সুন্দর!—জীবনে ভুলব না সে রাতের কথা!'

'আরেরো মোনা!' হাসতে হাসতেই সে বলল। অর্থাৎ, 'গপ্পবাজ।'

'এমন সুন্দর তুমি নেচেছিলে যে,' আমি বলে চললাম, যেন ওর কথা আমার কানেই যায়নি, 'আমি হিটিহিটিকে জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হয়েছিলাম, "ওই সুন্দরী মেয়েটা কে? ও আসলে মেয়ে না কি নাচের দেবী সশরীরে মর্ত্যে নেমে এসেছেন?"'

'আরেরো মোনা!' আবার বলল ও। বলল বটে কিন্তু গালের রক্তিমাভাটা লুকাতে পারল না। 'এসো—দেখি ডুব সাঁতারে কে বেশি দূর যেতে পারে, তুমি না আমি!'

বলে আস্তে করে শিকড় থেকে ও পানিতে নেমে এল। আমার সোজাসুজি এসে বলল, 'ওই দিকে যাব। হ্যাঁ, এবার এক···দুই···তিন।'

ডুব দিলাম আমি। পানির এক ফ্যাদম মত নিচে দিয়ে সাঁতরে চললাম তেহানির দেখানো দিকে। স্রোতের পক্ষে থাকায় বেশ দ্রুত এগোতে পারলাম। শেষে বাতাসের অভাবে ফুসফুস যখন ফেটে যেতে চাইছে, ভেসে উঠে ভুস করে দম নিলাম। পেছন ফিরে খোঁজ করছি তেহানির—কল্পনাও করতে পারিনি সাঁতারে আমার চেয়ে দক্ষ হতে পারে কোন মেয়ে। এই সময় সামনে থেকে ভেসে এল মধুর ঘণ্টাধ্বনির মত রিনরিনে একটা হাসি। চমকে মুখ ঘোরাতেই দেখলাম আমার কমপক্ষে দশগজ সামনে জলের ভেতর নেমে আসা লম্বা একটা শিকড়ের ওপর বসে আছে সে।

'তুমি এসে গেছ?' হতভম্ব হয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

'দেখতেই পাচ্ছ। ভেবো না আমি পানির ওপর দিয়ে এসেছি।'

না, অতটা নীচ আমি নই যে তেহানিকে প্রবঞ্চক ভাবব। বললাম, 'ঠিক আছে, একটু জিরিয়ে নেই, তারপর আবার দেখব।'

ওর পাশে শিকড়ের ফাঁকা অংশটার দিকে ইশারা করল তেহানি। 'এসো, এখানে বসে জিরাও।'

মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে চোখের ওপর থেকে ভেজা চুল সরাতে সরাতে আমি উঠে বসলাম ওর পাশে। চুপ করে আছি। তেহানিও চুপ। তারপর অনেকক্ষণ পর—কতক্ষণ বলতে পারব না—আমি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম ওর দিকে। কি আশ্চর্য! ঠিক একই মুহূর্তে ও-ও তাকিয়েছে আমার দিকে। ওর বাদামী চোখ দুটোয় হাসির ঝিলিক। হঠাৎ করেই মুখ ঘুরিয়ে নিল তেহানি। বুঝতে পারছি

আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠছে। আমার পাশেই শিকড় আঁকড়ে আছে ওর হাত। আস্তে হাতটা তুলে নিলাম আমি। মুখ নিচু করে পানির দিকে তাকাল তেহানি।

'তেহানি!' আমি ডাকলাম। দু'হাতে ধরলাম ওর হাতটা।

জবাব দিল না তেহানি। ধীরে ধীরে মুখ উঁচু করে ঘোরাল আমার দিকে। তারপর আমি বা ও কিছু টের পাওয়ার আগেই আমার বাহুর বাঁধনে ধরা পড়ল ও।

'বিয়্যাম,' আমার কপাল থেকে ভেজা চুল সরিয়ে দিতে দিতে তেহানি বলল, 'তোমার স্ত্রী নেই?'

'না।'

'আমারও স্বামী নেই।'

এই সময় ডাঙার ওদিক থেকে ভেসে এল নারীকণ্ঠের চিৎকার: 'তেহানি! তেহানি ও!'

তেহানিও চিৎকার করে জবাব দিল: 'আসি!'

'ও আমার দাসী। আমার সাথে এসেছে তাহিতিতে। নদীর মুখে ওকে দাঁড়াতে বলে আমি এসেছিলাম গোসল করতে।'

'টেতিয়ারোয়া থেকে এসেছ তুমি?'

'না। আমি টাউতিরায় থাকি, চাচার সাথে। দু'দিন দু'রাত সাগর পাড়ি দিয়ে কিছুক্ষণ আগে পৌঁছেছি এখানে।'

'তোমার চাচা কে?'

অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল মেয়েটা। 'তুমি জানো না?'

'না।'

'আমাদের ভাষায় কথা বলতে পারো, তারপরও! আশ্চর্য মানুষ তোমরা ইংরেজরা! আমার চাচা ভেহিয়াটুয়া, টাইয়ারাপুর মহা-গোত্রপতি।'

'হ্যাঁ নাম শুনেছি ওঁর।'

'তুমি কি তোমার দেশের কোন গোত্রপতি?'

'তা বলতে পারো, যদি ও খুব ছোট দরের।'

'যা ভেবেছি। তোমাকে প্রথমবার দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম! সাধারণ কাউকে তাইও করবে না হিটিহিটি!'

আবার আমরা চুপ। দু'জনেই বুঝতে পারছি দু'জনের মনের কথা।

'তেহানি,' কিছুক্ষণ পর আমি ডাকলাম।

'হ্যাঁ।'

মুখ তুলল ও। আমি ঠোঁট ছোঁয়ালাম ওর ঠোঁটে।

সাগর সঙ্গমে পৌঁছে দেখলাম, বৃদ্ধ ভেহিয়াটুয়া নাশ্‌তা করতে বসেছে। রুটিফল, ঝলসানো মাছ আর কলা। ভাইঝির সাথে আমাকে দেখে একটুও অবাক হলো না সে।

'তেহানি,' সস্নেহে বলল বৃদ্ধ গোত্রপতি, 'কে রে তোর সঙ্গের লোকটা?'

'হিটিহিটির তাইও–ওর নাম বিয়্যাম।'

'আহ্, বিয়্যাম! ওর কথা তো শুনেছি আমি।' বলে আমার দিকে তাকাল ভেহিয়াটুয়া। 'বসো, খাও আমার সাথে। তেহানি, বড় ক্যানোয় তোর নাশতা তৈরি। যা খেয়ে নে।'

ছোট একটা ক্যানো ভিড়ে ছিল সৈকতে। তাতে উঠে তীর থেকে কিছু দূরে ভেসে থাকা একটা বড় জোড়া ক্যানোয় চলে গেল তেহানি। আমি বসলাম ভেহিয়াটুয়ার পাশে। হিটিহিটি, বাউন্টি এবং আমার সঙ্গী, যারা তাহিতিতে থেকে গেছে তাদের সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করল সে। যথাসাধ্য আমি সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করলাম বৃদ্ধকে।

'তাহলে বন্ধুদের সাথে তাহিতিতেই থেকে যাচ্ছ তুমি?' অবশেষে জিজ্ঞেস করল ভেহিয়াটুয়া।

'আঁ···অন্তত কিছু দিনের জন্যে। রাজা জর্জ যদি জাহাজ পাঠিয়ে আমাদের দেশে ফেরার আদেশ দেন তাহলে না ফিরে পারব না।'

'তা ঠিক,' বলল বৃদ্ধ গোত্রপতি, 'রাজার আদেশ তো মানতেই হবে।'

একটু পরেই তেহানি ফিরে এল তীরে। শুধু নাশতা নয়, সামান্য প্রসাধনও করে এসেছে। তাতেই এতখানি বদলে গেছে ওর চেহারা যে চোখ ফেরানো যায় না। আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম। এই কি কিছুক্ষণ আগের সেই গেছো মেয়ে, যে আমাকে হারিয়ে দিয়েছে ডুব সাঁতারে? চমৎকার চুলগুলো রোদে শুকিয়ে আঁচড়ে নিয়েছে, সামান্য সুগন্ধিও বোধহয় লাগিয়েছে। গ্রীসীয় ঢংয়ে ছাঁটা তুষার শুভ্র একটা কুঁচিওয়ালা ঝুল পোশাক পরেছে। ছোট একদল মহিলার সামনে থেকে ও যখন মাথা উঁচু করে এগিয়ে এল, আমার মনে হলো সত্যিই রাজকন্যা আসছে। আমার দিকে তাকিয়ে সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল বৃদ্ধ গোত্রপতি।

'চলো এবার, আমার কুটুম্বের বাড়িতে যাই,' বলল সে।

বিশালদেহী এক লোক হাঁটু গেড়ে পেছন ফিরে বসল ভেহিয়াটুয়ার সামনে। অনায়াস ভঙ্গিতে তার কাঁধে চড়ে বসল গোত্রপতি। বিশালদেহী লোকটা এবার উঠে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করল। ভেহিয়াটুয়া, টেইনা এবং আরও দু'তিন জন মহা-গোত্রপতি এভাবেই চলাফেরা করে। কারণ তাদের অধিকার এত ব্যাপক যে যেখানে তাদের পা পড়ে সে জায়গা তাদের নিজের সম্পত্তি হয়ে যায়। তাই সাধারণ প্রজাদের জমিজমা রক্ষা করার জন্যে এই ব্যবস্থা।

তেহানিকে পাশে নিয়ে তার চাচার পেছন পেছন এগোলাম আমি।

ভেহিয়াটুয়ার কুটুম্ব আর কেউ নয়, আমার তাইও হিটিহিটি। ব্যস্ত সমস্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে সে অভ্যর্থনা জানাল কুটুম্বকে। রাজসিক খাওয়া দাওয়ার আয়োজন শুরু হলো সঙ্গে সঙ্গে। আগে থাকতেই জানাশোনা আছে তেহানি আর হিনার। কলকণ্ঠে গল্প শুরু করল দু'জন। ওদের আলাপ না শুনতে পেলেও হিনা বার বার আমাদের দিকে তাকাচ্ছে দেখে ধারণা করলাম, সকালে নদীতে আমাদের সাক্ষাতের কথা বলছে তেহানি।

দুপুরের পর সবাই কোন গাছ বা চালার ছায়ার আশ্রয় নিল ঘুমাবে বলে। আমার অবস্থা ঘুমানোর মত নয়। তেহানির কথা ভাবতে ভাবতে সৈকতের দিকে চললাম। সৈকতের কাছেই একটা হিবিসকাস গাছের ছায়ায় দেখলাম আমার ভাইওকে। জেগেই আছে। পাশে গিয়ে বসলাম আমি।

'ঘুমাওনি, বিয়্যাম?' একটু যেন অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল হিটিহিটি।

'ঘুম আসছে না।'

'কেন?'

তেহানির সাথে আমার সাক্ষাতের কথা বললাম হিটিহিটিকে। 'তাতে কি হয়েছে?' প্রশ্ন করল হিটিহিটি।

'আমার মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে,' আমি বললাম। 'আমি ওকে ভালবেসে ফেলেছি, হিটিহিটি।'

'ভাল, এখন যদি ও রাজি হয় বিয়ে করে ফেল।'

'আমার মনে হয় ও রাজি হবে, কিন্তু ওর বাপ মা···'

'বাপ মা নেই ওর। দু'জনই মরে গেছে।'

'তাহলে ভেহিয়াটুয়া?'

'ও তোমাকে পছন্দ করে। আমার মনে হয় না ও অমত করবে।'

'ভাল। ধরো আমাদের বিয়ে হলো, তারপর আমার দেশ থেকে একটা জাহাজ এসে জানাল, আমাকে দেশে ফেরার নির্দেশ দিয়েছেন রাজা জর্জ!'

হতাশ ভঙ্গিতে প্রশস্ত কাঁধদুটোয় একটু ঝাঁকুনি দিল হিটিহিটি। 'তোমরা ইংরেজরা সব এক রকম। যা হয়তো কখনোই ঘটবে না তা নিয়ে ভেবে জীবন দুর্বিসহ করে তোলো। আজই কি যথেষ্ট নয় যে কাল বা পরশু নিয়ে মাথা ঘামাও? একটা জাহাজ হয়তো কোন দিন আসবে, এই ভেবে তুমি তোমার পছন্দের মেয়েকে বিয়ে করবে না? সে জাহাজ আসতে আসতে হয়তো দশ বা বিশ বছর পেরিয়ে যাবে! যত্তসব! শোনো, বিয়্যাম, গতকাল গত হয়ে গেছে, আজ আছে হাতে, আগামী কাল হয়তো কোনদিনই আসবে না তোমার জীবনে।'

বৃদ্ধ বন্ধুর দার্শনিক কথা শুনে হাসলাম, যদিও, তবে একটু ভাবতেই বুঝলাম, ও ঠিকই বলেছে।

'তুমি আমার ভাইও,' অবশেষে আমি বললাম, 'এদেশে তো আমার আপন কেউ নেই, আমার হয়ে ভেহিয়াটুয়ার সাথে কথা বলবে তুমি? বলবে ওর ভাস্তিকে আমি ভালবাসি, বিয়ে করতে চাই।'

'বলব মানে! একশো বার বলব!' উৎফুল্ল কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল হিটিহিটি। 'অনেক দিন হলো স্ত্রী ছাড়া আছ তুমি! এবার ভাগো, আমাকে ঘুমাতে দাও।'

কারও ঘুম ভাঙার আগেই তেহানি উঠে হাঁটতে হাঁটতে সৈকতে এল। আমাকে দেখেই চঞ্চলা হরিণী হয়ে উঠল যেন। ছুটে এল কাছে।

'আমার ভাইওর সাথে আলাপ করলাম, তেহানি,' আমি বললাম। 'আমার

পক্ষ থেকে ও তোমার চাচার কাছে প্রস্তাব রাখবে, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। ভুল হচ্ছে না তো আমার?'

আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তেহানি বলল, 'ঘুমাতে যাওয়ার আগে চাচাকে আমি বলেছি, আমি তোমাকে স্বামী হিসেবে চাই। চাচা জিজ্ঞেস করছিল, তুমি আমাকে চাও কি না। আমি বলেছি, তুমি চাও না চাও তোমাকে আমার পেতেই হবে। চাচা তখন বলল, "তুই কি চাস বিয়্যামকে অপহরণ করে ওর ভাইওর সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ি আমি?" আমি বলেছি, "হ্যাঁ, প্রয়োজন হলে করতে হবে যুদ্ধ!" চাচা তখন সস্নেহে আমাকে বলেছে, "তোর মা মারা যাওয়ার পর থেকে কোন চাওয়া তোর আমি অপূর্ণ রেখেছি রে, ছোট্ট পায়রা? তোর এই বিয়্যাম বিদেশী, তবু সে তো পুরুষ। কোন পুরুষই তোর ইচ্ছার কাছে মাথা না নুইয়ে পারবে না!" বলো, চাচা কি ঠিক বলেছে?'

'হ্যাঁ আমার মনে হয় ঠিকই বলেছে,' ওর হাত দুটো আমার হাতে তুলে নিয়ে বললাম।

হাত ধরাধরি করে আমরা যখন বাড়ি ফিরলাম, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ভেহিয়াটুয়া বলল, 'এই যে ওরা এসে গেছে!'

'দু'জনকেই একটু যেন খুশি খুশি লাগছে,' মৃদু হেসে মন্তব্য করল আমার ভাইও তারপর আমাকে বলল, 'ভেহিয়াটুয়া রাজি, তবে একটা শর্তে, বিয়ের পর তোমাকে ওর সঙ্গে টাউতিরায় থাকতে হবে। অন্তিকে কিছুতেই ও চোখের আড়াল করতে পারবে না। আমার মনে হয় না তাতে খুব একটা অসুবিধা হবে তোমার, মাঝে মাঝে এসে বেড়িয়ে যাবে আমাদের…'

আর শোনার জন্যে দাঁড়ালাম না আমি। ছুটে ঘরের ভেতর গিয়ে আমার বাক্স খুলে বের করে আনলাম সেই হারটা—ইউয়ানদের ভেতর যদি মনের মানুষ পেয়ে যাই তাহলে দেব বলে যেটা এনেছিলাম। ভেহিয়াটুয়ার হাতে ওটা তুলে দিয়ে বললাম, 'তেহানির জন্যে আমার উপহার।'

'উঁ, খুব খুশি হবে ও,' বলল ভেহিয়াটুয়া। 'এ অঞ্চলে আর কোন মেয়ের এমন জিনিস নেই। সত্যিই রাজসিক উপহার। এবার বলো তো, বিয়্যাম, তোমাকে আমরা কি দেই?'

'এটা!' তেহানির কাঁধ ধরে আমি বললাম।

'ভাল বলেছ,' হেসে বলল মহা-গোত্রপতি 'সত্যিই রাজসিক উপহার! ভাল করে দেখ তো, এখানকার কোন দ্বীপে ওর জুড়ি খুঁজে পাবে?'

পরদিনই আমি ভেহিয়াটুয়ার সাথে তল্পিতল্পাসমেত চলে এলাম টেতিয়ারোয়ায়। হিটিহিটি ও তার মেয়ে এল পরদিন। তার পরদিন শুরু হলো তেহানির সাথে আমার বিয়ের অনুষ্ঠানাদি।

প্রথমেই সাগর তীরে চমৎকার একটা নতুন বাড়ি আমাকে উপহার দিল ভেহিয়াটুয়া। ওর নিজের বাড়ি থেকে সেটার দূরত্ব খুব বেশি হলে এক কেব্‌ল (১ কেব্‌ল=১০০ ফ্যাদম বা ৬০০ ফুট বা ১/১০ নটিক্যাল মাইল)। সেই দিনই আমি আমার নতুন বাড়িতে উঠে গেলাম হিটিহিটি, হিনা, হিনার স্বামী আর

ওদের সাথে তাহিতি থেকে যারা এসেছে তাদের সবাইকে নিয়ে। পরদিন ভোরে সদলবলে ভেহিয়াটুয়ার বাড়ির পথে রওনা হলাম আমরা, সঙ্গে বিপুল পরিমাণ উপহার সামগ্রী। আনুষ্ঠানিক ভাবে গুলো গ্রহণ করল ভেহিয়াটুয়ার পরিবার। এরপর দুই পরিবারের সদস্যরা যৌথভাবে মিছিল করে এল আমার বাড়িতে। মিছিলের পেছনে এল ভৃত্যের দল, কনের বাপের বাড়ি থেকে দেয়া উপহার সামগ্রী নিয়ে। সেসব উপহারের ভেতর আছে গৃহপালিত জন্তু থেকে শুরু করে কাপড়, মাদুর, আসবাবপত্র–মোট কথা নতুন একটা সংসার শুরু করতে যা যা লাগে সব।

ঘরে ফিরে হিনা–যে এখন আমার 'পরিবারের' কর্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছে–বিরাট একটা নতুন মাদুর বিছিয়ে দিল। তার ওপর পাতা হলো নতুন একটা সাদা চাদর। ভেহিয়াটুয়ার স্ত্রী নেই। তার বড় বোন টেতুয়ানুই পালন করছে তার পরিবারের কর্ত্রীর দায়িত্ব। টেতুয়ানুই হিনার চাদরটার ওপর বিছিয়ে দিল আর একটা চাদর।

এবার আমাকে আর তেহানিকে পাশাপাশি বসতে বলা হলো চাদরগুলোর ওপর। বসলাম আমরা। আমাদের ডানে বাঁয়ে এনে রাখা হতে লাগল উপহার। দেখতে দেখতে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে উঠল গৃহস্থালি জিনিসপত্রের স্তূপ। আনুষ্ঠানিক ভাবে উপহারগুলো গ্রহণ করলাম আমি আর তেহানি।

এরপর হিনা আর টেতুয়ানুই একটা করে 'পাওনিহো' চাইল। পাওনিহো এক ধরনের ছড়ি। লোহাকাঠের তৈরি। মসৃণ, খাটো, মাথায় তীক্ষ্ণধার হাঙ্গরের দাঁত লাগানো। প্রতিটা ইন্ডিয়ান রমণীর এ ধরনের পাওনিহো আছে। শোক করার সময় ওগুলো দিয়ে মাথায় আঘাত করে রক্ত ঝরায় ওরা।

বিয়ে শোকের অনুষ্ঠান না হলেও হিনা আর টেতুয়ানুই পাওনিহোর আঘাতে কেটে ফেলল কপাল। এমন আচমকা কাজটা করে বসল ওরা, বাধা দেয়ার কোন সুযোগই আমি পেলাম না। পুরোহিত তাওমি এবার দু'হাতে ওদের দু'জনকে ধরে ধীর পায়ে ঘুরতে লাগল আমাদের চারপাশে। দুই পরিবারের দুই কর্ত্রীর মাথা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়ে ভিজে উঠতে লাগল টেতুয়ানুই-এর বিছানো কাপড়। কিছুক্ষণ পর শেষ হলো অনুষ্ঠানের এ পর্যায়। আমাকে আর তেহানিকে উঠতে বলা হলো। দুই পরিবারের রক্তে রাঙা কাপড়টা উঠিয়ে ভাঁজ করে রেখে দেয়া হলো সযত্নে।

এরপর আবার মিছিল করে কনের বাড়িতে যাওয়া। একই অনুষ্ঠান–এমন কি চাদর রক্তে রাঙানো এবং ভাঁজ করে উঠিয়ে রাখা পর্যন্ত আবার অনুষ্ঠিত হলো। তারপর শুরু হলো ভোজ। মেয়েরা এক দিকে ছেলেরা অন্যদিকে। বিকেল পর্যন্ত চলল খাওয়া দাওয়া।

বিয়ের সামাজিক অনুষ্ঠানাদি শেষ। এখন বাকি শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান। ভেহিয়াটুয়ার পারিবারিক 'মারাএ' অর্থাৎ মন্দিরে হবে এ অনুষ্ঠান। বৃদ্ধ তাওমির নেতৃত্বে ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে মিছিল করে মন্দিরে পৌঁছুলাম আমরা।

বিশাল এক অশ্বত্থ গাছের নিচে দেয়াল ঘেরা এক জায়গায় মন্দিরটা। মেঝে বাঁধানো পাথর দিয়ে। এক পাশে একটা পিরামিড; ত্রিশ গজ মত লম্বা,

চওড়া বিশ গজ, চার ধাপে উঠে গেছে প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচুতে। ওটার চূড়ায় কাঠ খোদাই করে বানানো অদ্ভুত এক পাখির প্রতিমা।

হিটিহিটি আর হিনার সঙ্গে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো ঘেরা জায়গার এক কোনায়। তেহানি, ভেহিয়াটুয়া আর ওদের অন্য আত্মীয় স্বজন রইল আমাদের সামনে, ঘেরা জায়গার অন্যপাশে। বৃদ্ধ পুরোহিত এবার আমার কাছে এসে গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল:

'এই নারীকে তুমি স্ত্রী হিসেবে চেয়েছ; ওর জন্যে তোমার যে ভালবাসা কোন দিন তা শীতল হবে না তো?'

'না,' আমি জবাব দিলাম।

ধীরপায়ে হেঁটে এরপর তেহানির সামনে গিয়ে দাঁড়াল তাওমি। একই প্রশ্ন করল ওকে। জবাবও পেল এক। এবার সে ইশারা করল অন্যদের উদ্দেশ্যে। মারাএর দু'প্রান্ত থেকে তারা এগিয়ে এল দুই পরিবারের রক্ত মাখা চাদর দুটো নিয়ে। বিছিয়ে দিল। এরপর এগিয়ে এল নিচু পদমর্যাদার কয়েকজন পুরোহিত। প্রত্যেকের হাতে একটা করে মড়ার খুলি। বিয়ের নীরব সাক্ষী। ভেহিয়াটুয়ার পরিবারের পূর্বপুরুষদের খুলি ওগুলো। পাহাড় চূড়ার পবিত্র গুহায় সংরক্ষিত থাকে খুলিগুলো। বিয়ে বা খুলি প্রয়োজন হয় এমন কোন অনুষ্ঠানের আগে পাহাড় থেকে আনিয়ে নেয়া হয়। অনুষ্ঠান শেষে আবার রেখে আসা হয় যেখানকার জিনিস সেখানে।

রক্তমাখা কাপড়গুলোর ওপর আমাকে আর তেহানিকে বসতে বলা হলো হাত ধরাধরি করে। আমাদের দুই পরিবারের অন্য সদস্যরা বসল দু'পাশে। এরপর প্রধান পুরোহিত একে একে অতীতের নামকরা সব গোত্রপতি এবং বীরদের পূর্ণ নাম, পদবী আউড়ে আহ্বান করতে লাগল বিয়েতে সাক্ষী থেকে আশীর্বাদ করার জন্যে। অনেকক্ষণ পর ক্লান্তিকর ব্যাপারটা শেষ করে আমার দিকে ফিরল তাওমি।

'এই নারী কিছুক্ষণের ভেতর তোমার স্ত্রী হবে,' গম্ভীরকণ্ঠে সে বলল। 'মনে রেখো, ও নারী, দুর্বল। সাধারণ মানুষ ক্রোধের বশে স্ত্রীকে আঘাত করতে পারে, গোত্রপতিদের তা সাজে না। ওর সাথে সদয় ব্যবহার করবে, মানিয়ে চলবে।' থামল তাওমি। তারপর তেহানির দিকে ফিরে বলে চলল, 'এই পুরুষ কিছুক্ষণের ভেতর তোমার স্বামী হবে। মনে রাখবে, ক্রোধের সময় জিহ্বাকে সংযত করা, ধৈর্য ধরা তোমার কর্তব্য হবে। ওর মঙ্গলের দিকে নজর রাখবে, অসুস্থ হলে সেবা করবে, যুদ্ধে আহত হলে ক্ষত সারিয়ে তুলবে। প্রেমই বিবাহের খাদ্য। তোমাদের বিবাহকে অভুক্ত রেখো না।' একটু থেমে আমাদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে আবার সে বলল, 'এ মাইতাই ইয়া মাই তে মেআ রা এ এ না রেইবা ওরুআ!' অর্থাৎ, 'এভাবে যদি তোমরা চলো, তোমাদের মঙ্গল হবে।'

কথাটা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম, আমার হাতের ভেতর কেঁপে উঠল তেহানির হাত। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, ওর চোখে জল। গভীর নিস্তব্ধতা মন্দিরে। ভেহিয়াটুয়ার গৃহদেবতা তাওরার উদ্দেশ্যে আমাদের

মঙ্গল কামনা করে দীর্ঘ প্রার্থনা করল পুরোহিত। তারপর বলল, 'তাপোইটা নিয়ে এসো!'

তাপোই হচ্ছে পুরুষদের তৈরি বাদামী রঙের এক ধরনের কাপড়। এই কাপড়কে পবিত্র বলে গণ্য করা হয় ইন্ডিয়ান সমাজে।

মন্দিরের পেছন থেকে বিরাট কাপড়টা নিয়ে এল এক মন্দির রক্ষক। পুরোহিত সেটা দু'হাতে ধরে মেলে নিল প্রথমে। তারপর আচমকা ছুঁড়ে দিল আমাদের ওপর। আমি আর তেহানি সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেলাম ওটার নিচে। এক মুহূর্ত পরেই সরিয়ে নেয়া হলো তাপোই। উঠে দাঁড়াতে বলা হলো আমাদের। বিয়ে শেষ। আমি আর তেহানি এখন বর ও বধূ। দুই পরিবারের সদস্যরা একে একে এগিয়ে এসে ইন্ডিয়ান রীতিতে আলিঙ্গন করতে লাগল আমাদের।

বারো

বিয়ের এক মাস পর তেহানি আর আমি বেড়াতে এলাম আমার ভাইওর বাড়িতে। বুড়ো হিটিহিটিকে, সেই সাথে স্টুয়ার্ট, মরিসন এবং বাউন্টির অন্য নাবিক বন্ধুদের দেখার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম মনে মনে।

মরিসন আর মিলওয়ার্ড সেই নামকরা যোদ্ধা পইনোর বাড়িতে থাকে এখন। স্টুয়ার্ট পেগিকে বিয়ে করেছে। পেগির বাবা টিপাউ-এর বাড়িতেই আছে ওরা। অন্যরাও যার যার সুবিধা ও সুযোগ মত থাকার জায়গা ঠিক করে নিয়েছে।

দুপুর নাগাদ আমরা পৌঁছুলাম হিটিহিটির বাড়িতে।

'তোমার বন্ধুরা জাহাজ তৈরি করছে,' খাওয়ার সময় হিটিহিটি জানাল। 'মরিসন আর মিলওয়ার্ড তদারক করছে কাজ। তলী বসানো হয়ে গেছে, এখন ওরা খোল জুড়ছে।'

আমি খুব একটা অবাক হলাম না, মরিসন আগেই জানিয়েছিল ছুতোর মিস্ত্রীর দুই সহকারীকে নিয়ে 'জাহাজ' অর্থাৎ বড়সড়, সাগরপাড়ি দেয়ার উপযোগী নৌকা বানানোর চেষ্টা সে করবে। আমার যা হলো, তা কৌতূহল। দিবানিদ্রা শেষ করে হাঁটতে হাঁটতে আমরা গেলাম সেখানে, যেখানে জাহাজ তৈরি হচ্ছে–হিনা, ওর বাবা, তেহানি আর আমি।

সৈকত থেকে শ'খানেক গজ দূরে এক টুকরো ঘাসে ছাওয়া জমি পছন্দ করেছে মরিসন একাজের জন্যে। জমিটার মালিক মহা-গোত্রপতি টেইনা। একদল ইন্ডিয়ান বসে বসে দেখছে সাদা মানুষদের কাজ। গভীর কৌতূহল ওদের চোখে মুখে। আমরা যখন পৌঁছুলাম তখন, টেইনা স্বয়ং তার স্ত্রী ইটিয়াকে নিয়ে উপস্থিত সেখানে। সহৃদয়তার সাথে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল ওরা। আমার ওপর চোখ পড়তেই হাতের কাজ ফেলে কপালের ঘাম মুছতে

মুছতে এগিয়ে এল মরিসন।

'তোমার বিয়ের খবর শুনেছি,' আমার সাথে করমর্দন করতে করতে সে বলল। 'কামনা করি, তোমরা সুখী হও।'

তেহানির সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম ওর। এই সময় লাফাতে লাফাতে এল ছোকরা টম এলিসন। 'কেমন দেখলেন আমাদের জাহাজ, মিস্টার বিয়্যাম?' জিজ্ঞেস করল সে। 'মাত্র ত্রিশ ফুট লম্বা যদিও, তবু মিস্টার মরিসন আশা করছেন ওতে চড়ে আমরা বাতাভিয়ায় পৌঁছুতে পারব।'

'আমিও তাই আশা করি,' একটু হেসে আমি বললাম।

জাহাজ বানানোর কাজে অন্য যারা অংশ নিচ্ছে তাদের সাথে কুশল বিনিময় হলো এরপর। বাউন্টির আর্মারার কোলম্যান, ছুতোর মিস্ত্রীর দুই সহকারী নরম্যান আর ম্যাকইন্টশ, খালাসী হিলব্রান্ডট, ডিক স্কিনার–সবার সাথেই কিছু না কিছু আলাপ করলাম। একটা ব্যাপার বুঝতে পারলাম, এরা সবাই কাজ করছে প্রাণের তাগিদে। কেউ কেউ সত্যি সত্যি ইংল্যান্ডে ফিরতে চায় বলে, বাকিরা ইংল্যান্ড থেকে আরেকটা জাহাজ এসে পড়ার আগেই এই ছোট্ট জাহাজে উঠে পাল তুলে দিতে না পারলে কি পরিণতি হবে তা ভেবে।

আন্তরিক ভাবে ওদের কাজের সাফল্য কামনা করে বিদায় নিলাম আমরা। তারপর গেলাম স্টুয়ার্টের বাড়িতে। আমরা যখন পৌঁছুলাম ও তখন শ্বশুরের বাগানে কাজ করছে। আমাদের দেখেই কাজ ফেলে উঠে এল স্টুয়ার্ট, চিৎকার করে ডাকাডাকি করতে লাগল পেগিকে। তেহানির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম ওদের।

'রাতে আমাদের এখানে খাচ্ছ তোমরা,' ঘোষণা করল স্টুয়ার্ট। খুশি মনেই আমরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। মরিসন আর এলিসন এসেছে আমাদের সাথে। ওদেরও খেয়ে যেতে বলল স্টুয়ার্ট।

'কতদিন লাগবে তোমাদের জাহাজ তৈরি শেষ হতে?' খেতে খেতে আমি জিজ্ঞেস করলাম মরিসনকে।

'আরও ছ'মাস তো লাগবেই, বেশিও লাগতে পারে। যন্ত্রপাতি এত কম, দ্রুত কাজ করতে পারছি না।'

'ওতে চড়ে বাতাভিয়ায় পৌঁছানোর আশা করো তুমি?'

'হ্যাঁ। বাতাভিয়ায় একবার পৌঁছুতে পারলে হয়, কোন ডাচ জাহাজে জায়গা পেয়ে যাব নিশ্চয়ই। আমরা পাঁচজন যাব–নরম্যান, ম্যাকইন্টশ, মুসপ্র্যাট, বায়ার্ন আর আমি। স্টুয়ার্ট আর কোলম্যান এখানেই থাকতে চায় যতদিন না ইংল্যান্ড থেকে জাহাজ আসে।'

'আমারও তাই ইচ্ছা,' আমি বললাম। 'টাউতিরায় ভালই আছি। মন দিয়ে অভিধানের কাজ করতে পারছি।'

'আমার কথা যদি জিজ্ঞেস করো,' স্টুয়ার্ট বলল, 'বাস করার জায়গা হিসেবে মন্দ নয় তাহিতি। এ জায়গা ছেড়ে ডুবে মরার কোন ইচ্ছা আমার নেই।'

'ডুবে মরা না আরও কিছু!' মরিসন বলল। 'আমাদের এই ছোট্ট স্কুনার

সারা দুনিয়া ঘুরে আসতে পারবে, দেখো!'

'আমাদের কথা তো বললেন না মিস্টার বিয়্যামকে,' বলে উঠল এলিসন। 'ছোট একটা রাজ্য গড়ে তুলতে যাচ্ছি আমরা। মিস্টার মরিসন কথা দিয়েছেন এখানকার পশ্চিমে কোন দ্বীপে আমাদের নামিয়ে দিয়ে যাবেন।'

'হ্যাঁ,' মরিসন বলল, 'সেটাই সবচেয়ে ভাল হবে ওদের জন্যে। শান্ত, নিরীহ লোকজন বাস করে এরকম একটা দ্বীপ ওদের খুঁজে দেয়ার চেষ্টা করব।'

'ওদের মানে, বিদ্রোহীদের? সবাই নাকি?' জিজ্ঞেস করলাম।

'না সবাই না। টম ছাড়া, মিলওয়ার্ড, বারকিট, হিলব্রান্ডট আর সামনার যাবে। চার্চিল স্কিনার এখানেই থেকে যাবে ঠিক করেছে।'

'আর থম্পসন?'

'ওর কথা বোলো না, একটা জানোয়ার। যা ইচ্ছা হয় করবে, আমার জাহাজে ওর জায়গা হবে না।'

'মানে?'

'মানে এখানে যদি ক'দিন থাকো নিজেই টের পাবে।'

পরদিনই টের পেলাম।

ভোরবেলা সৈকতে গেছি সাগরে স্নান করব বলে। ডাঙায় তোলা একটা ক্যানোর পাশে দেখলাম ওকে। সঙ্গে আছে চার্চিল। বাচ্চা একটা শুয়োর আগুনে ঝলসাচ্ছে। নাশতা করবে বলে। আমাকে দেখেই খুশি হয়ে উঠল চার্চিল। আন্তরিক গলায় বলল, 'এসো, বিয়্যাম, নাশতা করো আমাদের সাথে।'

'তুমি একটা উজবুক, চার্চিল!' গর্জে উঠল থম্পসন। 'নিজেদেরই হয় না, এর ভেতর আবার ডাকছ বদমাশটাকে!'

মুহূর্তে আগুন হয়ে উঠল চার্চিল। 'তুমি—তুমি একটা নরকের কীট!' বলল সে। 'মিস্টার বিয়্যাম আমার বন্ধু। যাও ওই আধা সভ্য ইন্ডিয়ানগুলোর কাছে শিখে এসো, বন্ধুর সাথে কেমন ব্যবহার করতে হয়!'

আর একটা কথাও না বলে থম্পসন উঠে একটা বালিয়াড়ির ওপর গিয়ে বসল। দু'হাঁটুর মাঝখানে খাড়া করে রাখল ম্যাস্কেট।

এমনিতে আমার নাশতা করার সময় এখনও হয়নি তার ওপর যে ঘটনা ঘটে গেল তাতে ওদের খাবারে ভাগ বসাবার প্রশ্নই ওঠে না। চার্চিলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি দশ বারো জন লোক বড়সড় একটা পালতোলা ক্যানো ডাঙায় টেনে তুলছে। ক্যানোর মালিক ও তার স্ত্রী এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। লোকটার কোলে তিন চার বছরের একটা বাচ্চা। চার্চিল আর থম্পসনের ক্যানোটার কাছে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। মহিলা কৌতূহলী হয়ে একটু ঝুঁকল সাদা মানুষদের ক্যানোয় কি আছে দেখার জন্যে। অমনি শোনা গেল থম্পসনের কর্কশ চিৎকার:

'সরো! সরো ওখান থেকে!'

বিনীত ভঙ্গিতে মুখ তুলল ইন্ডিয়ান দম্পতি। থম্পসনের ইংরেজি কথার কিছুই বুঝতে পারেনি ওরা।

'সরে যা ওখান থেকে, গর্দভের দল!' আবার চেঁচাল থম্পসন, এবং এবারও ইংরেজিতে।

অসহায়, একটু বিস্মিত চেহারা হলো ইন্ডিয়ান দম্পতির। কি করবে বুঝতে পারছে না। চার্চিল মাত্র মুখ খুলেছে ওদের বুঝিয়ে বলার জন্যে, এই সময় আচমকা মাস্কেট তুলে গুলি করে বসল থম্পসন। বাচ্চা এবং তার বাবার বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেল গুলি। দু'জনই লুটিয়ে পড়ল বালুকাবেলায়। লাল হয়ে উঠল মাটি। বাচ্চার মা আর্তনাদ করে উঠল প্রাণ কাঁপানো স্বরে। চারপাশ থেকে মানুষজন ছুটে আসতে লাগল আমাদের দিকে।

লাফ দিয়ে উঠে থম্পসনের কাছে ছুটল চার্চিল। এক ঘুষিতে খুনীটাকে শুইয়ে ফেলল মাটিতে। মাস্কেট কেড়ে নিল। তখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে সেটার নল দিয়ে। এরপর আর এক মুহূর্ত দেরি না করে থম্পসনের জ্ঞানহীন দেহটা কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটে গেল নিজেদের ক্যানোর দিকে। খোলের ভেতর থম্পসনকে নামিয়ে রেখে ক্যানোটাকে টেনে নামিয়ে ফেলল সাগরে। কেউ কি ঘটছে ভাল করে বোঝার আগেই সে পাল তুলে দিল। কিছুক্ষণের ভেতর পশ্চিম দিকে হারিয়ে গেল ক্যানোটা।

মৃত্যু পথযাত্রী বাবা ও বাচ্চার কাছে ছুটে গেলাম আমি। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে তখন। মৃত্যুর কোলে আশ্রয় পেয়েছে দু'জনই। ততক্ষণে দলে দলে ইন্ডিয়ান জড়ো হতে শুরু করেছে সাগর তীরে। মৃতদেহ দুটো দেখে ভয়ানক হয়ে উঠেছে তাদের চেহারা। কয়েকজন হাতে তুলে নিয়েছে পাথরের টুকরো, কারও কারও হাতে লাঠি। দু'তিন জন ছুটে এসে ধরে ফেলল আমাকে। এই সময় যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হলো হিটিহিটি।

'ও আমার ভাইও!' গম্ভীর কণ্ঠে সে বলল, 'ছেড়ে দাও ওকে! ও কোন অপরাধ করেনি। তোমরা মেয়ে মানুষের মত জটলা করছ কেন এখানে? হাতে অস্ত্র আছে, ক্যানো ভাসিয়ে ধাওয়া করে ধরো না খুনীদের! যে খুন করেছে, তাকে আমি চিনি, কোন ইংরেজ ওকে বাঁচানোর জন্যে হাত তুলবে না!'

এতক্ষণে যেন লোকগুলো বুঝতে পারল কি করতে হবে। ক্যানো ভাসিয়ে ছুটল ওরা চার্চিল ও থম্পসনের পেছন পেছন। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দূর চলে গেছে চার্চিলের ক্যানো। প্রাণপণ চেষ্টা করেও ধরতে পারল না ওরা।

পনেরো দিন পর এই ঘটনার সমাপ্তি টানল নিয়তি।

আমি আর তেহানি টাউতিরায় ফিরে দেখি চার্চিল আর থম্পসন হাজির সেখানে। তাহিতিতে ফিরে যাওয়ার সাহস পায়নি ওরা। তাইয়ারাপুতে কয়েকদিন কাটিয়ে তাই চলে এসেছে টাউতিরিয়ায়। ভেহিয়াটুয়া আমার বন্ধু ভেবে মোটামুটি সাদরেই গ্রহণ করেছে ওদের। ইতোমধ্যে থম্পসনের ওপর চরম বিতৃষ্ণায় ছেয়ে গেছে চার্চিলের মন। এককালে লোকটা ওর সাথী ছিল, ভেবে ও ওকে না পারছে গিলতে না পারছে ওগরাতে।

আমরা যেদিন পৌঁছুলাম সেদিনই চার্চিল এল আমাদের বাড়িতে। হাতে

মাস্কেট। অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর থম্পসনের প্রসঙ্গ উঠতেই ও বলল, 'বদমাশটাকে খুন করার কথা ভেবেছি বহুবার। প্রতিবারই শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেছি। ঠাণ্ডা মাথায় একজনকে খুন করি কি করে, তুমিই বলো! এখন আফসোস হয়, কেন যে সেদিন ওকে বাঁচাতে গেলাম ইন্ডিয়ানদের হাত থেকে!'

'হুঁ। না হলে সেদিনই ওর দফা রফা হয়ে গিয়েছিল,' আমি বললাম।

'খুবই ভাল কাজ হত একটা! একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি আমি। আজ ওকে বলে দিয়েছি, ক্যানোটা নিয়ে যেখানে খুশি চলে যাক, আর যেন এখানে না ফেরে।'

'শোনো, তুমি আর ওকে নিয়ে মাথা ঘামিও না, ইন্ডিয়ানরাই যা করার করবে। তুমি সঙ্গে না থাকলে এতদিন কবে ওকে সাবড়ে দিত!'

'জানি। তুমি একটু সাবধানে থেকো, বিয়্যাম। আমার ধারণা ও উন্মাদ হয়ে গেছে; কখন কি করে বসে ঠিক নেই। তোমার কাছে তো একটা মাস্কেট আছে, তাই না? সব সময় ওতে গুলি ভরে রেখো। যতদিন না বদমাশটা এখান থেকে যাচ্ছে ততদিন একটু সতর্ক থাকাই ভাল।'

সেদিনই রাতে। আমার 'বন্ধুদের' সম্মানে এক 'হেইভা'র আয়োজন করেছে আমার চাচাশ্বশুর। হেইভা মানে অনেকদিন আগে টেতিয়ারোয়ায় যে অনুষ্ঠানে তেহানিকে নাচতে দেখেছিলাম সে ধরনের অনুষ্ঠান। এক পাশে তেহানি অন্য পাশে চার্চিলকে নিয়ে সবুজ ঘাসের গালিচায় বসেছি আমি। ঢাকের আওয়াজ সবে শুরু হয়েছে কি হয়নি অমনি ইন্ডিয়ান ভাষায় পেছন থেকে কয়েকজনের চিৎকার শুনতে পেলাম: 'দেখো! দেখো! সাবধান!' তারপরই গুলির শব্দ। চার্চিল লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল। কিন্তু তার আগেই গলা দিয়ে কাশির মত একটা আওয়াজ করে লুটিয়ে পড়ল আমার পাশে। মাস্কেটটা খসে পড়ল ওর হাত থেকে।

নারী কণ্ঠে তীক্ষ্ণ চিৎকার আর পুরুষদের হাঁকডাকে ভরে গেল জায়গাটা। সব শব্দ ছাপিয়ে ভেহিয়াটুয়ার গলা শুনতে পেলাম: 'এই! মারো ওকে! মারো ওকে!' মশালের আলোয় দেখলাম মাস্কেট হাতে ছুটে সৈকতের দিকে পালাচ্ছে থম্পসন। দর্শকদের ভেতর ছিল আতুয়ানুই নামের এক দুর্ধর্ষ বীর। বিরাট একটা পাথর দু'হাতে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল সে আততায়ীকে লক্ষ্য করে। থম্পসনের দু'কাঁধের মাঝখানে লাগল সেটা। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল থম্পসন। পর মুহূর্তে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আতুয়ানুই। সেই পাথরটাই আবার তুলে নিয়ে আঘাত করে চলল একের পর এক। খুলি ফেটে ঘিলু বেরিয়ে এল থম্পসনের।

তেহানির হাত ধরে আমি যখন বাড়ি ফিরছি, তখন চার্চিলও আর বেঁচে নেই।

সতেরোশো নব্বই সালের ১৫ আগস্ট আমাদের মেয়ে হেলেন-এর জন্ম হলো। দীর্ঘ পদবীসহ তেহানির নামে নাম রাখা হলো তার। আমি আমার মত করেও

একটা নাম রাখলাম–আমার মায়ের নামে। নিজের মেয়ে বলে বলছি না, সত্যিই অদ্ভুত সুন্দর হয়েছে বাচ্চাটা। মোটাসোটা স্বাস্থ্যবান। চোখ দুটো অপূর্ব, গাঢ় নীল, সাগরের মত। আমাদের প্রথম বাচ্চা অর্থাৎ 'মাতাহিয়াপো' বলে ওর জন্ম তাইয়ারা'পুর জন্যে এক বিশেষ ঘটনা। শুধু ধর্মীয় বা সামাজিক দিক থেকেই নয়, রাজনৈতিক দিক থেকেও।

ভেহিয়াটুয়ার পারিবারিক মন্দিরের পেছনে বড় একটা জায়গা বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। তিনটে ছোট ছোট ঘর তৈরি করা হয়েছে তার ভেতর। প্রথমটার নাম 'মিষ্টি ফার্নের ঘর' এই ঘরে প্রসূতি সন্তান প্রসব করে। দ্বিতীয়টাকে বলা হয় 'আঁতুড় ঘর'। প্রসবের পর পনেরোদিন মা ও শিশু এখানে থাকে। তৃতীয় ঘরের নাম 'সাধারণ ঘর'। এখানে থাকে প্রসূতির সেবিকারা।

ছোট্ট হেলেন জন্ম নেয়ার পর ছ'দিন পর্যন্ত আমাকে যেতে দেয়া হলো না ওর কাছে। এরকমই নাকি রীতি এখানকার। সপ্তম দিন সকালে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো ভেহিয়াটুয়া। গণ্ডী পেরিয়ে ঢুকলাম দু'জন আঁতুড় ঘরে। প্রথমবারের মত আমি আমার মেয়ের মুখ দেখলাম। ছোট্ট হাতের মুঠো দুটো নাড়ছে আমার দিকে তাকিয়ে।

দেখতে দেখতে চলে গেল বছরটা। আমার মেয়ের বয়স এখন সাত মাস। তেহানি আর হেলেনকে নিয়ে সুখেই কাটছে আমার জীবন টাউতিরায়। দেশের কথা ভুলতে বসেছি। মাঝে মাঝে যেটুকু মনে পড়ে তার পুরোটা জুড়ে থাকে মা। মাস তিনেক আগে স্টুয়ার্ট আর পেগি এসেছিল আমাদের এখানে বেড়াতে। ওদেরও একটা মেয়ে হয়েছে। আমাদের হেলেনের মতই ফুটফুটে সুন্দর। দু'তিন দিন থেকে ফিরে গিয়েছিল ওরা। আমার অভিধানের কাজ চলছে। এ এমন এক কাজ যার শেষ বোধহয় কখনোই হবার নয়–অন্তত একজনের জীবনকালে যে নয় তাতে আমি নিঃসন্দেহ। প্রতিদিনই নতুন নতুন শব্দের সন্ধান পাচ্ছি, লিপিবদ্ধ করছি; কখনও কোন বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোন পুরানো শব্দের নতুন ব্যঞ্জনা খুঁজে পাচ্ছি। এছাড়া ঘরের কাজ তো আছেই। মেয়ের পরিচর্যায় তেহানিকে সুযোগ পেলেই সাহায্য করি। সব মিলিয়ে সময় এখন কোন দিক দিয়ে যে পেরিয়ে যায় টেরই পাই না।

সতেরোশো একানব্বই এল। শুরুটা গেল বছরের মত সুখেরই হলো। জানুয়ারি চলে গেল, ফেব্রুয়ারিও। মার্চের মাঝামাঝি সময় কয়েক দিনের জন্যে ভেহিয়াটুয়ার সঙ্গে দ্বীপের অন্য পাশে গেল তেহানি, কি এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্যে। হেলেনকে নিয়ে গেল ও। আমি আর আমার শ্যালক তুয়াহু রইলাম বাড়িতে।

তেহানি যাওয়ার সপ্তাহ খানেক পর এল জাহাজটা।

আগের রাতে 'হেইভা' দেখে এসে ঘুমাতে ঘুমাতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে সেদিন অনেক বেলা হয়ে যাওয়ার পরও ঘুম ভাঙেনি আমার। কাঁধে কারও স্পর্শ পেয়ে জেগে দেখি তুয়াহু। চেহারা দেখে মনে হলো কোন কারণে উত্তেজিত ও।

'বিয়্যাম!' রুদ্ধশ্বাসে বলল তুয়াহু, 'ওঠো! জাহাজ! জাহাজ!'

আর শোনার জন্যে অপেক্ষা করলাম না। বিছানা থেকে নেমে ওর পেছন পেছন ছুটলাম সৈকতের দিকে।

এরই মধ্যে অনেক লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। সবার দৃষ্টি পুব সাগরের দিকে। সূর্যের জন্যে ভাল করে তাকাতে পারছে না, ভুরু কুঁচকে আছে। তুয়াহুর মত উত্তেজনায় টগবগ করছে তারাও।

'স্পেনের জাহাজ হলে,' একজনকে বলতে শুনলাম, 'এখানে আসবে।'

'ফ্রান্সের হলে হিটিয়ায় যাবে।'

'ব্রিটিশ হলে যাবে মাতাভাই-এ,' আমার দিকে তাকিয়ে যোগ করল তুয়াহু।

'তোমার কি মনে হয়, ওটা ব্রিটিশ?' জিজ্ঞেস করল আমার ফুফুশাশুড়ি টেতুয়ানুই।

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। এক ইন্ডিয়ান মন্তব্য করল, 'আর যা-ই হোক, স্পেনের না। দেখছ না দূর দিয়ে চলে যাচ্ছে।'

নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলাম আমি। হ্যাঁ লোকটা ঠিকই বলেছে। এ দ্বীপে ভেড়ার কোন লক্ষণ নেই জাহাজটার গতিতে।

কিছুক্ষণ পর একটু যখন কূলের কাছাকাছি হলো, উপরের পালগুলোর আকৃতি দেখে আমার বুঝতে বাকি রইল না, ওটা ব্রিটিশ জাহাজই। বুকের ভেতর লাফিয়ে উঠল কলজেটা।

'তুয়াহু!' চিৎকার করলাম আমি, 'মনে হচ্ছে ওটা ব্রিটিশ জাহাজ! তোমার ছোট ক্যানোটা নিয়ে তৈরি হও, এক্ষুণি আমরা মাতাভাই-এ যাব!'

তেরো

মাতাভাই-এ পৌঁছেই আমি স্টুয়ার্টের সাথে দেখা করলাম।

'আমি জানতাম তুমি আসবে,' বলল ও। 'জাহাজটা কোথাকার বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলাম। 'ইংল্যান্ডের যুদ্ধ জাহাজ।'

'আমারও তা-ই মনে হয়েছে,' দুঃখ মেশানো স্বরে বলল স্টুয়ার্ট। 'খুশি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু খুশি আসছে না। তোমার?'

আমার অবস্থাও স্টুয়ার্টের মতই। জাহাজটাকে প্রথম দেখে সত্যিই খুশি হয়ে উঠেছিলাম, এবার দেশে ফিরতে পারব ভেবে। কিন্তু এর ভেতরে যে তাহিতিও আমার দেশ হয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারলাম একটু পরেই, যখন মনে পড়ল তেহানির কথা, আমার হেলেনের কথা। ইংল্যান্ডের সঙ্গে আমার বন্ধন যতটুকু তাহিতির সঙ্গে তার চেয়ে কম নয় মোটেই।

'না, স্টুয়ার্ট, আমারও আসছে না,' একটু চুপ করে থেকে আমি বললাম।

'আমাদের বউ বাচ্চাদের কি হবে?' করুণ শোনাল স্টুয়ার্টের গলা। 'তোমার কাছে আশ্চর্য লাগতে পারে, বিয়্যাম, কিন্তু সত্যি বলছি, বাউন্টি চলে যাওয়ার পর একবারও আমার মনে হয়নি তাহিতি ছেড়ে যেতে হতে পারে আমাদের।'

'আমি বুঝতে পারছি তোমার মনের অবস্থা। কিন্তু...'

'থাক, এ নিয়ে আর কথা বলে লাভ নেই। জাহাজটা ইংল্যান্ডের, তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছ?'

'একদম ঠিক?'

'বেচারা মরিসন!'

'মানে?'

'মাত্র চারদিন আগে ও রওনা হয়ে গেছে ওর সেই ছোট্ট স্কুনার নিয়ে।'

'তাই নাকি! আর অন্যরা?'

'ওরাও গেছে। নরম্যান, ম্যাকইন্টশ, বায়ার্ন আর মুসপ্র্যাটকে নিয়ে ও বাতাভিয়ায় যাওয়ার চেষ্টা করবে। এলিসন, হিলব্রান্ডট, বারকিট, মিলওয়ার্ড আর সামনারকে নামিয়ে দিয়ে যাবে কোন দ্বীপে।'

'মানে আগের পরিকল্পনা থেকে এক চুল নড়েনি ওরা।'

'হ্যাঁ।'

'বেচারাদের কপাল খারাপ বলতে হবে। আর মাত্র চারটে দিন যদি থেকে যেত...'

এই সময় জোর এক হৈ-চৈ উঠল সৈকতে ভীড় করে থাকা ইন্ডিয়ানদের ভেতর। দেখতে পেয়েছে ওরা জাহাজটাকে। ছোট্ট একটা অন্তরীপের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে আসছে মাতাভাইয়ের দিকে। এখনও ওটা উপকূলের তিন চার মাইল দূরে রয়েছে। এদিকে সন্ধ্যা হয় হয়। বাতাসের বেগ কমে গেছে। আজ আর ওটা বেশিদূর এগোতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। একটু পরেই দেখলাম একে একে পালগুলো গুটিয়ে ফেলা হলো জাহাজটার। এতদূর থেকে আমরা দেখতে না পেলেও বুঝলাম নোঙ্গরও ফেলা হয়েছে। একে একে লোকজন ফিরে যেতে লাগল যার যার বাড়িতে। যারা একটু বেশি উৎসাহী তারা রয়ে গেল সৈকতে।

রাতটা আমি স্টুয়ার্টের বাড়িতে কাটালাম।

পরদিন ভোরে সূর্য ওঠার আগেই ফিরে এলাম সৈকতে তুয়াহু আর টাউতিরা থেকে অন্য যারা এসেছে তাদের কাছে। ওরা সৈকতেই রাত কাটিয়েছে। তুয়াহু ক্যানো নিয়ে জাহাজের কাছে যাওয়ার প্রস্তাব দিল। ও বলল, 'জাহাজটা যদি অপরিচিত হয়, আমরা পথ দেখিয়ে নিয়ে আসলে ক্যাপ্টেন খুশি হবে। আর যদি ওটা পারাই-এর জাহাজ হয় আমরাই প্রথম ওর সাথে দেখা করব!'

আপত্তি করার কিছু দেখলাম না। একটু পরেই ক্যানোয় চেপে রওনা হয়ে গেলাম আমরা—আমি, তুয়াহু, আর তুয়াহুর বৃদ্ধ ভৃত্য পাওটো।

ঘণ্টা খানেক লাগল জাহাজটার কাছে পৌঁছুতে। ইতোমধ্যে সূর্যোদয়

হয়েছে। দূর থেকে দেখলাম জাহাজটার গায়ে বড় বড় হরফে লেখা 'প্যানডোরা'। কিছুক্ষণ আগে নোঙ্গর তুলে রওনা হয়েছে ওটা। আমরা যখন মাত্র কয়েকশো গজ দূরে তখন প্যানডোরার নাবিকরা লক্ষ করল আমাদের। জাহাজের মুখ সামান্য ঘুরিয়ে আমাদের ক্যানোর দিকে আসতে লাগল ওরা।

বেশির ভাগ নাবিকই ডেকের ওপর, রেলিংয়ে ঝুঁকে তাকিয়ে আছে উপকূলের দিকে। কিছু লোক কৌতূহলী হয়ে দেখছে আমাদের। ক্যাপ্টেনকে দেখলাম কোয়ার্টার ডেকে, তার চোখের দূরবীন আমাদের দিকে তাক করা। জাহাজ আর আমাদের ক্যানো যখন পাশাপাশি হলো আমরা দাঁড় বেয়ে চললাম ওটার সঙ্গে সঙ্গে। গ্যাঙওয়ে থেকে একটা রশি ছুঁড়ে দেয়া হলো আমাদের দিকে। পাওটো রশিটা ধরে জাহাজের গায়ে নিয়ে লাগাল ক্যানো। আমি আর তুয়াহু উঠে পড়লাম জাহাজে। পাওটো ক্যানোতেই রইল।

রোদে পুড়ে আমার গায়ের রঙও এখন ইন্ডিয়ানদের মত বাদামী হয়ে গেছে, তার ওপর আমার গায়ে রয়েছে ইন্ডিয়ানদের পোশাক, বাহুতে উল্কি। জাহাজের সবাই আমাকে তাহিতীয় বলে ভুল করল। গ্যাঙওয়েতে এক লেফটেন্যান্ট দাঁড়িয়ে ছিল। এগিয়ে এসে তুয়াহুর কাঁধ চাপড়ে দিয়ে সে বলল, 'মাইতাই! মাইতাই!' অর্থাৎ, 'শাবাশ, শাবাশ!' সন্দেহ নেই এই একটা ইন্ডিয়ান শব্দই জানে লেফটেন্যান্ট।

'ওর সাথে ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন,' মৃদু হেসে আমি বললাম। 'ইংরেজি ও ভালই বোঝে। আমার নাম বিয়্যাম, রজার বিয়্যাম; হিজ ম্যাজেস্টিজ শিপ বাউন্টির সাবেক মিডশিপম্যান আমি।'

মুহূর্তে মুখের ভঙ্গি বদলে গেল লেফটেন্যান্টের। কোন জবাব না দিয়ে আপাদমস্তক দেখল আমাকে। তারপর চিৎকার করে ডাকল, 'কর্পোরাল!'

এগিয়ে এসে সামরিক কায়দায় সালাম ঠুকল কর্পোরাল।

'কয়েক জন রক্ষী নিয়ে এসে এই লোকটাকে পেছনে নিয়ে যাও!'

চিৎকার করে একটা নির্দেশ দিল কর্পোরাল। অমনি চারজন মাস্কেটধারী নৌ-সেনা ছুটে এসে ঘিরে ফেলল আমাকে। অবাক হওয়ারও অবসর পেলাম না, কর্পোরালের নির্দেশ শুনতে পেলাম: 'এগোও!' পিঠে অনুভব করলাম মাস্কেটের খোঁচা।

এগোতে হলো আমাকে। সামনে সেই লেফটেন্যান্ট।

কোয়ার্টার ডেকে ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে সে বলল, 'স্যার, গুণ্ডাগুলোর একটাকে ধরেছি।'

'না, স্যার,' প্রতিবাদ করলাম আমি। 'আমি গুণ্ডা নই। আপনারা···'

'থামো!' গর্জে উঠল ক্যাপ্টেন। লেফটেন্যান্টের মতই আপাদমস্তক দেখল আমাকে নীরবে।

'আমার কথা শুনুন, স্যার,' আবার বললাম আমি। 'আমি বিদ্রোহী নই। আমার নাম···'

'কথা কানে ঢোকেনি, বদমাশ? আমি তোমাকে চুপ করতে বলেছি!'

রাগে লজ্জায় আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত

দাঁড়িয়ে রইলাম চুপচাপ। ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখলাম, তুয়াহু দুচোখ ভর্তি বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ওকে কিছু বলার জন্যে মুখ খুললাম। আবার ধমক মেরে থামিয়ে দেয়া হলো আমাকে।

আর্মারারকে ডাকা হলো। আমার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল সে। তারপর কর্পোরালের তত্ত্বাবধানে রক্ষীরা ক্যাপ্টেনের কেবিনে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখল আমাকে।

দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। এর ভেতর রক্ষীদের ছাড়া আর কারও মুখ আমি দেখতে পাইনি। রক্ষীদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি কয়েকবার, আগের মতই ওরা ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছে আমাকে। অবশেষে, প্যানডোরা মাতাভাইয়ে নিরাপদে নোঙ্গর করার পর, এল ক্যাপ্টেন। পেছনে সেই লেফটেন্যান্ট। আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ক্যাপ্টেন। তারপর একটা চেয়ারে বসে ছুঁড়ে মারল প্রশ্নটা :

'নাম কি তোমার?'

'রজার বিয়্যাম।'

'রাজার সশস্ত্র জাহাজ বাউন্টিতে মিডশিপম্যান ছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'বাউন্টির নাবিকদের ক'জন এখন তাহিতিতে আছে?'

'তিন জন, আমি যতদূর জানি, আমাকে ছাড়া।'

'নাম কি সেই তিন জনের?'

'জর্জ স্টুয়ার্ট, জোসেফ কোলম্যান আর রিচার্ড স্কিনার।'

'ফ্লেচার ক্রিশ্চিয়ান কোথায়? বাউন্টিই বা কোথায়?'

আটজন বিদ্রোহীসহ বাউন্টিতে করে ক্রিশ্চিয়ানের অজানার পথে চলে যাওয়ার কথা বললাম। তারপর থেকে এ পর্যন্ত তাহিতিতে যা যা ঘটেছে তা-ও বললাম। মরিসনের ছোট্ট একটা জাহাজ বানানো এবং তাতে করে মাত্র চারদিন আগে বাতাভিয়ার পথে রওনা হয়ে যাওয়ার কথাও বাদ দিলাম না।

'হুঁ, গল্প হিসেবে মন্দ নয় যাহোক,' গম্ভীর মুখে বলল ক্যাপ্টেন। 'তা তুমি কেন গেলে না ওদের সাথে?'

'ওইটুকুন জাহাজে ওরা অত দূরের পথ পাড়ি দিতে পারবে, আমার বিশ্বাস হয়নি।'

'হুঁ। কিন্তু শুনলে আশ্চর্য হবে—না কি দুঃখ পাবে?—ওর চেয়ে ছোট নৌকায় করে ক্যাপ্টেন ব্লাই তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে কুপ্যাঙ-এ পৌঁছেছিলেন; সেখান থেকে জাহাজে ইংল্যান্ডে।'

'সত্যিই, স্যার! ব্লাই ইংল্যান্ডে পৌঁছুতে পেরেছেন?—ওহ, কি খুশি যে লাগছে শুনে!'

'হুঁ, কিন্তু তারপর উনি যা করেছেন শুনলে আর লাগবে না। দেশে পৌঁছেই বিদ্রোহের কথা জানিয়েছেন অ্যাডমিরালটিকে। তোমার জঘন্য ভূমিকার কথাসুদ্ধ।'

'আমার ভূমিকা! আমার কোন ভূমিকা ওতে ছিল না, স্যার। আমি আপনার

এই জাহাজের নাবিকদের মতই নিরপরাধ!'

'মানে, ক্রিশ্চিয়ানের সঙ্গে জোট পাকিয়ে বাউন্টি দখলের ষড়যন্ত্র করেছিলে, একথা তুমি অস্বীকার করছ?'

'অবশ্যই, স্যার। এত কথা যখন জানেন তাহলে এটাও নিশ্চয়ই জানেন, ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের সাথে যাওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেকেই লঞ্চে জায়গা ছিল না বলে যেতে পারেনি। আমরা মোট ন'জন ছিলাম, যারা বিদ্রোহে অংশ নেইনি তবু কপাল দোষে থেকে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম জাহাজে। ব্লাই চিৎকার করে বলেছিলেন, আমাদের যেন সুবিচার হয় উনি দেখবেন। তাহলে কেন আমার সাথে...'

'যথেষ্ট হয়েছে।' আমাকে থামিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। 'যথাসময়েই ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের সঙ্গে দেখা হবে তোমার। তখন তাঁকেই জিজ্ঞেস কোরো, কেন। এখন বলো, কোথায় গেলে পাব বাউন্টিকে?'

'আমি যা জানি বলেছি, স্যার।'

'মানে বাউন্টি এখন কোথায় তুমি বলবে না? ঠিক আছে, আমার কথাটা তাহলে শুনে রাখো, আমি ওটা খুঁজে বের করব। এবং যে বদমাশরা ওটা নিয়ে গেছে তাদের হাজির করব বিচারকের সামনে। হ্যাঁ, শুনে রাখো, সে জন্যেই পাঠানো হয়েছে আমাকে।'

দ্রুত চিন্তা চলছে আমার মাথায়। কি করে এ সম্ভব? ব্লাই নিজের চোখে দেখেছেন আমি বিদ্রোহে অংশ নেইনি, আমি তাঁর সাথে যেতে চেয়েছি লঞ্চে—শুধু ব্লাই কেন, নেলসন, পার্সেল এবং আরও অনেকে দেখেছে। তার পরেও কি করে তিনি অ্যাডমিরালটিকে জানান বিদ্রোহে আমার ভূমিকা ছিল? ব্যাপারটা মস্ত এক ধাঁধার মত মনে হলো আমার কাছে। জানতে ইচ্ছে হলো, ব্লাইয়ের সঙ্গে যারা গিয়েছিল তাদের ক'জন কি অবস্থায় দেশে পৌঁছেছে। কিন্তু আমাকে প্রশ্ন করার কোন সুযোগ দিল না ক্যাপ্টেন। বলল, 'উঁহুঁ, তুমি নয়, প্রশ্ন করব আমি।' এক মুহূর্ত বিরতি নিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে ক্রিশ্চিয়ান কোথায় [redacted] বলবে না?'

'আমি যা জানি বলেছি, স্যার।'

লেফটেন্যান্ট এর দিকে ফিরল ক্যাপ্টেন।

'মিস্টার পার্কিন, লোকটাকে নিচে পাঠিয়ে দাও। আর খেয়াল রাখবে কারও সাথে যেন যোগাযোগ করতে না পারে...একটু দাঁড়াও। হেওয়ার্ডকে আসতে বলো একবার তার আগে।'

হেওয়ার্ড নামটা শুনে একটু যেন চমকালাম আমি। কিছুক্ষণ পর সে যখন কেবিনে ঢুকল, খুশিতে লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল! হ্যাঁ। আমাদের সেই টমাস হেওয়ার্ড, বাউন্টিতে যে আমার মেসমেট ছিল! হাত বাড়িয়ে আমি এগিয়ে গেলাম ওর দিকে। বিনিময়ে ওর চোখে ফুটে উঠল তাচ্ছিল্য। হাত দুটো পেছনে নিয়ে দু'পা পিছিয়ে গেল হেওয়ার্ড।

'এই লোককে চেনো তুমি, মিস্টার হেওয়ার্ড?'

'হ্যাঁ, স্যার। ও রজার বিয়্যাম। বাউন্টিতে মিডশিপম্যান ছিল।'

'ব্যস, এতেই চলবে,' বলল ক্যাপ্টেন।

তাচ্ছিল্যের চোখে আরেকবার আমার দিকে তাকিয়ে চলে গেল হেওয়ার্ড। এরপর রক্ষীরা আমাকে জাহাজের একেবারে নিচের ডেকে নিয়ে গেল। ভাঁড়ার ঘরের পাশে ছোট্ট একটা কুঠুরিতে আটকে রাখল শিকল দিয়ে বেঁধে। ঘণ্টাখানেক পর স্টুয়ার্ট, কোলম্যান আর স্কিনারকে আনা হলো। একই ভাবে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হলো ওদেরও।

চোদ্দ

পরের চারটে দিন ওই ছোট্ট অন্ধকার কুঠুরিতে আটকা রইলাম আমরা। একে বিষুবীয় আবহাওয়া, তার ওপর বদ্ধ কুঠুরি। অসহ্য গরমে প্রাণ দুর্বিষহ হয়ে উঠল। খাবার যা দেয়া হলো তা এক কথায় জঘন্য। ইংল্যান্ড থেকে প্যানডোরা যে শুকনো রুটি আর বিচ্ছিরি নোনা মাংস নিয়ে এসেছে তাই। ডাঙার তাজা খাবারের এক কণাও আমাদের দেয়া হলো না। ছোট্ট কুঠুরিটায় চার চারজন মানুষ আমরা হাত পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায়, দরজার কাছে সশস্ত্র রক্ষী। একটা কথা বলার উপায় নেই নিজেদের ভেতর। কথা বলতে গেলেই ধমকে থামিয়ে দেয় রক্ষীরা।

এইভাবে কাটল চার দিন। পঞ্চম দিন সকালে অতিরিক্ত একজন রক্ষী নিয়ে হাজির হলো কর্পোরাল। পায়ের শিকল খুলে আমাকে নিয়ে এল গান-ডেকের একটা কেবিনে। কেবিনটা প্যানডোরার সার্জন ডা. হ্যামিলটনের। আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন তিনি।

আমি কেবিনে ঢুকতেই রক্ষীদের বিদায় করে দিলেন ডাক্তার। তারপরই তাঁর চোখ পড়ল আমার হাতের হাত কড়ার ওপর। কর্পোরালকে ডাকলেন আবার। হাতকড়া খুলে দিতে বললেন।

'লেফটেন্যান্ট পার্কিনের নির্দেশ···' নিরাসক্ত কণ্ঠে শুরু করল কর্পোরাল।

'হয়েছে, আর বলতে হবে না,' বাধা দিলেন ডাক্তার হ্যামিলটন। 'খুলে নাও ওগুলো। আমি জামিন থাকছি এর।'

আর কিছু না বলে হাতকড়া দুটো খুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল কর্পোরাল। দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন সার্জন।

'সাবধান হলাম,' মৃদু হেসে তিনি বললেন। 'না, মিস্টার বিয়্যাম, তুমি পালানোর চেষ্টা করবে ভেবে নয়। আমি চাই না আমাদের আলাপে কেউ বাধা সৃষ্টি করুক। বসো।'

বছর চল্লিশেক বয়েস ভদ্রলোকের। স্বাস্থ্যবান। সৌম্য, সুদর্শন। গলার স্বরে অদ্ভুত এক কোমল ভাব। ওঁর কাপড় চোপড়ের বাক্সটার ওপর আমি বসলাম।

'প্রথমেই যেটা জানতে চাইব,' শুরু করলেন তিনি, 'তোমার অভিধানের

কাজ কতদূর? শেষ হয়েছে?'

'স্যার, এ ধরনের কাজ কি এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়? তবে অনেক দূর এগিয়েছি। তাহিতীয় ভাষার একটা ব্যাকরণও আমার সাধ্যমত তৈরি করেছি।...কিন্তু–আপনি এসব কথা জানলেন কি করে?'

'স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কস বলেছেন।'

'মানে–মানে আপনি স্যার জোসেফকে চেনেন!'

'আঁ–হ্যাঁ, খুব ঘনিষ্ঠভাবে নয় অবশ্য। নাম শুনেছি অনেক আগেই, পরিচয় হয়েছে আমরা রওনা হওয়ার ক'দিন আগে। তোমার সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা ওঁর।'

'তাহলে, স্যার, আপনি–আপনি নিশ্চয়ই বলতে পারবেন, এই বিদ্রোহের ব্যাপারটায় উনি আমাকে দোষী মনে করেন কিনা? আপনি, স্যার–আপনি নিজেও কি মনে করেন এমন একটা কাজে জড়ানোর মত পাগলামি আমি করব?'

'না, অন্তত তোমার চেহারা দেখে আমার তা মনে হয় না। আর স্যার জোসেফের কথা যদি বলো, তোমার বিরুদ্ধে যা যা বলা হয়েছে সব সত্ত্বেও উনি মনে করেন তুমি নির্দোষ।'

'অথচ দেখুন, আপনাদের ক্যাপ্টেন এমন ব্যবহার করছেন, যেন আমি পালের গোদাদেরই একজন।'

গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সার্জন আমার দিকে।

'এডওয়ার্ডসকে অবশ্য খুব একটা দোষ দেয়া যাবে না সেজন্যে,' বললেন তিনি।

'এডওয়ার্ডস?'

'প্যানডোরার ক্যাপ্টেন। বিদ্রোহীদের খুঁজে বের করে ধরে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ওকে।'

'কিন্তু আমি তো বিদ্রোহ...'

'হ্যাঁ, তোমার ধারণা তুমি বিদ্রোহ করোনি,' বাধা দিয়ে বললেন ডা. হ্যামিলটন, 'কিন্তু ব্লাইয়ের ধারণা–ধারণা নয় বিশ্বাস, তুমি শুধু বিদ্রোহই করোনি, বিদ্রোহ সংগঠনে গভীর ভাবে জড়িতও ছিলে। বাউন্টি যে সকালে দখল করা হয় তার আগের রাতে ক্যাপ্টেন ব্লাই নিজে ডেকে এসেছিলেন জানো?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি আর ক্রিশ্চিয়ান এক মনে কি যেন আলাপ করছিলে।'

'হ্যাঁ।'

'তোমাদের আলাপের শেষ অংশটা ব্লাই শুনতে পেয়েছিলেন। তুমি তখন ক্রিশ্চিয়ানকে বলছিলে, "আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন, স্যার।" জবাবে ক্রিশ্চিয়ান বলেছিল, "বেশ, তাহলে, এই কথা থাকল,"–তাই না?'

নির্বাক হয়ে রইলাম আমি কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললাম, 'ঠিক

এই কথাগুলো না হলেও এরকমই কিছু আমরা বলাবলি করছিলাম। কিন্তু–কিন্তু তার সাথে বিদ্রোহের তো কোন সম্পর্ক ছিল না।'

'ছিল না! তুমি নিজেই ভেবে দেখ, বিয়্যাম, বিদ্রোহের নেতার সঙ্গে এ ধরনের আলাপ, তা-ও বিদ্রোহের ঠিক আগের রাতে–যে-ই শুনবে তোমরা বিদ্রোহের ব্যাপারটা পাকাপাকি করেছিলে এছাড়া কিছু ভাববে?'

আমি এবার বিদ্রোহের ব্যাপারটা পুরোপুরি খুলে বললাম সার্জনকে। কিছুই বাদ দিলাম না। সে রাতে ক্রিশ্চিয়ানের সাথে আমার আলাপ থেকে শুরু করে আমাদের তাহিতিতে নামিয়ে দিয়ে আটজন সঙ্গী সহ ক্রিশ্চিয়ানের নিরুদ্দেশ যাত্রা পর্যন্ত সব মন দিয়ে শুনলেন ডা. হ্যামিলটন। তারপর বললেন, 'আমি বিশ্বাস করেছি তোমার কথা। তার প্রমাণ–,' হাত এগিয়ে দিলেন তিনি। আমি হাতটা ধরে গভীর আবেগে একটু ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিলাম। 'কিন্তু, বিয়্যাম, আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে তো কিছু আসবে যাবে না, বিশ্বাস করাতে হবে বিচারককে। বিচারকরা প্রমাণ ছাড়া কিছুই বিশ্বাস করেন না।'

'প্রমাণ তো আছে, স্যার। বললাম না, রবার্ট টিঙ্কলার শুনেছিল ক্রিশ্চিয়ানের সাথে আমার আলাপ। ও যদি সাক্ষী দেয়…'

'হ্যাঁ টিঙ্কলার, আমার মনে হয় ও সাক্ষী দেবে। ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের দলের সাথে ও-ও নিরাপদে পৌঁছেছে ইংল্যান্ডে। কিন্তু তারপরও কিছু সন্দেহ থেকে যাবে। ক্রিশ্চিয়ান যে ছোট্ট একটা ভেলায় চড়ে পালাতে চেয়েছিল তার প্রমাণ কি?'

'ক্রিশ্চিয়ান পালাতে চেয়েছিল কি না চেয়েছিল তার প্রমাণ কি আমার বিচারের জন্যে খুব জরুরী?'

'নিশ্চয়ই। তোমার সঙ্গে ওই আলাপের ব্যাপারটা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করতে হলে ক্রিশ্চিয়ান যে পালাতে চেয়েছিল তা-ও নিঃসংশয়ে প্রমাণ করতে হবে। ও যে পালাতে চেয়েছিল এ কথা তুমি ছাড়া আর কেউ জানে?'

'হ্যাঁ, জন নর্টন জানে। সে-ই ভেলা তৈরি করেছিল ক্রিশ্চিয়ানের জন্যে।'

টেবিলের দেরাজ খুলে একটা কাগজ বের করলেন সার্জন।

'ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের সঙ্গে যারা লঞ্চে উঠেছিল তাদের তালিকা এটা। ওদের মোট বারোজন ইংল্যান্ডে পৌঁছুতে পেরেছে' থেমে কাগজটার ওপর চোখ বুলালেন ডা. হ্যামিলটন। তারপর [redacted] নর্টন?…না নর্টন নেই ওদের ভেতর। এখানে বলা হয়েছে, তোফোয়া দ্বীপে জংলীদের হাতে মারা পড়েছে ও।'

নর্টন নেই শুনে দুঃখ পেলাম। কিন্তু যতটা দুঃখ পেলাম তার চেয়ে বেশি হলাম হতাশ। মিস্টার নেলসনও মারা গেছেন। কুপ্যাঙ-এ পৌঁছে কি এক অজানা রোগে পড়েছিলেন। উনি যদি থাকতেন, বিচারকদের সামনে বলতে পারতেন, সত্যিই আমি জাহাজ ছেড়ে লঞ্চে উঠতে চেয়েছিলাম। অর্থাৎ আমার পক্ষে সাক্ষী থাকল মোটে একজন–ওই টিঙ্কলার। ভীষণ হতাশ লাগতে লাগল আমার। কিন্তু ডা. হ্যামিলটন অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন:

'ভেঙে পোড়ো না, বিয়্যাম। এখন যেটা তোমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো মন শক্ত রাখা। দেখাই যাক না টিঙ্কলারের সাক্ষীতে কতটুকু কাজ হয়। এর ভেতর নিশ্চয়ই আরও কোন প্রমাণের কথা মনে পড়ে যাবে আমাদের। স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কস তোমার সপক্ষে সামান্যতম প্রমাণও যদি পাওয়া যায় হাজির করতে ছাড়বেন না আদালতের সামনে।'

শুনে সামান্য হলেও স্বস্তি পেলাম। এরপর ব্লাই ও তার সঙ্গীরা কি করে কুপ্যাঙ হয়ে ইংল্যান্ডে পৌঁছেছেন সংক্ষেপে সে গল্প শোনালেন হ্যামিলটন। প্রথমে ওঁরা তোফোয়া দ্বীপে গিয়েছিলেন পানি এবং খাবার দাবার সংগ্রহ করার জন্যে। সেখানে জংলীদের খপ্পরে পড়েন। পুরো দলটাই ধ্বংস হতে হতে বেঁচে যায় অল্পের জন্যে। নর্টন একাই কেবল মারা পড়ে। এরপর কঠোর পরিশ্রম আর কষ্ট ভোগ করে বিদ্রোহের সাতচল্লিশ দিন পর ওঁরা পৌঁছান ওলন্দাজ উপনিবেশ টিমোর-এর কুপ্যাঙ-এ। তারিখটা জুনের চোদ্দ। কুপ্যাঙ-এ পৌঁছানোর জন্যে কমপক্ষে বারোশো লিগ সাগর পথ পাড়ি দিতে হয়েছে ওঁদের। দু'মাস এখানে থেকে একটু সুস্থ হওয়ার পর ছোট একটা স্কুনারে করে বাতাভিয়ায় চলে আসেন তাঁরা। কুপ্যাঙ-এ মারা গিয়েছিলেন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ডেভিড নেলসন, বাতাভিয়ায় মারা যায় আরও তিন জন–এলফিনস্টোন, লেঙ্কলেটার আর টমাস হল। সহকারী সার্জন লেডওয়ার্ড স্বাস্থ্যগত কারণে বাতাভিয়ায় থেকে যায়, বাকিরা ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটা জাহাজে চড়ে দেশে ফেরে। পথে মারা যায় কসাই ল্যাম্ব। অর্থাৎ উনিশ জনের ভেতর ইংল্যান্ডে পৌঁছায় মাত্র বারোজন।

'রাতারাতি বীর হয়ে উঠলেন ব্লাই,' বলে চললেন ডা. হ্যামিলটন। 'হবেন না-ই বা কেন?–আমাদের নৌযাত্রার ইতিহাসে এমন খোলা নৌকায় সাগর পাড়ি দেয়ার কথা কেউ কোনদিন শোনেনি। সারাদেশ ব্লাইয়ের প্রসংশায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। সেটাই স্বাভাবিক, তাই না?–আর যারা বাউন্টিতে থেকে গিয়েছিল তাদের চিহ্নিত করা হলো জঘন্য অপরাধী হিসেবে।'

'কিন্তু, স্যার, বাউন্টিতে যারা থেকে গিয়েছিল তাদের অনেকে যে বাধ্য হয়েছিল থাকতে, তা মিস্টার ব্লাই বলেননি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না। ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডসকে যে নির্দেশপত্র অ্যাডমিরালটি দিয়েছে আমি সেটা পড়েছি। বাউন্টিতে যারা থেকে গিয়েছিল তাদের নামের একটা তালিকা আছে ওতে। বলা হয়েছে, তোমাদের সবাইকে বিদ্রোহী হিসেবে গণ্য করতে হবে।'

'তার মানে কি ইংল্যান্ডে না পৌঁছা পর্যন্ত যেখানে আছি সেখানেই থাকতে হবে আমাদের?'

'ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে এডওয়ার্ডস-এর ইচ্ছার ওপর। তবে আমি চেষ্টা করব তোমাদের যেন একটু ভাল কোন জায়গায় সরিয়ে নেয়া হয়।'

'একটা কথা, স্যার, যদি সম্ভব হয় ওঁকে একটু বলবেন যেন আমাদের কথা বলতে দেন নিজেদের ভেতর।'

'মানে! তোমাদের কথা বলতে দেয় না নাকি?'

'না, স্যার।'

'ঠিক আছে, চিন্তা কোরো না, আমি বলব। এবার আসল কথায় আসি আবার: তোমার পাণ্ডুলিপিটা নিশ্চয়ই তোমার বাড়িতে?'

'হ্যাঁ। আমার বন্ধু এবং শ্যালক তুয়াহুকে আমার নাম করে বললে আমার সিন্দুকটা ও জাহাজে পৌঁছে দিয়ে যাবে।'

এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিলেন ডা. হ্যামিলটন। 'নামটা লিখে দাও। আমি ওকে ঠিক খুঁজে বের করে ফেলব। স্যার জোসেফ বার বার আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তোমার পাণ্ডুলিপিটা যেন কোন ভাবেই নষ্ট না হয়।'

ঘড়ির দিকে তাকালেন সার্জন।

'এবার তোমাকে যেতে হবে। কিন্তু তার আগে–,' বলে তিনি উঠে গিয়ে দরজা খুলে কেবিনের বাইরে এপাশ ওপাশ দেখলেন একবার। তারপর আবার দরজা বন্ধ করে বললেন, 'স্যার জোসেফ আরেকটা দায়িত্ব দিয়েছেন আমাকে। বলেছেন, তোমাকে যদি খুঁজে পাই, এই চিঠিটা যেন দেই তোমাকে।'

হাত বাড়িয়ে নিলাম চিঠিটা। খাম খুলে হাতের লেখা দেখেই কেঁপে উঠল শরীর। মা লিখেছেন। মোটামুটি দীর্ঘ চিঠি, কিন্তু বক্তব্য মূলত একটাই; আমি যে নিরপরাধ তাতে কোন সন্দেহ নেই তাঁর মনে। এখন তাঁর একমাত্র চিন্তা, ধরা পড়ার পর বন্দী অবস্থায় দেশে ফেরার যে কষ্ট তা সইতে পারব তো? সব শেষে ধৈর্য ধরে মন প্রাণ দিয়ে ঈশ্বরকে ডাকার পরামর্শ দিয়ে শেষ করেছেন মা।

ঠিকই অনুমান করেছিলেন মা। এর পরের কয়েকটা মাসের কাহিনী অমানুষিক কষ্ট আর দুঃখ ভোগের কাহিনী। আমাদের যতভাবে সম্ভব কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করল প্যানডোরার ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডস আর তার দুই সহকারী লেফটেন্যান্ট পার্কিন এবং সেই কর্পোরাল। কি করে যে সে কষ্ট সহ্য করে ইংল্যান্ডে পৌঁছেছি, ভেবে এখন অবাক হই।

ডা. হ্যামিলটনের অনুরোধে অবশ্য আমাদের একে অন্যের সাথে আলাপ করার অনুমতি দিয়েছে ক্যাপ্টেন, তবে কথা বলতে হবে শুধু ইংরেজিতে। ইন্ডিয়ান ভাষায় যদি একটা শব্দও উচ্চারণ করি সুবিধাটুকু কেড়ে নেয়ার ভয় দেখিয়েছে সে।

কয়েকদিন পর নিজ চোখে আমাদের অবস্থা দেখতে এসে এডওয়ার্ডস-এর মনে হলো আমাদের হাত পায়ের বেড়িগুলো যথেষ্ট মজবুত নয়। সেদিনই বেড়িগুলো বদলে দেয়া হলো। আগের বেড়িগুলো একটু ঢিলে ঢালা ছিল; এবারেরগুলো হলো অনেক আঁটো। হাতের মাংস কেটে বসল প্রায়। আরও কয়েকদিন পর এক সকালে ডেকের ওপর শুরু হলো ঠকাস ঠকাস শব্দ। আমাদের খাবার দিতে আসে যে নাবিকটা তার নাম জেমস গুড। ডা. হ্যামিলটন ছাড়া প্যানডোরার এই একটা লোকের কাছে আমরা একটু সদয়

ব্যবহার পাই। কেন যে লোকটার মনে আমাদের সম্পর্কে সহানুভূতি জেগেছে জানি না। সে সেদিন দুপুরের খাবার দিতে এসে জানাল, ডেকের ওপর আমাদের থাকার জন্যে নতুন ঘর তৈরি হচ্ছে। ডা. হ্যামিলটনের পীড়াপীড়িতেই নাকি এটা করা হচ্ছে।

পরদিন বিকেল নাগাদ শেষ হলো ঘর তৈরির কাজ। সন্ধ্যার সময় আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে। এর পর আর যে ক'দিন প্যানডোরায় রইলাম এই নতুন কারাকক্ষে কাটলো। নিচের কুঠুরির চেয়ে কোন্ অংশে উন্নত নয় এটা, একটু বড় এই যা। বড় কেন, বুঝলাম দু'দিন পরেই যখন মরিসন, নরম্যান আর এলিসনকে এনে বেঁধে রাখা হলো আমাদের পাশে। আরও একটা ব্যাপার বুঝলাম, আমরা ধরা পড়ার পর এত দিনেও প্যানডোরা রওনা হয়নি কেন। কারণ একটাই, বাউন্টির বাকি নাবিকদের ধরার জন্যে অপেক্ষা করছে ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডস।

মরিসনের কাছে শুনলাম ওদের কাহিনী। তাহিতিরই অন্য এক অংশে থাকত ম্যাকইন্টশ, হিলব্রান্ডট আর মিলওয়ার্ড। জায়গাটার নাম পাপারা। মরিসন ওদের স্কুনার–যার নাম দিয়েছে ওরা 'রিজোল্যুশন'–নিয়ে গিয়েছিল পাপারায় ওই তিনজনকে তুলে নেয়ার জন্যে। ওখানে পৌঁছে আবহাওয়া ভাল দেখে অতিরিক্ত কিছু শুয়োরের মাংস নুন দিয়ে নেয়ার কথা ভাবে ওরা। এবং সে অনুযায়ী কাজ শুরু করে। বেশ কয়েকটা দিন লেগে যায় একাজে। অবশেষে ওরা যখন আবার রওনা হওয়ার জন্যে মোটামুটি তৈরি এই সময় জানতে পারে মাতাভাইয়ে প্যানডোরার আসার খবর। ভেবে চিন্তে কোন পদক্ষেপ নেয়ার আগেই নৌ-সেনা বোঝাই একটা লঞ্চ এসে দখল করে নেয় রিজোল্যুশন।

'নরম্যান আর আমি খুশিতে প্রায় নেচে উঠেছিলাম ইংরেজ উর্দী দেখে,' বলে চলল মরিসন। 'কিন্তু, অন্যদের কথা ভাবতেই সে খুশি আমাদের মিইয়ে গেল। ওদের সাবধান করার কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু সম্ভব হয়নি, তার আগেই ধরা পড়ে গেলাম।'

সেদিনই সন্ধ্যায় অন্যদেরও নিয়ে আসা হলো পাপারা থেকে। সাতজন ওরা–ম্যাকইন্টশ, হিলব্রান্ডট, বারকিট, মিলওয়ার্ড, সামনার, মুসপ্র্যাট আর প্রায়ান্ধ বায়র্ন। কাল যে কারাকক্ষ মনে হয়েছিল বড়, সেটা আর বড় রইল না।

মে'র প্রথম দিকে এক সকালে আমাকে আর স্টুয়ার্টকে পায়ের বাঁধন খুলে বের করে আনা হলো কারা প্রকোষ্ঠ থেকে। নিচের ডেকের যে কেবিনটাকে সিক বে হিসেবে ব্যবহার করা হয় সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। দরজার সামনে দেখলাম ডা. হ্যামিলটন অপেক্ষা করছেন। কোন কথা না বলে ভেতরে ঢোকার ইশারা করলেন আমাদের। ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর কি আশ্চর্য!–তেহানি আর পেগি বসে আছে। তেহানির কোলে আমাদের হেলেন, পেগির কোলে ওদের মেয়ে।

সোজা আমার কাছে এসে দাঁড়াল তেহানি। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল:

'শোনো, বিয়্যাম, কান্নাকাটি করার মত সময় আমার নেই। যা বলার তাড়াতাড়ি বলতে হবে। আতুয়ানুই এখন মাতাভাইয়ে। টাউতিরা থেকে তিনশো বাছাই করা যোদ্ধা সাথে নিয়ে এসেছে। ওরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে উপকূলের দু'দিকে অপেক্ষা করছে। অনেক দিন ধরে তোমার সাথে দেখা করার চেষ্টা করছি, কিন্তু সম্ভব হয়নি। অবশেষে ডাক্তারের চেষ্টায় সুযোগ পেয়েছি। আতুয়ানুই রাতের বেলা জাহাজ আক্রমণ করতে চায়। অন্ধকারে কামান দেগে আমাদের কোন ক্ষতি ওরা করতে পারবে না। আমাদের যেটা ভয়, জাহাজ দখল করার আগেই না তোমাদের মেরে ফেলে সৈন্যরা। ডেকের ওপর যে ঘরটা তৈরি করেছে ওতে তোমাদের রেখেছে, তাই না? শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে? কি ভাবে তোমাদের পাহারা দেয় ওরা জানতে চায় আতুয়ানুই।'

তেহানি আর ছোট্ট হেলেনকে দেখে খুশিতে এমন আত্মহারা হয়ে উঠেছি যে কিছুক্ষণ আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। হেলেনকে দু'হাতে তুলে নিয়ে জড়িয়ে ধরলাম বুকের সঙ্গে।

'বলো, বিয়্যাম, তাড়াতাড়ি,' তাড়া দিল তেহানি। 'বেশি কথা বলার সময় আমরা পাব না।'

'কবে তুমি মাতাভাই-এ এসেছ, তেহানি?'

'তুমি টাউতিরা থেকে আসার তিন দিন পর। ভেবেছিলে তোমাকে আমি ভুলে যাব? আতুয়ানুই আর আমি—দুজনে মিলে এই পরিকল্পনা করেছি। তোমার সব বন্ধু আমাদের সঙ্গে আছে। সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে আক্রমণ করার জন্যে।'

'আমাদের উদ্ধার করার কোন উপায় নেই, তেহানি,' আমি বললাম, 'আতুয়ানুইকে বুঝিয়ে বোলো কথাটা। ও আর ওর লোকরা সব মারা পড়বে খামোকা।'

'না, না, বিয়্যাম! ওরা গুলি চালানোর আগেই আমরা ওদের লাঠিপেটা করে মেরে ফেলব। আতুয়ানুই কাল রাতেই আক্রমণ করতে চায়। কাল চাঁদ থাকবে না।'

কেন আমাদের আটকে রাখা হয়েছে তেহানির কাছে তা ব্যাখ্যা করা অর্থহীন। ও কিছু বুঝবে না। যা-ও বা বোঝার সম্ভাবনা ছিল আমরাই তার গোড়া কেটে রেখেছি বিদ্রোহের ব্যাপারটা ওদের কাছে গোপন রেখে। ক্রিশ্চিয়ানকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম বিদ্রোহ সম্পর্কে কিছু জানাব না ইন্ডিয়ানদের। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি আমরা। কিন্তু এখন কি করে তেহানিকে বোঝাই ও আর আতুয়ানুই যে পরিকল্পনা করেছে তা পাগলামি?

'ক্যাপ্টেন এটুয়াটি (এডওয়ার্ডস) হিটিহিটিকে বলেছে,' বলে চলল তেহানি, 'তোমরা নাকি খারাপ লোক। তোমাদের ধরেছে ইংল্যান্ডে নিয়ে গিয়ে

শাস্তি দেবে বলে। হিটিহিটি বিশ্বাস করে না এসব আজেবাজে কথা। কেউই বিশ্বাস করে না।'

তেহানি আমাকে যা যা বলেছে ইতিমধ্যে পেগিও স্টুয়ার্টকে সে সব বলেছে। দেখে বুঝলাম আমার মত কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা স্টুয়ার্টেরও। দু'জনই চুপ করে আছি।

'কই, বিয়্যাম, বলো!' তাড়া লাগাল তেহানি।

'হ্যা বলো!' ওকে সমর্থন করল পেগি।

'দেখ, তেহানি, তোমরা যা ভাবছ তা অসম্ভব, এক কথায় পাগলামি,' অবশেষে আমি বললাম। 'জাহাজ যদি দখল করতেও পারো আমাদের বাঁচাতে পারবে না। আমাদের হাত-পা সব সময় শিকল দিয়ে বাঁধা থাকে। বন্দুক হাতে পাহারাদার দরজার মুখে দাঁড়িয়ে থাকে দিন রাত। তোমরা জাহাজে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ওরা আমাদের খুন করবে।'

'নিঃশব্দে আসব আমরা–' শুরু করল তেহানি।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'তাতে লাভ হবে না। তোমরা যে হামলা চালাতে পারো আগে থাকতেই আন্দাজ করেছে ক্যাপ্টেন এটুয়াটি,' (কথাটা সত্যি) 'তাই দিনরাত তীরের দিকে চোখ রাখার জন্যে কয়েক জনকে ডেকের ওপর রেখেছে সে।'

এতক্ষণ কোন মতে স্থির ছিল তেহানি আর পেগি। এর পর আর পারল না। কিছুই করার নেই বুঝতে পেরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল পেগি। স্টুয়ার্ট বৃথাই চেষ্টা করল ওকে শান্ত করার। তেহানি কাঁদল না। একটা শব্দও করল না। ধীরে ধীরে শুধু বসে পড়ল মেঝেতে আমার পায়ের কাছে। মুখটা দু'হাতে ঢাকা। পেগির মত ও-ও যদি কাঁদত আমার জন্যে অনেক সহজ হত কষ্ট সহ্য করা। আমার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসলাম। কিন্তু সান্ত্বনা দেয়ার মত কোন কথা খুঁজে পেলাম না।

একটু পরেই দরজা খুলে গেল। ডা. হ্যামিলটন ঢুকলেন, পেছনে রক্ষীরা। পেগি এবার হু-হু করে কেঁদে ফেলল স্টুয়ার্টকে জড়িয়ে ধরে। রীতিমত টানা হ্যাঁচড়া করতে হলো ওকে ছাড়ানোর জন্যে। বাচ্চাকে এক হাতে ধরে অন্য হাতে তেহানিকে ওঠালাম আমি। এক মুহূর্ত আমাকে জড়িয়ে ধরে রইল ও। তারপর পেগির হাত ধরে বেরিয়ে গেল কেবিন ছেড়ে। বাচ্চা কোলে ওদের পেছন পেছন এগোলাম আমি আর স্টুয়ার্ট। গ্যাঙওয়ের কাছে গিয়ে ভৃত্যদের হাতে তুলে দিলাম বাচ্চা দুটোকে। ওরা নেমে গেল ক্যানোয়। স্টুয়ার্ট তক্ষুণি ওকে কারাকক্ষে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করল। ওর অনুরোধ রাখল রক্ষীরা। আর আমাকে নিজের কেবিনে নিয়ে গেলেন ডা. হ্যামিলটন। জানালা দিয়ে দেখলাম, ধীরে ধীরে জাহাজ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ক্যানোটা। দাঁড় বাইছে তুয়াহু, টিপাউ আর পেগির বাবা। তেহানি আর পেগি বসে আছে ক্যানোর সামনের দিকে। এক দাসীর কোলে ওর বাচ্চা। আমার হেলেন তার মায়ের কোলে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম, ক্যানোটা ছোট হতে হতে অস্পষ্ট হয়ে

গেল। তারপর এক সময় হারিয়ে গেল তীরের কাছে জটলা করে থাকা অনেক ক্যানোর ভীড়ে।

পনেরো

পরের পুরো দিনটা জাহাজের নৌকাগুলো ব্যস্ত থাকল ডাঙা থেকে তাজা খাবার আনার কাজে। পরদিন ভোরে নোঙ্গর তুলে পাল উড়িয়ে দিল হিজ ম্যাজেস্টিজ শিপ প্যানডোরা।

বেশ কয়েক দিন কেটে যাওয়ার পর আমরা জানতে পারলাম, প্যানডোরা একা চলছে না, মরিসনের ছোট্ট স্কুনার রিজোল্যুশনকে সাথে নিয়ে চলেছে সে। প্যানডোরার মাস্টারের মেট মিস্টার অলিভারকে ওটার পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে এডওয়ার্ডস। সঙ্গে দিয়েছে একজন মিডশিপম্যান, একজন কোয়ার্টার মাস্টার আর ছ'জন খালাসী। প্যানডোরার সঙ্গে তাল মিলিয়ে, এগিয়ে চলেছে ছোট্ট জাহাজটা!

পরের তিনটে মাসে তাহিতির চারপাশের কয়েকশো মাইল সমুদ্র চষে ফেলল ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডস। কিন্তু পাওয়া গেল না বাউন্টিকে। ক্রিশ্চিয়ান বা তার সঙ্গীদেরও কোন খোঁজ পাওয়া গেল না আশপাশের দ্বীপগুলোয় খবর নিয়ে। হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন লোকগুলো।

এই খোঁজাখুঁজির ভেতর এক দুর্যোগময় রাতে হারিয়ে গেল রিজোল্যুশন। ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছিল সে রাতে। সামান্য ঝড়ও ছিল। এর ভেতর কখন যে কোনদিকে চলে গেল ওটা কেউ টের পায়নি। তিন চার দিন একটানা খুঁজেও আর তাকে পাওয়া গেল না। অবশেষে অগাস্টের দু'তারিখে ইংল্যান্ডের পথে রওনা হলো প্যানডোরা।

জেমস গুডের কাছে খবর পেলাম অস্ট্রেলিয়া ও নিউগিনির মাঝের এন্ডেভার প্রণালীর দিকে এগোচ্ছি আমরা।

সপ্তাহ তিনেকের ভেতর গ্রেট ব্যারিয়ার রীফ-এর উত্তর অংশে পৌঁছে গেল প্যানডোরা। এখানে সাগর ভীষণ বিপজ্জনক। চারদিকে ডুবো আধা ডুবো পাহাড়ের ছড়াছড়ি। সেগুলোয় বাধা পেয়ে ভয়ঙ্কর গর্জনে ভেঙে পড়ছে ঢেউ। এমন সাগরে জাহাজ যদি ঝড়ের কবলে পড়ে তাহলে আর রক্ষা নেই। নির্ঘাত ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেতে হবে। তারপর কি হবে একমাত্র ভবিতব্যই জানে।

আমাদের কপাল খারাপ বলতে হবে, অগাস্টের আটাশ তারিখ ভোর থেকেই জঘন্য আচরণ শুরু করল আবহাওয়া। এই শান্ত এই অশান্ত; এই রোদ, কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার মেঘ; তারপর হয় বৃষ্টি নয় ঝড়, তারপর আবার রোদ। সারাদিন চলল এরকম। জাহাজ বাঁচাতে কি অমানুষিক পরিশ্রম করতে হলো নাবিকদের বদ্ধ ঘরে বসে তা না দেখতে পেলেও অনুভব করলাম

ঠিকই।

দিনটা তো কোন মতে গেল, সন্ধ্যার পরেই ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে নেমে এল দুর্ভোগ। ঝড় উঠল আচমকা। তারপরই ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেলো প্যানডোরার তলা। আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম মেঝেতে। শিকল বাঁধা হাত আর পায়ে টান পড়ল ভয়ানক। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠলাম সবাই। কোন মতে সামলে উঠে বসতে না বসতেই আবার। এবার আগের চেয়ে জোরে। আটকে গেছে জাহাজ।

যেমন এসেছিল তেমনি আচমকা থেমে গেল ঝড়। একটু পরে ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডস-এর চিৎকার শুনতে পেলাম: 'কি অবস্থা, মিস্টার রবার্টস?'

'ভাল না, স্যার!' নিচ থেকে ভেসে এল রবার্টস-এর গলা। 'ভীষণ জোরে পানি উঠছে। এর মধ্যেই তিন ফুট জমে গেছে খোলে!'

তক্ষুণি অনবরত পানি সেঁচার নির্দেশ দিল ক্যাপ্টেন। আধ ঘণ্টা যেতে না যেতেই আবার দমকা হাওয়া। এবার আরও জোরে। মড় মড় করে উঠল প্যানডোরার কাঠামো। মৃদু একটা ধাক্কার মত অনুভব করলাম। ডেকের ওপর থেকে কেউ একজন চিৎকার করল: 'ছুটে গেছে, স্যার!'

হ্যাঁ, দুলুনি টের পাচ্ছি। ডুবো পাহাড় থেকে মুক্ত হয়েছে জাহাজ। ভোর পর্যন্ত আর কোন দুর্ঘটনা ঘটল না। কিন্তু দিনের প্রথম আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার ধাক্কা খেলো প্যানডোরা। একটু পরেই সমবেত কণ্ঠের আতঙ্কিত চিৎকার উঠল জাহাজ জুড়ে। বুঝলাম, ডুবছে প্যানডোরা। আতঙ্ক ভর করল আমাদের মধ্যেও। এখনই যদি মুক্ত না করে, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ইঁদুরের মত ডুবে মরব। মুসপ্র্যাট, বারকিট, হিলব্রান্ডট কেঁদে উঠল হাউমাউ করে। একটু পরেই প্যানডোরার মাস্টার অ্যাট আর্মসকে চাবি হাতে কারা-কুঠরিতে ঢুকতে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম আমরা।

বাইরে বেরিয়ে দেখি সবগুলো নৌকা নামানো হয়ে গেছে পানিতে। নাবিকদের অনেকে উঠে পড়েছে তাতে। জাহাজ থেকে বেশ খানিকটা দূরে নিয়ে গেছে তারা নৌকাগুলোকে, যেন জাহাজের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ডুবে না যায়, বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। সাগর এখনও অশান্ত, ঝড় চলছে। প্যানডোরার ডুবতে আর কয়েক মিনিটও লাগবে কিনা সন্দেহ। পানি পৌঁছে গেছে ওপরের ডেক পর্যন্ত। আমরাও ঝুপ ঝুপ করে লাফিয়ে পড়লাম সাগরে। শিকল খুলে নেয়া হলেও হাতকড়াগুলো খুলে দেয়া হয়নি। সেজন্যে সাঁতার কাটতে খুব কষ্ট হলো যদিও তবু শেষ পর্যন্ত একটা নৌকায় পৌঁছুতে পারলাম আমি। পেছনে ফিরে তাকানোর অবসর যখন পেলাম তখন আর প্যানডোরা নেই জলের ওপর। মাস্তুলের মাথাগুলো কেবল জেগে আছে তখনও। সেগুলো তলিয়ে গেল একটু পরেই।

তারপর আকাশ আবার পরিষ্কার, সাগর শান্ত। সূর্য বেরিয়ে এল মেঘের আড়াল থেকে। ছোট একটা বেলে চরার কাছে জড়ো হলো সবগুলো নৌকা। ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডস-এর নির্দেশে বেঁচে যাওয়া লোকদের হিসেব নিতে গিয়ে

দেখা গেল প্যানডোরার তিন জন নাবিক আর চারজন বন্দী মারা গেছে পানিতে ডুবে। বন্দী চারজন হলো: স্টুয়ার্ট, সামনার, হিলব্রান্ডট আর স্কিনার।

মরিসন আমাকে বলল, স্টুয়ার্টকে ও দেখেছে ডুবে যেতে। জাহাজটা যখন তলিয়ে যায় তখনও সে লাফ দিতে পারেনি। লাফ দেওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে, এই সময় ভারী একটা কাঠের টুকরো পানির নিচে থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে আঘাত করে ওর থুতনিতে। এক মুহূর্ত পরেই ও তলিয়ে যায় সাগরে। শুনে বুকের ভেতরটা কেমন যেন শূন্য হয়ে গেল আমার। তেহানি আর হেলেনকে ছেড়ে আসার সময় যেমন হয়েছিল অনেকটা তেমন।

বেলে চরাটায় নামলাম আমরা। ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডস নৌকার পাল এবং দাঁড় দিয়ে তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিল। এখানে দু'দিন রইলাম আমরা। এর ভেতর নৌকাগুলোকে দীর্ঘ যাত্রার জন্যে তৈরি করে ফেলল ছুতোর মিস্ত্রীরা। আমরা যারা বন্দী তাদের সঙ্গে বন্দীর মত আচরণ করা হচ্ছে আগের মতই। চরায় নামার পর পরই চার জন মাস্কেটধারীকে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে আমাদের পাহারা দেয়ার জন্যে। জাহাজ থেকে নামানোর সময় তাড়াহুড়োর ভেতর যতখানি সম্ভব খাবার এবং পানীয় ওঠানো হয়েছিল নৌকাগুলোয়। এই দু'দিনে তা থেকে এক কণাও খরচ করতে দিল না ক্যাপ্টেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা যখন অসহ্য হয়ে উঠল শামুক ঝিনুক যা পেলাম সৈকতে কুড়িয়ে খেয়ে নিলাম। যারা সহ্য করতে পারল, না খেয়ে রইল। ডা. হ্যামিলটন তাঁর ওষুধপত্রের বাক্সটা বাঁচাতে পেরেছেন। এজন্যে খুব খুশি তিনি। এক ফাঁকে আমাকে জানালেন, আমার পাণ্ডুলিপিগুলোও বাঁচাতে পেরেছেন।

অগাস্টের একত্রিশ তারিখ সকালে নৌকাগুলো পানিতে ভাসানো হলো আবার। ডাচ উপনিবেশ টিমোর-এর পথে রওনা হলাম আমরা।

অবর্ণনীয় দুঃখ আর কষ্ট ভোগ করে পনেরো সেপ্টেম্বর মাঝরাতে যখন আমরা টিমোর দ্বীপের কুপ্যাঙ-এ পৌঁছুলাম তখন আমাদের শরীরে হাড় আর চামড়া ছাড়া কিছু নেই। শরীর জুড়ে তৃষ্ণা। ক্ষুধার অনুভূতি লোপ পেয়েছে অনেক আগে।

পুরো উপনিবেশ তখন ঘুমিয়ে। রাতটা শান্ত। নক্ষত্র খচিত স্বচ্ছ আকাশ। কূলের যেখানে আমাদের নৌকা ঠেকেছে তার কাছেই নোঙ্গর করে আছে একটা জাহাজ আর দু'তিনটে ছোট ছোট জলযান। তীরের সামান্য ওপাশে একটা দুর্গ। তার উঁচু প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে করুণ সুরে আর্তনাদ করছে একটা কুকুর। আর কোন শব্দ নেই চরাচরে। নৌকার যেখানে যে যেমন ভাবে ছিলাম ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সূর্য অনেকখানি উঠে আসার আগে সে ঘুম কারও ভাঙল না।

ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডস আর তার সঙ্গীরা নিঃসন্দেহে উপভোগ করেছে কুপ্যাঙ-এর দিনগুলো। ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অতিথি হয়ে থেকেছে। বন্দীরাও আতিথেয়তা পেয়েছে, তবে একটু অন্য ধরনের। অবিলম্বে আমাদের দুর্গের

মাটির নিচের একটা কুঠুরিতে নিয়ে আটকানো হলো।

কুপ্যাঙ-এ যতদিন ছিলাম তার ভেতর একবারের জন্যেও এডওয়ার্ডস আমাদের দেখতে আসেনি। তবে ডা. হ্যামিলটন আমাদের ভোলেননি। প্রথম সপ্তাহটা তিনি প্যানডোরার অসুস্থদের সেবায় ব্যয় করলেন–যাদের বেশ কয়েকজন পৌঁছানোর কয়েক দিনের মধ্যেই মারা গেল। এরপর একটু অবসর পেতেই স্থানীয় ডাচ সার্জনকে সঙ্গে নিয়ে এলেন আমাদের দেখতে।

অক্টোবরের ছয় তারিখে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জাহাজ 'রেমব্যাঙ'-এ চাপলাম আমরা জাভা দ্বীপের বাতাভিয়ায় যাওয়ার জন্যে।

রেমব্যাঙ খুব পুরানো জাহাজ। খোলে অসংখ্য ফুটো। কাঠামোটাও নড়বড়ে। প্রথম দিন থেকেই অনবরত পানি সেঁচতে হলো তাকে ভাসিয়ে রাখার জন্যে। বলা বাহুল্য বন্দীদের দিয়েই করানো হলো কাজটা।

অক্টোবরের একত্রিশ তারিখে আমরা পৌঁছুলাম সামারাঙ-এ। এখানে থামার কথা না থাকলেও জাহাজ মেরামত করিয়ে নেয়ার জন্যে থামতে বাধ্য হলেন রেমব্যাঙ-এর ক্যাপ্টেন। কারণ শেষ দিকে পানি ওঠার পরিমাণ এত বেড়ে গিয়েছিল যে জাহাজের বেশির ভাগ নাবিককেই আমাদের সঙ্গে হাত লাগাতে হয়েছিল পানি সেঁচার কাজে।

সামারাঙ-এ পৌঁছে সবিস্ময়ে আমরা দেখলাম, মরিসনের স্কুনার রিজোল্যুশন অনেক আগেই সেখানে এসে বসে আছে। হারিয়ে যাওয়ার পর ওরাও খোঁজাখুঁজি করেছিল প্যানডোরাকে। না পেয়ে শেষে এখানে চলে এসেছে। অলিভার অর্থাৎ এডওয়ার্ডস যাকে রিজোল্যুশন-এর দায়িত্ব দিয়েছিল সে জানত দেশে ফেরার পথে প্যানডোরা সামারাঙ-এ থামবে, তাই অন্য কোথাও না গিয়ে এখানেই এসেছে।

সামারাঙ-এ রিজোল্যুশন বিক্রি করে দিল এডওয়ার্ডস। যে টাকা পেল তা ভাগ করে দিল প্যানডোরার নাবিকদের ভেতর পোশাক-আশাক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্যে। জাহাজটা যারা বানিয়েছিল তাদের এক শিলিংও দেয়া হলো না। টাকা না পেলেও অন্তত এই ভেবে ওরা সান্ত্বনা পেল যে, যে দক্ষতায় ওরা ছোট্ট স্কুনারটা তৈরি করেছিল তা ইংল্যান্ডের পেশাদার জাহাজ নির্মাতাদের চেয়ে কম নয় কোন অংশে।

রেমব্যাঙ-এর মেরামত শেষ হওয়ার পর আবার আমরা রওনা হলাম। নিরাপদেই পৌঁছুলাম বাতাভিয়ায়। এখানে চার ভাগে ভাগ হয়ে হল্যান্ড পর্যন্ত দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার জন্যে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চারটে জাহাজে উঠল প্যানডোরার নাবিকরা। লেফটেন্যান্ট পারকিন, মাস্টার, ভাণ্ডাররক্ষক, গোলন্দাজ, কেরানী, দু'জন মিডশিপম্যান আর বাউন্টির দশ বন্দীকে নিয়ে ভ্রিডেনবার্গ নামক জাহাজে উঠল ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডস। বাকিরা অন্য তিন জাহাজে। সতেরোশো বিরানব্বই-এর পনেরো জানুয়ারি উত্তমাশা অন্তরীপে পৌঁছুল ভ্রিডেনবার্গ। এইচ.এম.এস গরগন তখন অপেক্ষা করছে সেখানে, শিগগিরই ইংল্যান্ডের পথে রওনা হবে। সদলে এডওয়ার্ডস ভ্রিডেনবার্গ থেকে নেমে গরগনে উঠল।

প্রায় তিন মাস আমরা অন্তরীপে রইলাম। পুরো সময়টা অন্তরীণ থাকতে হলো গরগনে। জাহাজটার ক্যাপ্টেন মিস্টার গার্ডনার অভাবনীয় সদয় ব্যবহার করলেন আমাদের সাথে। চার হাত-পায়ের বদলে শুধু এক পায়ে বেড়ি পরিয়ে বেঁধে রাখলেন। পুরানো একটা পাল ভাঁজ করে দিলেন রাতে শোয়ার জন্যে। একটানা বারো মাস যারা খালি মেঝেতে কাটিয়েছে তাদের কাছে রীতিমত বিলাস মনে হলো ব্যাপারটা। জাহাজ যখন সাগরে ভাসল প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা করে ডেকের খোলা হাওয়ায় কাটানোরও অনুমতি দিলেন আমাদের ক্যাপ্টেন গার্ডনার। এসব দেখে মনে মনে জ্বললেও কিছু বলতে পারল না এডওয়ার্ডস, কারণ জাহাজটা তার নয়।

জুনের উনিশ তারিখে আমরা স্পিটহেড-এর অদূরে পৌঁছুলাম। সেদিনই সন্ধ্যার আগে পোর্টসমাউথ বন্দরে নোঙ্গর ফেলল গরগন। বাউন্টিতে চেপে যেদিন পোর্টসমাউথ থেকে রওনা হয়েছিলাম তারপর চারবছর ছ'মাস কেটে গেছে, এর ভেতর প্রায় পনেরো মাস আমরা কাটিয়েছি শিকল বাঁধা অবস্থায়।

ষোলো

পৌঁছানোর এক দিন পর অর্থাৎ একুশ জুন, সতেরোশো বিরানব্বই আমাদের সরিয়ে নেয়া হলো এইচ.এম. এস হেকটর নামক এক যুদ্ধ জাহাজের গান রুমে। সামরিক আদালতে বিচার শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত এখানেই থাকবে বন্দীরা।

হেকটরে ওঠার পর এক ঘণ্টাও পেরোয়নি। আমাকে ডেকে পাঠালেন জাহাজটার ক্যাপ্টেন মিস্টার মন্টাগু। রক্ষীকে বিদায় করে দিয়ে আমাকে বসতে বললেন। নানা বিষয়ে আলাপ করলেন কিছুক্ষণ। বিদ্রোহের প্রসঙ্গ একবারও তুললেন না। নিশ্চয়ই খোশ গল্প করার জন্যে আমাকে ডেকে পাঠাননি ভদ্রলোক। কিছু একটা কারণ আছে। কিন্তু কী, সেটা আন্দাজ করতে পারছি না। অবশেষে প্রায় আধঘণ্টা পর টেবিলের একটা দেরাজ খুলে একটা খাম বের করলেন ক্যাপ্টেন মন্টাগু। এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

'তোমার চিঠি,' বললেন তিনি। 'এখানে বসে পড়ো। আমি চলে যাচ্ছি। কেউ বিরক্ত করবে না তোমাকে। বার্থে ফেরার সময় হলে শুধু দরজা খুলে রক্ষীকে বলবে, পৌঁছে দেবে।'

বেরিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন মন্টাগু। কম্পিত হাতে আমি খুললাম চিঠিটা। স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কস্ লিখেছেন। তারিখ দেখলাম গরগন পোর্টসমাউথে পৌঁছানোর ক'দিন আগের। চিঠিটা পড়তে পড়তে সারা শরীর অবশ হয়ে এল আমার। ছোট্ট একটা খবর দিয়েছেন স্যার জোসেফ: ছ'সপ্তা আগে আমার মা মারা গেছেন। খবরটা তাঁকে জানিয়েছে আমাদের পুরানো কাজের মেয়ে

থ্যাকার। এরপর সান্ত্বনাসূচক কিছু কথা। খুব শিগগিরই আমার সাথে দেখা করতে আসবেন জানিয়ে চিঠি শেষ করেছেন তিনি।

চিঠিটা পড়ে একটা কথাই শুধু আমার মনে হলো, নিয়তির কি নির্মম পরিহাস! জীবনে মাত্র দু'জন নারীর ভালবাসা পেয়েছি, কিন্তু তাদের প্রয়োজন আমার জীবনে যখন সবচেয়ে বেশি তখনই দু'জনের একজনও নেই আমার পাশে। মা চিরতরে চলে গেছেন পৃথিবী ছেড়ে, স্ত্রী পড়ে আছে অর্ধেক পৃথিবী ওপাশে, জীবনে আর কোন দিন দেখা হবে কিনা, ওই নিয়তিই বলতে পারে। মা নেই, বোধহয় সে কারণেই, তেহানির কথা আরও বেশি করে মনে পড়তে লাগল আমার। আমার বাচ্চা–আমার হেলেন, আর কখনও কি ওকে দেখব?

কয়েক দিন পর এলেন স্যার জোসেফ। আগের মতই আছেন ভদ্রলোক। হাসিখুশি, সদালাপী। জানালেন মারা যাওয়ার মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে মা-কে তিনি দেখতে গিয়েছিলেন। কেমন দেখেছেন, কি কি কথা হয়েছে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বললেন। ইচ্ছে মত প্রশ্ন করার সুযোগ দিলেন আমাকে। একই প্রশ্ন বার বার করলাম (বেশ কয়েক বার এমন হলো) প্রত্যেক বারই ধৈর্যের সঙ্গে জবাব দিলেন তিনি। তারপর সম্ভবত আমার মনকে ভারমুক্ত করার জন্যেই কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। তাহিতীয় ভাষায় অভিধান ও ব্যাকরণের প্রসঙ্গ তুললেন। প্যানডোরা বিধ্বস্ত হলেও আমার পাণ্ডুলিপি খোয়া যায়নি শুনে তিনি একেবারে বাচ্চা ছেলের মত খুশি হয়ে উঠলেন।

'চমৎকার, বিয়্যাম! চমৎকার!' প্রায় চিৎকার করে বললেন স্যার জোসেফ। 'অন্তত একটা লাভ তাহলে হয়েছে বাউন্টিকে ওখানে পাঠিয়ে! কোথায় এখন ওগুলো?'

'প্যানডোরার সার্জন ডা. হ্যামিলটনের কাছে।'

'আচ্ছা! ভদ্রলোক ইংল্যান্ডে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি ওঁর সাথে দেখা করব। যাক এসব কথা। এবার তোমার বিদ্রোহের কাহিনী শোনাও–একেবারে গোড়া থেকে–খুঁটিনাটি কিছুই বাদ দেবে না।'

'ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের ভাষ্য আপনি শুনেছেন? আমাকে কি জঘন্য ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে ওতে জানেন?'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন তিনি। 'ব্লাই আমার বন্ধু। ওর চরিত্রের ভাল দিকগুলোর কথা যেমন জানি খারাপ দিকগুলোর কথাও তেমন জানি। ও একেবারে মন থেকে তোমাকে অপরাধী বলেছে। তা সত্ত্বেও আমি বলছি, আমি তোমাকে নির্দোষ বলেই ভাবি।'

'উনি কি এখন ইংল্যান্ডে আছেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না আবার ওকে তাহিতিতে পাঠানো হয়েছে। ওই একই কাজে।'

খবরটা শুনে দমে গেলাম আমি। কেন জানি না কিছুদিন ধরে আমার মনে হচ্ছিল, ওঁর সঙ্গে কথা বললে উনি আমার সম্পর্কে মত পাল্টাবেন; ক্রিশ্চিয়ানের সাথে সে রাতের আলাপটা যে সত্যি সত্যি বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র ছিল না তা উনি বুঝতে পারবেন। স্যার জোসেফকে বললাম সেকথা।

উনি বললেন, 'দেখ, ও নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই। যতই ভাবো না কেন, তোমার বিচার শুরু হওয়ার আগে দেশে ফিরছে না ব্লাই। তোমার কাহিনী শোনাও, বুঝে দেখি কি ভাবে তোমাকে সাহায্য করা যায়।'

ডা. হ্যামিলটনকে যেমন শুনিয়েছিলাম স্যার জোসেফকেও শোনালাম। আমাদের রওনা হওয়ার পর থেকে ধরা পড়া পর্যন্ত সব। শুনে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কস।

'বিয়্যাম, বাস্তব বাস্তবই,' অবশেষে তিনি বললেন, 'যত কঠোরই হোক না কেন বুকে সাহস নিয়ে তার মুখোমুখি হওয়া ভাল। মহাবিপদে পড়ে গেছ তুমি। ব্লাইয়ের সাথে তুমি লঞ্চে যেতে চেয়েছিলে কথাটা যে জানত সেই মিস্টার লেনসন মারা গেছে; বিদ্রোহের আগের রাতে ক্রিশ্চিয়ান পালাতে চেয়েছিল, তুমি ছাড়া আর যে জানত সেই নর্টনও মারা গেছে।'

'জানি, স্যার। ডা. হ্যামিলটনের কাছে শুনেছি।'

'এখন এক জনের সাক্ষ্যের ওপরই তোমার ভাগ্য নির্ভর করছে, সে হলো রবার্ট টিঙ্কলার। কিন্তু কোথায় সে?'

'যতদূর শুনেছি ও নিরাপদে ইংল্যান্ডে পৌঁছেছে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু কোথায় আছে? এক্ষুণি তাকে খুঁজে বের করা দরকার। বলছিলে, বাউন্টির মাস্টার ফ্রায়ারের শ্যালক ও?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'তাহলে বোধহয় ওর খবর আমি বের করতে পারব। অ্যাডমিরালটিতে খোঁজ নিলেই জানা যাবে ফ্রায়ার এখন কোন জাহাজে কাজ করছে। ঠিক আছে, তুমি চিন্তা কোরো না, আমি দেখছি কদ্দূর কি করা যায়।'

'ক'দিন লাগবে, স্যার, বিচার শুরু হতে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ঠিক নেই। ব্যাপারটা অ্যাডমিরালটির ওপর নির্ভর করছে। তবে আমার মনে হয় প্যানডোরার বাকি নাবিকরা পৌঁছে গেলেই শুরু করবে অ্যাডমিরালটি।'

চলে গেলেন স্যার জোসেফ। রাতের গাড়িতে লন্ডন ফিরে যাবেন তিনি।

পরদিনই, স্যার জোসেফের সুপারিশে কিনা জানি না, নতুন পোশাক দেয়া হলো আমাদের, যেন ভদ্র বেশে আদালতের সামনে উপস্থিত হতে পারি। হঠাৎ করে এই অপ্রত্যাশিত সদয় ব্যবহারটুকু পেয়ে আমাদের মনোবল অনেকখানি বেড়ে গেল।

দশ দিন পর একটা চিঠি এল স্যার জোসেফের কাছ থেকে। উনি লিখেছেন,

প্রিয় বিয়্যাম,

শুভেচ্ছা নিও। লন্ডনে ফিরে আমি অ্যাডমিরালটি অফিসে খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, ফ্রায়ার এখন ওর লন্ডনের বাড়িতে আছে। সামরিক আদালতের সমনের অপেক্ষা করছে। ওর সঙ্গে দেখা করে জানতে পারলাম, টিঙ্কলার ইংল্যান্ডে ফেরার কিছুদিনের ভেতরই 'ক্যারিব মেইড' নামক একটা

পশ্চিম ভারতীয় জাহাজে মাস্টারের মেট হিসেবে কাজ পায়।

বছর খানেক আগে প্রথম যাত্রা শেষে দেশে ফিরেছিল টিঙ্কলার। ক'দিন পরেই রওনা হয়ে গিয়েছিল আবার। মাস তিনেক আগে ফ্রায়ার খবর পেয়েছে, কিউবা দ্বীপের কাছে এক হারিকেনের কবলে পড়ে সব-নাবিক সমেত ডুবে গেছে ক্যারিব মেইড।

অস্বীকার করে লাভ নেই, ঘটনাটা তোমার জন্যে খুবই দুর্ভাগ্যজনক। তবু, তোমার অবস্থা আমার মনে হয় একেবারে হতাশাব্যঞ্জক নয়। ফ্রায়ারের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হয়েছে আমার। তোমার সম্পর্কে কোন রকম বিদ্বেষ দেখলাম না ওর মনে। ওর বিশ্বাস বিদ্রোহের ব্যাপারটায় তোমার কোন হাত ছিল না। আদালতের সামনে ও এই সাক্ষ্য দেবে; তাতে তোমার যথেষ্ট উপকার হবে বলে আমার ধারণা।

কোল, পার্সেল এবং পেকওভারের সাথেও আমি দেখা করেছি। ওদের সবারই দেখলাম খুব উঁচু ধারণা তোমার সম্পর্কে। পার্সেল বলল, তুমি নিজে নাকি ওকে বলেছিলে ব্লাইয়ের সঙ্গে তুমি লঞ্চে যেতে চাও। বাকি দু'জনও বলল, তুমি যে নির্দোষ এ ব্যাপারে তাদের মনে কোন সংশয় নেই।

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিস্টার গ্রাহামের সঙ্গে আমি দেখা করেছি। ভদ্রলোক নিউফাউন্ডল্যান্ড স্টেশনে বিভিন্ন অ্যাডমিরালের সচিব হিসেবে কাজ করেছেন গত বারো বছর। সেই সঙ্গে ওই সময়ের ভেতর যতগুলো সামরিক আদালত বসেছে প্রতিটিতে জাজ অ্যাডভোকেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আইনজীবী হিসেবে অত্যন্ত ভাল। উনি সানন্দে তোমার পক্ষে মামলা পরিচালনা করতে রাজি হয়েছেন।

সুতরাং আমার মনে হয় না ঘাবড়ানোর তেমন কিছু আছে তোমার। শেষ করার আগে একটা কথাই বলব, ভেঙে পোড়ো না। মনোবল অটুট রাখো। শিগগিরই আবার দেখা করব তোমার সাথে।

ইতি

জোসেফ ব্যাঙ্কস।

এই চিঠি পেয়ে আমার মনের অবস্থা কেমন হতে পারে সহজেই অনুমেয়। স্যার জোসেফ যতই বলুন ঘাবড়ানোর তেমন কিছু নেই, আমি কিন্তু না ঘাবড়ে পারলাম না। ফ্রায়ার, কোল বা পার্সেলের ধারণা বা বিশ্বাসে যে বিচারকদের মন গলবে না তা আমি জানি। যাহোক, তবু, মিস্টার গ্রাহামের মত মানুষ আমার উকিল হতে চেয়েছেন জেনে একটু স্বস্তি পেলাম মনে। মরিসন ঠিক করেছে নিজেই লড়বে নিজের হয়ে। কোলম্যান, নরম্যান, ম্যাকইন্টশ আর বায়ার্ন আশা করে ওরা বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে, তাই নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এক অফিসার ক্যাপ্টেন ম্যানলিকে যৌথভাবে উকিল নিয়োগ করেছে ওদের আত্মীয় স্বজনরা। বাকিদের স্বার্থ দেখার জন্যে সরকারের তরফ থেকেই নিযুক্ত করা হয়েছে অ্যাডমিরালটির এক অফিসার ক্যাপ্টেন বেনথামকে।

পরের সপ্তায় এঁদের প্রত্যেকেই একবার করে এলেন আমাদের কাছে।

উনি বললেন, 'দেখ, ও নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই। যতই ভাবো না কেন, তোমার বিচার শুরু হওয়ার আগে দেশে ফিরছে না ব্লাই। তোমার কাহিনী শোনাও, বুঝে দেখি কি ভাবে তোমাকে সাহায্য করা যায়।'

ডা. হ্যামিলটনকে যেমন শুনিয়েছিলাম স্যার জোসেফকেও শোনালাম। আমাদের রওনা হওয়ার পর থেকে ধরা পড়া পর্যন্ত সব। শুনে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কস।

'বিয়্যাম, বাস্তব বাস্তবই,' অবশেষে তিনি বললেন, 'যত কঠোরই হোক না কেন বুকে সাহস নিয়ে তার মুখোমুখি হওয়া ভাল। মহাবিপদে পড়ে গেছ তুমি। ব্লাইয়ের সাথে তুমি লঞ্চে যেতে চেয়েছিলে কথাটা যে জানত সেই মিস্টার লেনসন মারা গেছে; বিদ্রোহের আগের রাতে ক্রিশ্চিয়ান পালাতে চেয়েছিল, তুমি ছাড়া আর যে জানত সেই নর্টনও মারা গেছে।'

'জানি, স্যার। ডা. হ্যামিলটনের কাছে শুনেছি।'

'এখন এক জনের সাক্ষ্যের ওপরই তোমার ভাগ্য নির্ভর করছে, সে হলো রবার্ট টিঙ্কলার। কিন্তু কোথায় সে?'

'যতদূর শুনেছি ও নিরাপদে ইংল্যান্ডে পৌঁছেছে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু কোথায় আছে? এক্ষুণি তাকে খুঁজে বের করা দরকার। বলছিলে, বাউন্টির মাস্টার ফ্রায়ারের শ্যালক ও?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'তাহলে বোধহয় ওর খবর আমি বের করতে পারব। অ্যাডমিরালটিতে খোঁজ নিলেই জানা যাবে ফ্রায়ার এখন কোন জাহাজে কাজ করছে। ঠিক আছে, তুমি চিন্তা কোরো না, আমি দেখছি কদ্দূর কি করা যায়।'

'ক'দিন লাগবে, স্যার, বিচার শুরু হতে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ঠিক নেই। ব্যাপারটা অ্যাডমিরালটির ওপর নির্ভর করছে। তবে আমার মনে হয় প্যানডোরার বাকি নাবিকরা পৌঁছে গেলেই শুরু করবে অ্যাডমিরালটি।'

চলে গেলেন স্যার জোসেফ। রাতের গাড়িতে লন্ডন ফিরে যাবেন তিনি।

পরদিনই, স্যার জোসেফের সুপারিশে কিনা জানি না, নতুন পোশাক দেয়া হলো আমাদের, যেন ভদ্র বেশে আদালতের সামনে উপস্থিত হতে পারি। হঠাৎ করে এই অপ্রত্যাশিত সদয় ব্যবহারটুকু পেয়ে আমাদের মনোবল অনেকখানি বেড়ে গেল।

দশ দিন পর একটা চিঠি এল স্যার জোসেফের কাছ থেকে। উনি লিখেছেন,

প্রিয় বিয়্যাম,

শুভেচ্ছা নিও। লন্ডনে ফিরে আমি অ্যাডমিরালটি অফিসে খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, ফ্রায়ার এখন ওর লন্ডনের বাড়িতে আছে। সামরিক আদালতের সমনের অপেক্ষা করছে। ওর সঙ্গে দেখা করে জানতে পারলাম, টিঙ্কলার ইংল্যান্ডে ফেরার কিছুদিনের ভেতরই 'ক্যারিব মেইড' নামক একটা

পশ্চিম ভারতীয় জাহাজে মাস্টারের মেট হিসেবে কাজ পায়।

বছর খানেক আগে প্রথম যাত্রা শেষে দেশে ফিরেছিল টিঙ্কলার। ক'দিন পরেই রওনা হয়ে গিয়েছিল আবার। মাস তিনেক আগে ফ্রায়ার খবর পেয়েছে, কিউবা দ্বীপের কাছে এক হারিকেনের কবলে পড়ে সব নাবিক সমেত ডুবে গেছে ক্যারিব মেইড।

অস্বীকার করে লাভ নেই, ঘটনাটা তোমার জন্যে খুবই দুর্ভাগ্যজনক। তবু, তোমার অবস্থা আমার মনে হয় একেবারে হতাশাব্যঞ্জক নয়। ফ্রায়ারের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হয়েছে আমার। তোমার সম্পর্কে কোন রকম বিদ্বেষ দেখলাম না ওর মনে। ওর বিশ্বাস বিদ্রোহের ব্যাপারটায় তোমার কোন হাত ছিল না। আদালতের সামনে ও এই সাক্ষ্য দেবে; তাতে তোমার যথেষ্ট উপকার হবে বলে আমার ধারণা।

কোল, পার্সেল এবং পেকওভারের সাথেও আমি দেখা করেছি। ওদের সবারই দেখলাম খুব উঁচু ধারণা তোমার সম্পর্কে। পার্সেল বলল, তুমি নিজে নাকি ওকে বলেছিলে ব্লাইয়ের সঙ্গে তুমি লঞ্চে যেতে চাও। বাকি দু'জনও বলল, তুমি যে নির্দোষ এ ব্যাপারে তাদের মনে কোন সংশয় নেই।

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিস্টার গ্রাহামের সঙ্গে আমি দেখা করেছি। ভদ্রলোক নিউফাউন্ডল্যান্ড স্টেশনে বিভিন্ন অ্যাডমিরালের সচিব হিসেবে কাজ করেছেন গত বারো বছর। সেই সঙ্গে ওই সময়ের ভেতর যতগুলো সামরিক আদালত বসেছে প্রতিটিতে জাজ অ্যাডভোকেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আইনজীবী হিসেবে অত্যন্ত ভাল। উনি সানন্দে তোমার পক্ষে মামলা পরিচালনা করতে রাজি হয়েছেন।

সুতরাং আমার মনে হয় না ঘাবড়ানোর তেমন কিছু আছে তোমার। শেষ করার আগে একটা কথাই বলব, ভেঙে পোড়ো না। মনোবল অটুট রাখো। শিগগিরই আবার দেখা করব তোমার সাথে।

ইতি

জোসেফ ব্যাঙ্কস।

এই চিঠি পেয়ে আমার মনের অবস্থা কেমন হতে পারে সহজেই অনুমেয়। স্যার জোসেফ যতই বলুন ঘাবড়ানোর তেমন কিছু নেই, আমি কিন্তু না ঘাবড়ে পারলাম না। ফ্রায়ার, কোল বা পার্সেলের ধারণা বা বিশ্বাসে যে বিচারকদের মন গলবে না তা আমি জানি। যাহোক, তবু, মিস্টার গ্রাহামের মত মানুষ আমার উকিল হতে চেয়েছেন জেনে একটু স্বস্তি পেলাম মনে। মরিসন ঠিক করেছে নিজেই লড়বে নিজের হয়ে। কোলম্যান, নরম্যান, ম্যাকইন্টশ আর বায়ার্ন আশা করে ওরা বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে, তাই নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এক অফিসার ক্যাপ্টেন ম্যানলিকে যৌথভাবে উকিল নিয়োগ করেছে ওদের আত্মীয় স্বজনরা। বাকিদের স্বার্থ দেখার জন্যে সরকারের তরফ থেকেই নিযুক্ত করা হয়েছে অ্যাডমিরালটির এক অফিসার ক্যাপ্টেন বেনথামকে।

পরের সপ্তায় এঁদের প্রত্যেকেই একবার করে এলেন আমাদের কাছে।

প্রথমে এলেন মিস্টার গ্রাহাম। দীর্ঘ ঋজু শরীর ভদ্রলোকের। বছর পঞ্চাশেক বয়েস। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ। শান্ত, ভরাট কণ্ঠস্বর। গলা শুনেই লোকটার অন্তর পর্যন্ত যেন টের পাওয়া যায়। প্রথম দর্শনেই আমার মনে হলো যোগ্য লোকের হাতে পড়েছে আমার ভাগ্য। আমরা যারা বিচারাধীন তাদের কেউই সামরিক আদালতের কার্যবিধি সম্পর্কে কিছু জানি না। আমার অনুরোধে সবাইকে ইচ্ছে মত প্রশ্ন করার সুযোগ দিলেন তিনি।

'আমি, স্যার, নিজেই আমার মামলা পরিচালনা করব ঠিক করেছি,' মরিসন বলল। 'আইনের যে ধারায় আমাদের বিচার হবে সে ধারায় ঠিক কি বলা হয়েছে আমি জানতে চাই।'

'তোমাদের বিচার হবে "নৌযুদ্ধ আচরণ বিধি"র ১৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী,' বললেন মিস্টার গ্রাহাম। 'এই ধারায় বলা হয়েছে; "নৌবহরের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তি–সে অফিসার বা নাবিক যা-ই হোক না কেন, যদি কোন কারণে বিদ্রোহ বা বিদ্রোহাত্মক আচরণ করে, সামরিক আদালতে তার বিচার হবে। এবং আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।" '

'অন্য কোন শাস্তির ব্যবস্থা নেই?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'না। হয় বেকসুর খালাস অথবা দোষী প্রমাণিত হওয়া এবং মৃত্যুদণ্ড ভোগ করা।'

'কিন্তু, স্যার, ধরুন এমন অবস্থা হলো,' মরিসন বলল, 'একটা জাহাজে বিদ্রোহ হয়েছে, কিন্তু নাবিকদের একাংশ তাতে জড়িত তো নয়ই, সে সম্পর্কে জানতও না কিছু, তাদের কি হবে?'

'ওরা যদি বিদ্রোহীদের সাথে জাহাজেই থেকে যায়, আইন ওদের বিদ্রোহীদের সমান অপরাধে অপরাধী বলে গণ্য করবে। আমাদের সামরিক আইন এ ব্যাপারে সত্যিই খুব কড়া। নিরপেক্ষতার কোন অবকাশ এখানে নেই।'

'কিন্তু স্যার,' যোগ করল কোলম্যান, 'আমরা যারা ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের সঙ্গে লঞ্চে নেমে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু লঞ্চে জায়গা হয়নি বলে, বা বিদ্রোহীরা আটকে রেখেছিল বলে যেতে পারিনি, তাদের কি হবে?'

'এরকম পরিস্থিতি অবশ্যই বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে,' জবাব দিলেন মিস্টার গ্রাহাম। 'সত্যিই যদি তোমরা তেমন কোন কারণে বিদ্রোহীদের সাথে থেকে গিয়ে থাকো আর আদালতের সামনে তা প্রমাণ করতে পারো তাহলে তো আমি তোমাদের খালাস না পাওয়ার কোন কারণ দেখি না।'

'আমি একটা প্রশ্ন করব, স্যার?' এলিসন জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়ই।'

'আমি, স্যার, বিদ্রোহীদের একজন, যদিও যারা এর মূল উদ্যোক্তা তাদের সঙ্গে আমি ছিলাম না। অন্য সবার মত আমিও ক্যাপ্টেন ব্লাইকে পছন্দ করতাম না তাই বিদ্রোহীরা ওদের দলে যোগ দিতে বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি যোগ দিয়েছি। পরিণাম নিয়ে ভাবিনি। আসলে পরিণাম সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল

না আমার। আমার কোন আশা আছে?'

গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন মিস্টার গ্রাহাম। তারপর বললেন, 'এ সম্পর্কে কোন মতামত দেয়া এমুহূর্তে উচিত হবে না। প্রশ্নটার মীমাংসার ভার আদালতের ওপর ছেড়ে দেয়াই ভাল।'

এর পর আমার সাথে বিস্তারিত আলাপ করলেন মিস্টার গ্রাহাম। ডা. হ্যামিলটন আর স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কসকে যে কাহিনী শুনিয়েছি আর একবার তা শোনালাম। খুঁটিনাটি কিছু প্রশ্ন করলেন মিস্টার গ্রাহাম। তারপর বিদায় নিলেন। যাওয়ার আগে বলে গেলেন, যেন না ঘাবড়াই, আমাকে বাঁচানোর জন্যে সাধ্যমত উনি করবেন।

তারপর জুলাই চলে গেছে, গেছে অগাস্ট। এখনও আমাদের অপেক্ষার পালা শেষ হয়নি।

সতেরো

সেপ্টেম্বরের বারো তারিখ সকালে হেকটর থেকে এইচ.এম.এস. ডিউক-এ নিয়ে যাওয়া হলো আমাদের। সামরিক আদালত বসবে এই ডিউক-এর বড় কেবিনে।

বিশাল জাহাজ ডিউক। এর বড় কেবিনটাও তেমনি বিশাল। লম্বায় জাহাজের এমাথা ওমাথা, চওড়ায়ও এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত। আমরা যখন পৌঁছুলাম তখন মানুষে গিজগিজ করছে ডিউক-এর ডেক, কোয়ার্টার ডেক। বেশির ভাগই এ মুহূর্তে বন্দরে নোঙর করে থাকা যুদ্ধ জাহাজের অফিসার। পুরোদস্তুর ধরাচূড়া পরে আছে সবাই। অসামরিক লোকও আছে কিছু। তাঁদের ভেতর দেখলাম স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কসকে। ডা. হ্যামিলটনের সাথে আমার শেষ দেখা হয়েছিল উত্তমাশা অন্তরীপে। এতদিন পর আজ আবার তাঁকে দেখলাম, প্যানডোরার অন্যান্য অফিসারদের সাথে দাঁড়িয়ে আছেন এক ধারে। এডওয়ার্ডসকেও দেখলাম। শীতল নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখছে আমাদের।

ডেকের অন্য পাশে জড় হয়েছে বাউন্টির অফিসার নাবিকরা–যারা ব্লাইয়ের সঙ্গে ফিরে এসেছিল দেশে। মাস্টার মিস্টার ফ্রায়ার, সারেং কোল, ছুতোর মিস্ত্রী পার্সেল, গোলন্দাজ পেকওভার–গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে সব ক'জন। যখন শেষবার দেখেছিলাম ওদের তখনকার চেহারাটা ভেসে উঠল মনের পর্দায়। সেদিন আমরা কেউ কি ভেবেছিলাম, আবার আমাদের দেখা হবে, তা-ও আবার এমনি করে?

বিশাল কেবিনটার দরজা খুলে যেতেই সব গুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল। দর্শকরা ঢুকে একে একে বসে পড়ল তাদের জন্যে নির্দিষ্ট আসনে। তারপর রক্ষীদের পেছন পেছন ঢুকলাম আমরা–আসামীরা। রক্ষীদের ইশারায় দাঁড়িয়ে গেলাম

দরজার পাশে দেয়াল বরাবর। প্রথম দিনটা দাঁড়িয়েই কাটাতে হলো আমাদের। পরে অবশ্য গুনানী ও জেরার দৈর্ঘ্য বিবেচনা করে একটা বেঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

'ঠিক ন'টার সময় আবার খুলে গেল দরজা। বিচারকমণ্ডলীর আগমন সংবাদ ঘোষণা করল মাস্টার-অ্যাট-আর্মস। উঠে দাঁড়াল দর্শকরা। বিচারকমণ্ডলী আসন গ্রহণ করার পর আবার বসল তারা। বিচারকমণ্ডলীর সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন পোর্টসমাউথ বন্দরে মোতায়েন রাজকীয় নৌ-বহরের সর্বাধিনায়ক ভাইস অ্যাডমিরাল অভ দ্য ব্লু মাননীয় লর্ড হুড। সদস্য হিসেবে আছেন ক্যাপ্টেন স্যার অ্যান্ডরু স্নেপ হ্যামন্ড, ক্যাপ্টেন জন কলপয়জ, ক্যাপ্টেন স্যার জর্জ মন্টাগু (হেকটরের ক্যাপ্টেন), ক্যাপ্টেন স্যার রজার কার্টিস, ক্যাপ্টেন জন ব্যাথেলে, ক্যাপ্টেন স্যার অ্যান্ডরু স্নেপ ডগলাস, ক্যাপ্টেন জন টমাস ডাকওয়ার্থ, ক্যাপ্টেন জন নিকলসন ইঙ্গলফিল্ড, ক্যাপ্টেন জন নাইট, ক্যাপ্টেন আলবেমারলে বার্টি, ও ক্যাপ্টেন রিচার্ড গুডউইন কিটস।

এতগুলো দুঁদে লোককে এক সঙ্গে দেখে রীতিমত ভড়কে যাওয়ার অবস্থা আমার। ডা. হ্যামিলটনের কথাগুলো মনে পড়ে গেল: 'আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে তো কিছু আসবে যাবে না। বিশ্বাস করাতে হবে বিচারককে। বিচারক প্রমাণ ছাড়া কিছুই বিশ্বাস করেন না।'

শুরু হলো আদালতের কাজ।

'একে একে আমাদের নাম ডেকে আমাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ পড়ে শোনান হলো। তারপর পড়া হলো ব্লাইয়ের লিখিত জবানবন্দী, যেটা তিনি দিয়েছিলেন দেশে ফেরার পর পরই। আমার সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ানের সন্দেহজনক আলাপের কথা বর্ণনা করেছেন জবানবন্দীর একেবারে শেষ অনুচ্ছেদে।

ব্লাইয়ের জবানবন্দী পড়া শেষ হতেই আমি অনুভব করলাম, দর্শকদের—এবং বিচারকদেরও—বেশিরভাগের চোখ স্থির হয়ে আছে আমার ওপর। কারণটা বুঝতে অসুবিধা হলো না। বিদ্রোহের হোতা ক্রিশ্চিয়ানের ডান হাত মনে করছে সবাই আমাকে।

একটা ব্যাপার আমাকে ভীষণ অবাক করল: কোলম্যান, নরম্যান আর ম্যাকইন্টশ সম্পর্কে একটা শব্দ উচ্চারণ করেননি ব্লাই তাঁর জবানবন্দীতে। অথচ আমার বা আর সবার মত ব্লাইও জানতেন এই তিনজন তাঁর সাথে যেতে চেয়েছিল লঞ্চে, বিদ্রোহীদের বাধার কারণে পারেনি। ওরা নির্দোষ—অন্তত ওরা তাঁর সাথে আসতে চেয়েছিল এই কথাটা উল্লেখ করতে পারতেন তিনি জবানবন্দীতে। কেন যে এই নিরপরাধ লোকগুলোর ব্যাপারে ব্লাই মাথা ঘামাননি আজ পর্যন্ত আমি তার কারণ খুঁজে পাইনি।

যাহোক, এর পর ডাকা হলো বাউন্টির মাস্টার জন ফ্রায়ারকে। বিদ্রোহের দিন সকালে যেমন দেখেছিলাম এখনও তেমন আছে ফ্রায়ার। একটুও বদলায়নি। আদালতের নির্দেশে বাউন্টিতে বিদ্রোহ এবং তার পরের ঘটনাবলী

সম্পর্কে জবানবন্দী দিল সে। আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে, সম্ভবত কিছু তার জানা ছিল না বলেই, কিছু না বললেও কোলম্যান, নরম্যান আর ম্যাকইন্টশ যে ব্লাইয়ের সঙ্গে আসতে চেয়েছিল তা সে বলতে ভুলল না।

জবানবন্দী শেষে আদালত জেরা করল ফ্রায়ারকে। জেরার এক পর্যায়ে তাকে প্রশ্ন করা হলো:

'লঞ্চটা জলে নামাতে কত জন লোক দরকার হত?'

'জনা দশেক,' ফ্রায়ারের জবাব।

আদালত আবার প্রশ্ন করল, 'বিদ্রোহের দিন ওটা নামানোর সময় আসামীদের কেউ হাত লাগিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। মিস্টার বিয়্যাম, মিস্টার মরিসন, মিস্টার কোলম্যান, নরম্যান, ম্যাকইন্টশ সবাই হাত লাগিয়েছিল।'

'তুমি কি মনে করো, ওরা বিদ্রোহীদের সাহায্য করার জন্যে একাজ করেছিল, না ক্যাপ্টেন ব্লাইকে সাহায্য করার জন্যে?'

'আমার মনে হয় ওরা ক্যাপ্টেন ব্লাইকে সাহায্য করার জন্যেই একাজ করেছিল। প্রাণ বাঁচানোর একটা সুযোগ দিতে চেয়েছিল তাঁকে।'

আমি জড়িত এমন কোন বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন করল না আদালত ফ্রায়ারকে।

জেরা শেষ হওয়ার পর আসামীদের সুযোগ দেয়া হলো সাক্ষীকে প্রশ্ন করার। তিনটে প্রশ্ন করলাম আমি।

'আপনি যখন প্রথমবার ডেকে আসেন এবং ক্রিশ্চিয়ানের সাথে আমাকে আলাপ করতে দেখেন তখন কী বিষয়ে আমরা আলাপ করছিলাম, আপনি শুনেছিলেন?'

ফ্রায়ারের জবাব, 'না, মিস্টার বিয়্যাম। সে সময়...'

'আদালতকে সম্বোধন করে দেবে সব প্রশ্নের জবাব,' বাধা দিয়ে বললেন লর্ড হুড।

'জি,' বলে সভাপতির দিকে ফিরল ফ্রায়ার। 'না, কিছু শুনেছিলাম বলে আমার মনে পড়ছে না, মাননীয় আদালত।'

'আমি ক্রিশ্চিয়ানের দলে, আপনার মনে এমন বিশ্বাস জন্মানোর কোন কারণ কি ঘটেছিল?' আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন।

'না,' সোজা সাপ্টা জবাব ফ্রায়ারের।

'আমার শেষ প্রশ্ন, 'আপনাকে যদি জাহাজে থাকতে দেয়া হত, এবং কখনও জাহাজ পুনর্দখলের পরিকল্পনা করতেন, আমাকে কি দলে নেয়ার কথা ভাবতেন?'

'অবশ্যই ভাবতাম। আমার পরিকল্পনার কথা প্রথম যাদের কাছে প্রকাশ করতাম, মিস্টার বিয়্যাম হত তাদের অন্যতম।'

এখানে এসে আবার প্রশ্ন করল আদালত, 'তুমি বলছ, মিস্টার বিয়্যাম ক্রিশ্চিয়ানের দলে তোমার মনে এমন বিশ্বাস জন্মানোর কোন কারণ ঘটেনি।

কিন্তু তুমি যখন ডেকে এসে দেখলে ওর সাথে ক্রিশ্চিয়ান আলাপ করছে, তোমার মনে সন্দেহ জাগেনি?'

'না, কারণ সে সময় তার দলের নয় এমন অনেক লোকের সাথেই তাকে কথা বলতে দেখেছি।'

'বিদ্রোহের আগের রাতে তুমি যখন ডেকে চৌকিতে ছিলে, ক্রিশ্চিয়ান আর আসামী বিয়্যামকে এক সাথে দেখনি?'

'না, যতদূর আমার মনে পড়ে। আমার চৌকিতেই দায়িত্ব পালন করছিল মিস্টার বিয়্যাম। আমি যতক্ষণ ডেকে ছিলাম ও-ও ছিল। কিন্তু ওই সময়ের ভেতর ক্রিশ্চিয়ানকে একবারও ডেকে আসতে দেখিনি।'

'মিস্টার বিয়্যামের সঙ্গে সে সময় কথা বলেছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ, বেশ কয়েকবার।'

'ওকে কি চিন্তিত বা অস্থির লাগছিল?'

'একদম না।'

ফ্রায়ারের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করলাম আমি। কোন সন্দেহ নেই আদালতের সবাই বুঝতে পেরেছে ও আমাকে নিরপরাধ মনে করে।

মরিসন, এবং অন্য আসামীরা প্রশ্ন করল মাস্টারকে। তারপর জবানবন্দী দিতে ডাকা হলো সারেঙ মিস্টার কোলকে। ওর জবানবন্দী থেকে জানতে পারলাম, বিদ্রোহের দিন ভোরে ও আমাকে আর স্টুয়ার্টকে চার্চিলের পাহারায় বার্থে কাপড় পরতে দেখেছিল।

জবানবন্দীর পর আদালত এবং আসামীরা জেরা করল কোলকে। অবশেষে সেদিনের মত আদালত মুলতবী ঘোষণা করলেন সভাপতি। আবার আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো হেকটর-এর গান রুমে।

মিস্টার গ্রাহাম এলেন। আধ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে আলাপ করলেন আমার সাথে। আজকের জবানবন্দী ও সাক্ষ্য সমূহের বিচার বিশ্লেষণ করে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন পরের সাক্ষীদের কি কি প্রশ্ন করতে হবে। সব শেষে আমাকে হতাশ হতে বারণ করে বিদায় চাইলেন তিনি।

'আর একটা প্রশ্ন করতে চাই, স্যার,' আমি বললাম।

'নিশ্চয়ই। একটা কেন যত খুশি করো।'

'স্যার, মন থেকে আপনি আমাকে কি মনে করেন?–দোষী না নির্দোষ?'

'কোন রকম দ্বিধা ছাড়াই জবাব দিতে পারি প্রশ্নটার। আমি তোমাকে নির্দোষ মনে করি।'

পরদিন সকাল ন'টায় আবার শুরু হলো শুনানি।

বাউন্টির গোলন্দাজ পেকওভারকে ডাকা হলো প্রথমে। আগে জবানবন্দী দিল সে। তারপর শুরু হলো জেরা। আমার ব্যাপারে মাত্র দুটো প্রশ্ন করা হলো তাকে। বিদ্রোহের সকালে আমাকে দেখেছিল কিনা, আর আমি সে সময় কি করছিলাম। ঠিক ঠিক জবাব দিল পেকওভার। আদালতের জেরা শেষে

আসামীদের সুযোগ দেয়া হলো প্রশ্ন করার। মরিসন প্রথমে করল। ও যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে ছিল না, বরং লঞ্চে খাবার দাবার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র তুলে দেয়ার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তা বেশ ভাল ভাবে বের করে আনল পেকওভারের মুখ দিয়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার প্রশ্নগুলো বিশেষ কাজে লাগল না। আমার প্রশ্নের জবাবে পেকওভার জানাল, বিদ্রোহের আগের রাতে আমাকে আর ক্রিশ্চিয়ানকে ডেকের ওপর দেখেছে, কিন্তু আমাদের আলাপ সে শোনেনি। পরদিন বিদ্রোহের সময় মিস্টার নেলসনের সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছিল তা-ও সে শোনেনি।

এর পর ডাকা হলো ছুতোর মিস্ত্রী পার্সেলকে। জবানবন্দী শেষে আদালত তাকে প্রশ্ন করল:

'জবানবন্দীর এক পর্যায়ে তুমি বলেছ, মিস্টার বিয়্যামকে তুমি বলেছিলে যেন কাটারের বদলে লঞ্চটা দেয়ার অনুরোধ করে ক্রিশ্চিয়ানকে। কেন? কেন বিয়্যামকে বলেছিলে? ওকে বিদ্রোহীদের একজন ভেবেছিলে তাই?'

'না। আমি ওকে ক্রিশ্চিয়ানের বন্ধু বলে জানতাম, তাছাড়া ক্রিশ্চিয়ান আমাকে অপছন্দ করত, তাই আমার কথা শুনবে না মনে করে আমি বিয়্যামকে বলেছিলাম অনুরোধ করতে।'

'তোমার কি মনে হয় বিয়্যামের অনুরোধেই ক্রিশ্চিয়ান কাটারের বদলে লঞ্চ নামানোর নির্দেশ দিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। সেদিন যদি লঞ্চটা না দেয়া হত, আমরা কেউই বোধহয় আর ইংল্যান্ডের মুখ দেখতে পেতাম না।'

'বিয়্যাম ছাড়া আর কারও নাম বলতে পারো, যার সাথে ক্রিশ্চিয়ানের বন্ধুত্ব ছিল?'

'হ্যাঁ। মিস্টার ট্রুয়ার্ট। আর কারও নাম এ মুহূর্তে আমার মনে আসছে না।'

'তোমার কি মনে হয়, ঘনিষ্ঠতম বন্ধু বিয়্যামের কাছেও বিদ্রোহের পরিকল্পনার কথা গোপন রেখেছিল ক্রিশ্চিয়ান, এটা সম্ভব?'

একটু যেন ফাঁপরে পড়ল পার্সেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলল, 'সম্ভব। ক্রিশ্চিয়ানকে যতদূর জানি বন্ধুকে বিপদে ফেলার লোক ও নয়। ও নিশ্চয়ই জানত, যে কোন পরিস্থিতিতেই মিস্টার বিয়্যাম ক্যাপ্টেনের অনুগত থাকবে।'

আদালত এর পর প্রশ্ন করল, 'লঞ্চটাকে যখন জাহাজের পেছন দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় তখন বিয়্যাম কোথায় ছিল?'

'আমি জানি না। এর মাত্র কয়েক মিনিট আগে আমি ওকে ডেকে দেখেছিলাম, তখন ও আমাকে বলেছিল, ও ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের সাথে যাবে। আমার মনে হয় ও সে সময় কাপড় চোপড় আনার জন্যে নিচে মিডশিপম্যানদের বার্থে গিয়েছিল।'

'ওই সময় তুমি মরিসনকে দেখেছিলে?'

'না।'

'তোমার কি মনে হয়, ওরা লঞ্চে যেতে হবে এই ভয়ে নিচে পালিয়েছিল?'

'না, আমার তা মনে হয় না। নিশ্চয়ই ওদের বাধা দেয়া হয়েছিল ওপরে আসতে, আর সে জন্যে সময় মত এসে লঞ্চে উঠতে পারেনি দু'জনের একজনও।'

এরপর আসামীদের প্রশ্নের পালা।

'শেষ জন যখন লঞ্চে ওঠে,' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তখন লঞ্চটা কতখানি পানির ওপরে ছিল!'

'খুব বেশি হলে সাড়ে সাত ইঞ্চি।'

'আপনার কি মনে হয় সবার জীবন বিপন্ন না করে আর কারও পক্ষে ওতে ওঠা সম্ভব ছিল?'

'না, আর একজনকেও নেয়ার ক্ষমতা ছিল না লঞ্চটার। ক্যাপ্টেন ব্লাই নিজে মিনতি করে বলেছিলেন, আর কাউকে যেন না পাঠায় ক্রিশ্চিয়ান।'

এরপর সেদিনকার মত মুলতবী হয়ে গেল আদালত।

পরদিন চোদ্দ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, আবার শুরু হলো শুনানি। প্রথমেই জবানবন্দী দিল টমাস হেওয়ার্ড। ওর কাছ থেকে আমার উপকারে আসতে পারে এমন কোন তথ্য বেরোল না। হেওয়ার্ড-এর পর ডাকা হলো হ্যালেটকে। ওর কাছ থেকে আমার সম্পর্কে একটা তথ্যই আদালত জানতে পারল, বিদ্রোহের সময় আমার হাতে কোন অস্ত্র ছিল না। আমার লঞ্চে ওঠার ইচ্ছা, বা এ ব্যাপারে আমি কাউকে বা কেউ আমাকে কিছু বলেছিল কি না সে সম্পর্কে ও কিছু বলতে পারল না। তবে একটা মিথ্যে কথা বলে ও আমার প্রায় বারোটা বাজিয়ে দিল। বিদ্রোহের সময় আমার সঙ্গে নাকি কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন ক্যাপ্টেন ব্লাই, আমি তাঁর কথা না শুনে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে চলে গিয়েছিলাম। এই মিথ্যা কথাটা হ্যালেট কেন যে বলল তা আজও আমি ভেবে পাই না।

এরপর সেদিনকার মত মুলতবী হয়ে গেল আদালত। পরদিন থেকে শুরু হবে আসামীদের আত্মপক্ষ সমর্থন।

আঠারো

আসামীদের ভেতর আমি একমাত্র মিডশিপম্যান। তাই আমারই ডাক পড়ার কথা প্রথমে। কিন্তু পরদিন অর্থাৎ শনিবার সকালে মিস্টার গ্রাহামের পরামর্শে আমি আদালতের কাছে সময় চাইলাম সোমবার পর্যন্ত। আদালত আমার আবেদন মঞ্জুর করল।

প্রায় পুরো রোববার দিনটা আমি কাটালাম আমার কৌসুলি মিস্টার গ্রাহামের সাথে। অন্য আসামীদের পরামর্শদাতা ক্যাপ্টেন ম্যানলি আর ক্যাপ্টেন বেনথামও এলেন তাঁর সাথে। তিনটে দলে ভাগ হয়ে আমরা ছড়িয়ে পড়লাম হেকটর-এর গানরুমের বিভিন্ন কোণে।

আমার বক্তব্যের একটা খসড়া ইতোমধ্যে আমি তৈরি করে ফেলেছি। মিস্টার গ্রাহামের সহায়তায় এবার সেটা সংশোধন করতে লাগলাম। কিছু কথা বাদ দিয়ে, কিছু কথা জুড়ে নতুন করে তৈরি করা হলো জবানবন্দীটা। এরপর মিস্টার গ্রাহাম বলে দিলেন সাক্ষীদের কাকে কাকে আমি ডাকব এবং কি কি প্রশ্ন করব। হেওয়ার্ড তার জবানবন্দীতে বলেছে, বিদ্রোহের আগের রাতে সে জেগে ছিল এবং রাত দেড়টার সময় আমার বার্থে ফেরার আওয়াজ পেয়েছিল।

'এই কথাটা খুবই জরুরী তোমার জন্যে,' বললেন মিস্টার গ্রাহাম। 'তুমি বলছ, ওই সময় টিঙ্কলারও তোমার সাথে নিচে গিয়েছিল। তোমরা বিদায় নিয়েছিলে একে অপরের কাছ থেকে?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'তাহলে হেওয়ার্ড নিশ্চয়ই শুনেছিল তোমাদের কথা। ও যেন কথাটা স্বীকার করে, আমাদের দেখতে হবে। আমরা যদি প্রমাণ করতে পারি টিঙ্কলার তোমার সাথে ছিল তাহলে স্বাভাবিকভাবে এটাও প্রমাণ হয়ে যাবে ও তোমার আর ক্রিশ্চিয়ানের আলাপ শুনেছিল। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে তুমি ব্লাইয়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে–কথাটা কোথায় পেল হ্যালেট? আর কেউ তো এ কথা বলেনি।'

'কি করে বলবে? কথাটা যে ডাঁহা মিথ্যা।'

'আমারও তা-ই মনে হয়েছে, কিন্তু এই মিথ্যে কথাটা বলল কেন হ্যালেট? আচ্ছা, বিদ্রোহের সময় হ্যালেট আর হেওয়ার্ড কেমন আচরণ করছিল? শান্ত ছিল দু'জনই?'

'ঠিক, উল্টোটা, স্যার। দু'জনই ভয়ে কাঁপছিল। বার বার ক্রিশ্চিয়ানের কাছে মিনতি করছিল যেন লঞ্চে না পাঠানো হয় তাদের। শেষ পর্যন্ত যখন জোর করে লঞ্চে তুলে দেয়া হলো, দু'জনই কেঁদে উঠেছিল হাউমাউ করে।'

'ভালো। এই কথাটা তোমার বের করে আনতে হবে। হ্যালেট বা হেওয়ার্ড যদি স্বীকার না-ও করে, অন্যদের মুখ থেকে বের করে আনবে। সেজন্যে এই প্রশ্নগুলো করবে–' মিস্টার গ্রাহাম বলে গেলেন প্রশ্নগুলো। আমি লিখে নিলাম।

সন্ধ্যার সামান্য আগে উঠলেন মিস্টার গ্রাহাম। চলে যাওয়ার আগে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বক্তব্য তুমি নিজেই পড়ে শোনাতে চাও, না আমি পড়ে দেব তোমার হয়ে?'

'আপনিই বলুন কোনটা করলে ভাল হবে।'

'যদি মনে করো ঘাবড়ে যাবে না, তাহলে নিজেই পড়ো। তোমার কাহিনী তোমার মুখে শুনলে বিচারকদের মনে যেমন প্রতিক্রিয়া হবে অন্যের মুখে

শুনলে তেমন না-ও হতে পারে।'

সোমবার। সেপ্টেম্বর সতেরো।

ঠিক ন'টার সময় বসল আদালত এইচ.এম.এস ডিউক-এর বড় কেবিনে। বিচারক এবং দর্শকদের আসন গ্রহণের পর এক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর মাস্টার অ্যাট-আর্মস ডাকল, 'রজার বিয়্যাম, হাজির?'

উঠে লর্ড হুডের দিকে মুখ করে দাঁড়ালাম আমি।

'বিদ্রোহ ও দস্যুতার মাধ্যমে মহানুভব রাজার সশস্ত্র জাহাজ বাউন্টি দখলের অভিযোগ আনা হয়েছে তোমার বিরুদ্ধে। রাজসাক্ষীদের জবানবন্দী ও প্রশ্নোত্তর তুমি শুনেছ। এখন তোমার কোন বক্তব্য থাকলে শুনবে আদালত। তুমি তৈরি?'

'জি, স্যার।'

'তাহলে ডান হাত উঁচু করো।'

শপথ নিলাম আমি। তারপর তাকালাম স্যার জোসেফের দিকে। ভাবলাম তাঁর দৃষ্টি হয়তো একটু সাহস যোগাবে আমাকে। কিন্তু তিনি তখন দু'হাতে হাঁটু আঁকড়ে ধরে বসে আছেন, দৃষ্টি সোজা তাঁর সামনে। আমার দিকে তাকাতে যেন ভয় পাচ্ছেন তিনি। হঠাৎ কেমন এক আতঙ্ক ভর করল আমার মনে। ঘরের প্রতিটা চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে ভাবতেই অদ্ভুত এক কাঁপুনি অনুভব করলাম শরীরে। মুখগুলো ঝাপসা হয়ে এল আমার সামনে। তারপর, দূর থেকে ভেসে আসা অন্য মানুষের কণ্ঠস্বরের মত শুনতে পেলাম আমার গলা:

'মহামান্য আদালতের মাননীয় সভাপতি ও বিচারক মণ্ডলী, আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা অতি গুরুতর। আমি জানি এই অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে মানুষের মনে আতঙ্ক আর ঘৃণা ছাড়া অন্য কোন অনুভূতি জাগতে পারে না। তবু ভাগ্যের এমনই নির্মম লিখন, আমার বিরুদ্ধে উঠেছে এই অভিযোগ। আমি জানি আদালতে যে সব সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করা হয়েছে, সব আমার বিরুদ্ধে। আমাকে নিঃসংশয়ে নির্দোষ প্রমাণ করে এমন একটা কথাও বলা হয়নি। তবু মহান ঈশ্বর এবং মাননীয় বিচারক মণ্ডলীর সামনে আমি ঘোষণা করছি, আমি নির্দোষ। যে অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে আনা হয়েছে তা সর্বৈব ভিত্তিহীন।'

এ পর্যন্ত বলার পর একটু যেন সাহস ফিরে পেলাম আমি। দর্শকদের দিকে তাকালাম। তারপর মিস্টার গ্রাহামের পরামর্শ মত পড়ে গেলাম আমার লিখিত বক্তব্য। শেষ করলাম এই কথাগুলো দিয়ে:

'মাননীয় সভাপতি ও বিচারক মণ্ডলী, যে তিনজন মানুষের সাক্ষ্য নিঃসংশয়ে প্রমাণ করতে পারত, আমি সত্যি কথা বলছি তারা সবাই আজ মৃত। আমার জন্যে অত্যন্ত দুঃখজনক যদিও, তবু কথাটা সত্যি। তাই আমি শুধু এটুকুই বলব, অনুনয় করে বলব, বিশ্বাস করুন আমার কথা! আমার সুনাম

আমার কাছে আমার প্রাণের সমান। মাননীয় সভাপতি ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমার পরিস্থিতিটা বিবেচনা করুন দয়া করে। আমি আপনাদের দয়ার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি আমাকে?'

আমার কথাগুলো বিচারকদের মনে কি প্রভাব ফেলল তার কিছুই আন্দাজ করতে পারলাম না তাঁদের মুখ দেখে। ডা. হ্যামিলটনের বলা কথাগুলো মনে পড়ে গেল আবার: 'বিচারকরা প্রমাণ ছাড়া কিছুই বিশ্বাস করেন না!'

আমি কি কোন প্রমাণ হাজির করতে পেরেছি আমার বক্তব্যের সপক্ষে? ভীষণ হতাশ আর ক্লান্ত বোধ করতে লাগলাম আমি।

স্যার জোসেফের দিকে তাকালাম। এখন তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। দৃষ্টি দিয়েই যেন বুঝিয়ে দিতে চাইছেন: 'শাবাশ বেটা! মৃত্যুর কথা মনেও ঠাঁই দিও না!' ওঁর দৃষ্টি নতুন করে শক্তি যোগাল যেন আমার শরীরে।

'মহামান্য আদালত,' আমি বললাম, 'এবার কি আমি সাক্ষীদের আবার প্রশ্ন করার সুযোগ পাব?'

মাথা ঝাঁকালেন লর্ড হুড। মাস্টার-অ্যাট-আর্মস দরজার কাছে গিয়ে হাঁক ছাড়ল:

'জন ফ্রায়ার! এই দিকে!'

এল ফ্রায়ার। কাঠগড়ায় উঠে শপথ নিল। প্রশ্নের পালা শুরু করলাম আমি।

'কোন কারণে আপনি যদি জাহাজে থেকে যেতেন এবং জাহাজ দখলের পরিকল্পনা করতেন, আমাকে কি জানাতেন সেই পরিকল্পনার কথা?' (মিস্টার গ্রাহামের পরামর্শে আজ আবার করলাম প্রশ্নটা)।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ফ্রায়ার, 'জানাতাম। এবং প্রথম যাদের জানাতাম তাদের ভেতর থাকত ও।'

'লঞ্চ পানিতে নামানোর ব্যাপারে যারা সাহায্য করেছিল তাদের আপনি কি মনে করেন?—বিদ্রোহীদের সাহায্যকারী না ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের সাহায্যকারী?'

'যাদের হাতে অস্ত্র ছিল না, আমি মনে করি, তারা ব্লাইকে সাহায্য করছিল।'

'ক্যাপ্টেন ব্লাইসহ মোট কতজন উঠেছিল লঞ্চে?'

'উনিশ জন।'

'লঞ্চের কিনারা পানির কতখানি উপরে ছিল?'

'খুব বেশি হলে আট ইঞ্চি।'

'লঞ্চে কি আরও লোক উঠতে পারত?'

'না। উঠলে, আমার মনে হয় যারা আগেই উঠে পড়েছিল তাদের প্রাণ বিপন্ন হত।'

'বিদ্রোহের সময়টাতে একবারও আমার হাতে অস্ত্র দেখেছেন?'

'না।'

'বিদ্রোহের সময় ক্যাপ্টেন ব্লাই একবারও আমার সাথে কথা বলেছিলেন?'

'আমার জানা মতে না।'

'বিদ্রোহের সময় মিস্টার হেওয়ার্ডকে একবারও ডেকের ওপর দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ, বেশ ক'বার।'

'কি অবস্থায় ছিল ও? স্বাভাবিক, আতঙ্কিত নাকি দ্বিধাগ্রস্ত?'

'দ্বিধাগ্রস্ত তো বটেই, খানিকটা আতঙ্কিতও ছিল ও। জোর করে যখন লঞ্চে নামিয়ে দেয়া হয় তখন তো কেঁদেই ফেলেছিল।'

'সেই সকালে মিস্টার হ্যালেটকে দেখেছিলেন একবারও?'

'হ্যাঁ, বেশ কয়েক বার।'

'কি অবস্থায় ছিল ও?'

'হেওয়ার্ডের মত ভয়ে তটস্থ হয়ে ছিল। ও-ও কেঁদে ফেলেছিল লঞ্চে নামিয়ে দেয়ার সময়।'

'সাধারণ ভাবে বাউন্টিতে থাকাকালীন আমার আচরণ কেমন ছিল?'

'চমৎকার! সবাই ওকে খুব পছন্দ করত।'

এর পর আদালত প্রশ্ন করল, 'লঞ্চে টিমোরে যাওয়ার পথে বিদ্রোহের কথা কি প্রায়ই আলাপ করতে তোমরা?'

'না। সে সময় প্রাণ বাঁচাতেই এত বেশি ব্যস্ত থাকতে হত যে এসব কথা আলাপ করার সময়ই আমরা পেতাম না।'

'বিদ্রোহের আগের রাতে আসামী বিয়্যামের সাথে একটা বিশেষ ব্যাপারে আলাপ করেছিল ক্রিশ্চিয়ান। সেই আলাপের শেষটা শুনতে পেয়েছিল ব্লাই। এ সম্পর্কে ক্যাপ্টেন ব্লাই কখনও কিছু বলেনি তোমাদের?'

'বলেছে বলে মনে পড়ছে না।'

'আসামী বিয়্যাম সম্পর্কে কখনও কিছু বলতে শুনেছ ওকে?'

'হ্যাঁ, একাধিকবার।'

'কি বলেছিল মনে করতে পারো?'

'বিদ্রোহের দিনই, জাহাজ থেকে লঞ্চটা যখন দূরে সরে এসেছে, তখন তাঁকে মিস্টার বিয়্যাম সম্পর্কে এই কথাগুলো বলতে শুনেছিলাম: "ও একটা অকৃতজ্ঞ বদমাশ। ক্রিশ্চিয়ানের চেয়ে কোন অংশে কম না।" পরেও বেশ কয়েকবার একথা বলতে শুনেছি ওঁকে।'

'লঞ্চের কেউ বিয়্যামের সপক্ষে কিছু বলেনি?'

'হ্যাঁ, অন্যরা তো বলেছে, আমি নিজেও বলেছি। কিন্তু প্রতিবারই ক্যাপ্টেন ব্লাই ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছেন আমাদের।'

'ক্রিশ্চিয়ান আর বিয়্যামের ভেতর একটা বিশেষ আলাপ সম্পর্কে টিঙ্কলারকে কখনও কিছু বলতে শুনেছ?'

'না, তেমন কিছু আমার মনে পড়ছে না।'

'রবার্ট টিঙ্কলার কখনও বিয়্যামের সপক্ষে কিছু বলেছে ব্লাইকে?'

'হ্যাঁ। আমার মত ও-ও বিশ্বাস করত না, বিয়্যাম বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত

ছিল।'

'রবার্ট টিঙ্কলার তোমার শ্যালক?'

'হ্যাঁ।'

'ও সাগরে নিখোঁজ হয়েছে?'

'হ্যাঁ, সেরকম খবরই আমি পেয়েছি।'

'তোমার সঙ্গে ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের সম্পর্ক কেমন ছিল?—ঘনিষ্ঠ?'

'না। বরং উল্টোটাই বলা যেতে পারে।'

এর পর ডাকা হলো কোলকে। ফ্রায়ারকে আমি যে প্রশ্নগুলো করেছিলাম ওকেও সেগুলোই করলাম। ফ্রায়ারের মত একই জবাব দিল সে-ও। আদালতের প্রশ্নগুলোও প্রায় একই হলো, জবাবও এল এক।

এর পর কাঠগড়ায় উঠল পেকওভার। আমি প্রশ্ন করে নতুন কিছু বের করতে পারলাম না ওর কাছ থেকে। আদালত জেরা শুরু করল এর পর।

'বিদ্রোহের আগের রাতে ডেকের ওপর দায়িত্ব পালন করছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'সে সময় কোয়ার্টার মাস্টারদের একজন জন নর্টনের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল একবারও?'

প্রশ্নটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম আমি। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটার কথা একবারও মনে পড়েনি—না আমার না মিস্টার গ্রাহামের। নর্টনকে যদি কেউ সেরাতে ভেলা বানাতে দেখে থাকে আমার বক্তব্যের সপক্ষে, খুব জোরাল না হলেও, একটা প্রমাণ অন্তত পাওয়া যায়।

'হ্যাঁ, হয়েছিল,' জবাব দিল পেকওভার। 'রাত তখন প্রায় দুটো।'

'কেন দেখা হলো? ওর তো তখন ঘুমিয়ে থাকার কথা।'

'চরকিকলের কাছে হাতুড়ির শব্দ শুনে আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম ব্যাপার কি দেখতে। অন্ধকারে ভাল দেখতে পাইনি, কিন্তু বুঝতে পারি, কিছু একটা বানাচ্ছে নর্টন। কি, জিজ্ঞেস করায় ও জবাব দিয়েছিল, মুরগির খাঁচা মেরামত করছে।'

'সত্যিই মুরগির খাঁচা মেরামত করছিল কিনা তুমি জানো?'

'না। প্রথমত অন্ধকার ছিল, বিশেষ কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাছাড়া আমার মনে কোন সন্দেহ জাগেনি, সত্যিই ও মুরগির খাঁচা মেরামত করছে না অন্য কিছু করছে।'

'কেন সন্দেহ জাগল না? এ ধরনের কাজ ছুতোর মিস্ত্রী বা তার সহকারীদের করার কথা না?'

'হ্যাঁ, তবে আমাদের বাউন্টিতে ছুতোর মিস্ত্রীদের কাজের চাপ বাড়লে নর্টন প্রায়ই তাদের সাহায্য করত। সে কারণে আমার মনে কোন সন্দেহ জাগেনি।'

'তোমার কি মনে হয় ছোটখাট কোন ভেলা তৈরি করছিল কোয়ার্টার মাস্টার?'

'হতে পারে। আমি ঠিক জানি না।'

এর পর হেওয়ার্ডকে ডাকা হলো সাক্ষীর কাঠগড়ায়। কিন্তু আমার কোন প্রশ্নের জবাবেই ও স্বীকার করল না, বিদ্রোহের আগের রাতে টিঙ্কলার আর আমি এক সাথে নিচে নেমে বার্থে ঢুকেছিলাম।

হ্যালেটও ওর বক্তব্যে অটল রইল: বিদ্রোহের সময় একবার নাকি ব্লাইয়ের কথার উত্তরে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিলাম।

আমার মামলার সওয়াল জবাব শেষ হলো। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে এর পর ডাকা হলো মরিসনকে।

উনিশ

সেপ্টেম্বর আঠারো। মঙ্গলবার।

আজ রায় হবে বিচারের।

যথারীতি কাঁটায় কাঁটায় ন'টায় আদালত বসল। মাস্টার অ্যাট-আর্মস ডাকল, 'রজার বিয়্যাম!'

কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়ালাম আমি।

বিচারক মণ্ডলীর সভাপতি লর্ড হুড জিজ্ঞেস করলেন, 'আত্মপক্ষ সমর্থনে আর কিছু বলার আছে তোমার?'

'না, মাই লর্ড।'

একই প্রশ্ন করা হলো আমাদের প্রত্যেককে। প্রত্যেকেই এক জবাব দিলাম। এর পর কিছুক্ষণের জন্যে দর্শকদের বেরিয়ে যেতে বলা হলো কক্ষ থেকে। আমরা–আসামীরাও বেরিয়ে এলাম। ডিউক-এর ডেকের ওপর অপেক্ষা করতে লাগলাম সশস্ত্র রক্ষীদের পাহারায়।

সময় গড়িয়ে চলেছে। থম থম করছে আমাদের মুখ। নিচে কেবিনে বসে বারো জন মানুষ নির্ধারণ করছেন আমাদের ভাগ্য। দুরু দুরু করছে বুকের ভেতর। কি রায় দেবেন বিচারকরা?

অবশেষে বিশাল কেবিনটার দরজা খুলে গেল আবার। দর্শকরা ঢুকল প্রথমে। তারপর শুনতে পেলাম, আমার নাম ডাকা হচ্ছে। কেমন অদ্ভুত অপরিচিত মনে হলো নামটা, যেন জীবনে আর কখনও শুনিনি।

খোলা তলোয়ার হাতে এক লেফটেন্যান্ট আর বেওনেট লাগানো মাস্কেটধারী চার রক্ষীর সঙ্গে ঢুকলাম আমি। বিচারকদের দীর্ঘ টেবিলটার প্রান্তে নিয়ে গিয়ে ওরা দাঁড় করিয়ে দিল আমাকে। সভাপতি তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।

উঠে দাঁড়াল পুরো আদালত। নীরবে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করলেন আমাকে লর্ড হুড।

'রজার বিয়্যাম, তোমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সপক্ষে আদালতে

উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রদত্ত তোমার বক্তব্য শ্রবণ এবং বিচার বিশ্লেষণ করে আদালত এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, তোমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে। অতএব আদালত এই মর্মে রায় প্রদান করছে যে, কৃত অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তুমি গ্রেট বৃটেনের আইন অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে। গলায় ফাঁস পরিয়ে মহানুভব রাজার কোন যুদ্ধজাহাজে তোমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। কোন জাহাজে এবং কবে কখন দণ্ড কার্যকর করা হবে তা নির্ধারণ করবে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের মাননীয় লর্ড হাই অ্যাডমিরালের দপ্তরের দণ্ড কার্যকর-করণ বিষয়ক কমিশনার-পরিষদ।'

জানি আদালতের বক্তব্য শেষ, তবু আরও কিছু শোনার আশায় যেন দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। তারপর একটা কণ্ঠস্বর—কার আমি জানি না—বলল, 'আসামী এখন যেতে পারে।' রক্ষীদের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম আমি বিশাল কেবিনটা ছেড়ে। আমার সঙ্গীদের কাছে এসে দাঁড়ালাম।

মরিসন জিজ্ঞেস করল, 'কি, বিয়্যাম?'

'ফাঁসি হবে আমার!' শোনা মাত্র মরিসনের মুখের ভঙ্গি যে কেমন হলো, সে আমি জীবনে ভুলব না। অবশ্য বেশিক্ষণ আতঙ্কিত থাকার সুযোগ ও পেল না, ডাক পড়ল আদালতের সামনে।

একটু পরেই বেরিয়ে এল মরিসন। মুখটা ফ্যাকাসে, তবে এখন অনেক সুস্থ সে। আমার পাশে এসে মৃদু হেসে বলল, 'সুযোগ থাকতে থাকতেই জীবনটাকে উপভোগ করে নেয়া উচিত, বিয়্যাম।' একমুহূর্ত পরে যোগ করল, 'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আমার মা যেন এতদিনে মরে গিয়ে থাকে।'

এর পর গেল কোলম্যান। বেরিয়ে এল মুক্ত মানুষ হিসেবে। কোয়ার্টার ডেকের এক পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও। তারপর একে একে নরম্যান, ম্যাকইন্টশ, আর বায়ার্ন। ওরাও বেরিয়ে এল রক্ষী ছাড়া। তিন জনের মুখই উদ্ভাসিত হাসিতে।

বারকিট, এলিসন, মিলওয়ার্ড আর মুসপ্র্যাট দ্রুত গেল আর এল। চারজনকেই দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়েছে।

এরপর আবার ডাকা হলো মরিসন আর মুসপ্র্যাটকে। জানানো হলো, ওদের বিষয়টা মহানুভব রাজার বিবেচনার জন্যে পাঠানো হবে। রাজা যদি ক্ষমা করেন তাহলে মুক্তি পাবে ওরা।

আর বেশিক্ষণ আমাদের ডিউক-এর ডেকে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো না। ফিরিয়ে আনা হলো হেকটর-এর গান রুমে। এখান থেকেই সকালে বেরিয়েছিলাম দশজন, এখন ঢুকলাম ছ'জন।

স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কস দেখা করতে এলেন পরদিন বিকেলে। তাঁকে দেখেই অদ্ভুত এক স্বস্তি অনুভব করলাম আমি। দু'হাতে আমার হাত ধরে একটু চাপ দিলেন তিনি। তারপর পেছন ফিরে সঙ্গে আসা নাবিকের কাছ থেকে

মোটাসোটা একটা প্যাকেট নিয়ে খুলতে খুলতে বললেন:

'বোসো, বিয়্যাম, তোমার এক পুরানো সঙ্গী এবং বন্ধুকে নিয়ে এসেছি।' প্যাকেটটার দিকে ইশারা করলেন স্যার জোসেফ। 'বলো তো কি?'

বিস্মিত হয়ে আমি দেখলাম, প্যাকেটটা থেকে বেরোল আমার তাহিতীয় ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণের পাণ্ডুলিপি।

'তোমার পাণ্ডুলিপি পুরোটা আমি পড়েছি,' বলে চললেন স্যার সোজেফ। 'সত্যি কথা বলতে কি কাজটা এত ভাল করে করতে পারবে আমি ভাবতেও পারিনি। আমি যা চেয়েছিলাম ঠিক তা-ই তুমি করেছ। এখন বলো, এটাকে ছাপাখানায় দেওয়ার উপযোগী করে তুলতে আর কতটা সময় নেবে তুমি?'

'মানে, স্যার, আপনি বলতে চাইছেন আমি আরও কাজ করব এটার ওপর?'

'তুমি করতে চাও?'

চাই মানে! ফাঁসির দিন ক্ষণ ঠিক হওয়ার আগ পর্যন্ত ব্যস্ত থাকার জন্যে কিছু একটা কাজ ভীষণ দরকার আমার। সারা দিন শুয়ে বসে থেকে মৃত্যুর কথা ভাবার ভেতর আর যা-ই থাক স্বস্তি বা শান্তি নেই মোটেই। বললাম, 'খুব খুশি হব, স্যার, কাজটা শেষ করার সুযোগ পেলে। এটার গুরুত্ব নিয়ে আমি ভাবছি না, আমি ভাবছি···'

'তুমি না ভাবলেও কাজটা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ,' বাধা দিয়ে বললেন তিনি। 'অবশ্যই এটা শেষ করতে হবে। রয়্যাল সোসাইটি চায়, ছাপা বইটার শুরুতে একটা ভূমিকা থাকবে। সেই ভূমিকায় সাধারণ ভাবে আলোচিত হবে তাহিতীয় ভাষার মূল সূত্রগুলো; এবং ইউরোপীয় ভাষাগুলোর সঙ্গে তার সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য। রয়্যাল সোসাইটি ভূমিকাটা লেখার দায়িত্ব দিতে চাইছে আমাকে। কিন্তু, কি করে আমি লিখব? তাহিতীয় ভাষা সম্পর্কে আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত, ভাসা ভাসা। এই জ্ঞান নিয়ে এমন একটা প্রবন্ধ রচনা করা এক কথায় অসম্ভব। কেউ যদি এটা লিখতে পারে, সে তুমি।'

'আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি,' বললাম, 'অবশ্য যদি যথেষ্ট সময় হাতে···।'

'এক মাসের ভেতর পারবে?'

'আশা করি।'

'বেশ, পাবে তুমি এক মাস। অ্যাডমিরালটিতে আমার সামান্য প্রভাব আছে, সেটুকু খাটিয়ে আমি আদায় করে নেব সময়টা।'

এর পর আমার ফাঁসির আদেশ সম্পর্কে সসংকোচে সামান্য আলাপ করলেন স্যার জোসেফ। মূলত দুঃখ প্রকাশ করলেন। তারপর বিদায় নিলেন।

আমি কাজে ডুবে গেলাম আবার।

অক্টোবরের পঁচিশ তারিখ। এই নিয়ে চতুর্থ কি পঞ্চমবারের মত পড়ছি সদ্য সমাপ্ত ভূমিকাটা। করাঘাত হলো দরজায়। ধক করে উঠল বুকের ভেতর।

কপালে শীতল ঘাম জমে উঠতে শুরু করেছে। প্রবন্ধটা শেষ করার পর থেকে দরজায় কোন শব্দ হলেই এমন হচ্ছে আমার।

ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই, কি প্রশান্তি! ডা. হ্যামিলটন দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়। বিচারের রায় হলো যেদিন তার পর এই প্রথম দেখা আমাদের। শিগগিরই নিউফাউন্ডল্যান্ড-এ চলে যাচ্ছেন ডাক্তার। তাই শেষ বারের মত এসেছেন আমাকে বিদায় জানাতে।

অনেকক্ষণ কথা বললাম আমরা। প্যানডোরা, গ্রেট ব্যারিয়ার রীফে তার বিধ্বস্ত হওয়া, সেখান থেকে খোলা নৌকায় টিমোর-এ পৌঁছানো—সব প্রসঙ্গ এল, চলে গেল। অবশেষে ওঠার সময় হলো ডা: হ্যামিলটনের। আমার হাত ধরে সান্ত্বনাসূচক কিছু একটা বলার জন্যে সবে মুখ খুলেছেন, দড়াম করে খুলে গেল দরজা। হাঁপাতে হাঁপাতে ভেতরে ঢুকলেন স্যার জোসেফ।

'বিয়্যাম! বিয়্যাম!' কোন রকমে উচ্চারণ করলেন, তারপরই প্রবল আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল তাঁর।

আমি অনুভব করছি, বরফশীতল কিছু একটা যেন উঠে আসছে আমার বুকের ভেতর থেকে গলার কাছে। ডা. হ্যামিলটন তাকাতে লাগলেন একবার স্যার জোসেফের দিকে, একবার আমার দিকে।

'না···দাঁড়াও!' চিৎকার করে উঠলেন স্যার জোসেফ। 'তুমি যা ভাবছ তা না···একটু···একটু···' এক পা এগিয়ে দু'হাতে আমার কাঁধ ধরলেন তিনি। 'বিয়্যাম···বিয়্যাম···টিঙ্কলার বেঁচে আছে···ওকে পাওয়া গেছে···এ-মুহূর্তে ও লন্ডনেই আছে!'

'বোসো, বিয়্যাম,' ডা. হ্যামিলটন বললেন। কিন্তু তার কোন প্রয়োজন আসলে ছিল না। নিজের অজান্তেই আমি বসে পড়েছি মেঝেতে। আমার পা দুটো আর বইতে পারছিল না আমার ভার। ডা. হ্যামিলটন আমাকে উঠিয়ে বিছানায় বসিয়ে দিলেন। পকেট থেকে ব্র্যান্ডির ছোট একটা শিশি বের করে মুখ খুলে ধরিয়ে দিলেন আমার হাতে। বললেন, 'খাও।'

স্যার জোসেফ টেবিলের সামনে চেয়ারটায় বসে রুমাল দিয়ে কপাল মুছছেন।

'আমাকে এক চুমুক খাওয়ার অনুমতি দেবেন না, ডাক্তার?' বললেন তিনি।

'দুঃখিত, স্যার, একদম খেয়াল ছিল না,' বলে শিশিটা আমি এগিয়ে দিলাম তাঁর দিকে।

স্যার জোসেফ শিশিতে মুখ লাগিয়ে এক চুমুক খেয়ে বললেন, 'খাসা জিনিস, ডাক্তার। যে কাজের জন্যে তৈরি ঠিক সে কাজেই লাগল আজ।' আমার দিকে ফিরে যোগ করলেন, 'লন্ডন থেকে সোজা এখানে আসছি। কাল সকালে নাশতা করতে করতে টাইমস-এ চোখ বুলাচ্ছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল খবরটা। ছোট্ট খবর: স্যাফায়ার নামক একটা ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান জাহাজ বন্দরে নোঙ্গর ফেলেছে। হাভানার কাছে বিধ্বস্ত ক্যারিব মেইড-এর কয়েক জন

বেঁচে যাওয়া নাবিককে উদ্ধার করে এনেছে ওটা। নাশতা করা মাথায় উঠল আমার। ছুটলাম বন্দরে। গিয়ে দেখি মাল নামাচ্ছে স্যাফায়ার। ক্যারিব মেইড-এর নাবিকদের খোঁজ নিতে গিয়ে জানলাম, ওরা আগের দিন সন্ধ্যায়ই তীরে চলে এসেছে। খোঁজাখুঁজি করে বন্দরের কাছেই এক সরাইখানায় পেলাম ওদের। টিঙ্কলার নামের কেউ ওদের ভেতর আছে কিনা জিজ্ঞেস করতেই সরাই মালিক দেখিয়ে দিল এক লোককে। সে তখন দুলাভাই মানে ফ্রায়ারের বাসায় যাওয়ার জন্যে বেরোচ্ছে। কোন ওজর আপত্তিতে কান না দিয়ে ওকে আমার গাড়িতে তুলে সোজা নিয়ে গেলাম লর্ড হুডের কাছে। কপাল ভাল অ্যাডমিরাল শহরেই ছিলেন। সাড়ে দশটার সময় লর্ড হুড আর আমি টিঙ্কলারকে নিয়ে পৌঁছুলাম অ্যাডমিরালটিতে। ওখানে টিঙ্কলারের জবানবন্দী নেয়ার সব আইনগত ব্যবস্থা পাকা করে সোজা চলে এসেছি এখানে। যতদিন না টিঙ্কলারের জবানবন্দী নেয়া হচ্ছে ততদিন ও অ্যাডমিরালটির হেফাজতে থাকবে।'

আমি শুনলাম শুধু, জবাব দেয়ার মত কোন কথা খুঁজে পেলাম না।

'এখন কি নতুন করে বসবে সামরিক আদালত?' ডা. হ্যামিলটন জিজ্ঞেস করলেন।

'না, সেটা সম্ভব নয়। অ্যাডমিরালটির কমিশনাররাই শুনবে টিঙ্কলারের বক্তব্য। তারপর যুক্তিযুক্ত মনে হলে তাঁরা সামরিক আদালতের রায় অদলবদল করতে পারবেন। কমিশনারদের সে ক্ষমতা দিয়েছে আমাদের দেশের আইন।'

বিশ

অক্টোবরের ছাব্বিশ তারিখ সকালে টমাস বারকিট, জন মিলওয়ার্ড আর টমাস এলিসনকে নিয়ে যাওয়া হলো এইচ.এম.এস. ব্রানসউইক-এ ফাঁসি দেয়ার জন্যে। বাকিরা অর্থাৎ মরিসন, মুসপ্র্যাট আর আমি সবিস্ময়ে লক্ষ করলাম আমাদের নেয়া হলো না। খুশি হব না দুঃখ পাব বুঝতে পারলাম না। একবার ভাবলাম টিঙ্কলারের বক্তব্য শুনে আমাদের ব্যাপারটা বোধ হয় পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে। আবার মনে হলো, না, এক সঙ্গে ছ'জনকে ফাঁসি দেয়া অসুবিধাজনক বলে আমাদের রেখে গেছে। আজই আরও পরে অথবা কাল আমাদের দণ্ড কার্যকর করা হবে। তার মানে কমপক্ষে আরও কয়েক ঘণ্টা কাটাতে হবে মৃত্যুর সময় গুনে। মরিসন আর আমি পায়চারি শুরু করলাম। মনটাকে ব্যস্ত রাখার প্রাণান্ত চেষ্টায় ইন্ডিয়ান ভাষায় আমাদের তাহিতীয় বন্ধুদের সম্বন্ধে আলাপ করতে লাগলাম।

এগারোটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি, এই সময় ক্যাপ্টেন মন্টাগু এলেন। সঙ্গে এক লেফটেন্যান্ট। মৃদু হাসি দু'জনেরই মুখে। তড়াক করে

লাফিয়ে উঠতে চাইল কলজেটা। তাহলে কি···!

'জেম্‌স মরিসন, উইলিয়াম মুসপ্র্যাট,' ডাকলেন ক্যাপ্টেন মন্টাগু।

এগিয়ে গেল দু'জন। লেফটেন্যান্টের হাত থেকে এক টুকরো কাগজ নিয়ে ক্যাপ্টেন পড়লেন:

'অ্যাডমিরাল অভ দ্য ব্লু এবং মহানুভব রাজার সশস্ত্র জাহাজ বাউন্টিতে বিদ্রোহের ব্যাপারে তোমাদের দোষী সাব্যস্ত করে দণ্ড প্রদানকারী সামরিক আদালতের সভাপতি লর্ড হুড আদালতে উপস্থাপিত স্বাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে তোমাদের দোষী সাব্যস্ত করলেও বিদ্রোহকালীন কিছু বিশেষ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে তোমাদের মুক্তি দেওয়ার আন্তরিক আবেদন জানিয়েছিলেন মহানুভব রাজার কাছে। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে মহানুভব রাজা তোমাদের বেকসুর খালাস প্রদান করছেন।'

'রজার বিয়্যাম!'

দুই সাথীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি।

'গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের মহানুভব লর্ড হাই অ্যাডমিরালের দপ্তরের কমিশনার-পরিষদ মহানুভব রাজার সশস্ত্র জাহাজ বাউন্টির সাবেক মিডশিপম্যান রবার্ট টিঙ্কলারের জবানবন্দী ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে নিঃসংশয় হয়েছেন যে, যে অপরাধের দায়ে তোমার বিচার, দোষী সাব্যস্তকরণ ও দণ্ডাদেশ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে সে অপরাধে তুমি অপরাধী নও। অতএব মাননীয় লর্ডের কমিশনার-পরিষদ সামরিক আদালতের রায় বাতিল করে তোমাকে নির্দোষ ও বেকসুর খালাস ঘোষণা করছেন।'

এগিয়ে এসে আন্তরিকভাবে আমাদের প্রত্যেকের করমর্দন করলেন ক্যাপ্টেন মন্টাগু।

আমার মনে যে কত কথা এসে ভীড় করছে! কিন্তু বলার সময়, 'ধন্যবাদ, স্যার,' ছাড়া আর কিছু বলতে পারলাম না।

মরিসন বলল, 'আমার রাজার করুণা আমাকে মুক্তি দিয়েছে। মহানুভবের সেবায় আমি আমার আগামী দিনগুলো উৎসর্গ করব। লর্ড হুডের প্রতিও কৃতজ্ঞ থাকব আজীবন।'

মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন মন্টাগু। এরপর আমি প্রশ্ন করলাম, 'আমরা এখন মুক্ত, স্যার? মানে যেখানে খুশি যেতে পারব?' সন্দেহের সুর আমার গলায়।

'হ্যাঁ।' লেফটেন্যান্টের দিকে ফিরলেন ক্যাপ্টেন। 'কানিংহ্যাম, দেখ তো, এই ভদ্রলোকদের জন্যে একটা নৌকার ব্যবস্থা করা যায় কি না এক্ষুণি।'

ক্যাপ্টেন মন্টাগুর সঙ্গে আমরা ওপরে উঠে এলাম। কয়েক মিনিটের ভেতর লেফটেন্যান্ট কানিংহ্যাম এসে জানাল নৌকা তৈরি। বিদায় নেয়ার মুহূর্তে ক্যাপ্টেন মন্টাগু আমাকে বললেন, 'আশা করি শিগগিরই আমাদের আবার দেখা হবে, মিস্টার বিয়্যাম।'

নেমে এলাম নৌকায়! দাঁড় টানতে শুরু করল নাবিকরা।

কতদিন পর আমরা মুক্ত মানুষ হিসেবে মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিচ্ছি! কিন্তু আমাদের মনের অবস্থা তখন মুক্তির আনন্দ উপভোগ করার মত নয়। মাত্র দুশো গজেরও কম দূরে নোঙ্গর করে আছে এইচ.এম.এস ব্রানসউইক। ওটার ওপরের ডেকে অপেক্ষা করছে মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে পৌঁছানো তিন জন মানুষ, আমাদেরই তিন সাথী। আর কয়েক মিনিটের ভেতর ফাঁসির দড়ি এ পৃথিবীর ধরা ছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যাবে মিলওয়ার্ড, বারকিট আর এলিসনকে।

হেকটর থেকে নেমে আসার আগে ক্যাপ্টেন মন্টাগু একটা চিঠি দিয়েছিলেন আমাকে। স্যার জোসেফের লেখা। কমিশনার-পরিষদের সিদ্ধান্ত জানার পরপরই অ্যাডমিরালটি দপ্তরে বসে তাড়াহুড়ো করে লিখেছেন। এতক্ষণে পড়ার সুযোগ পেলাম চিঠিটা। স্যার জোসেফ লিখেছেন, লন্ডনগামী রাতের কোচে তিনটে আসন তিনি ভাড়া করে রেখেছেন আমাদের তিনজনের জন্যে। পুনশ্চ দিয়ে লিখেছেন: 'মিস্টার এর্সকাইন আশা করে আছেন, তুমি তাঁর বাড়িতে উঠবে। আমার মনে হয় না বুড়ো মানুষটাকে আশাহত করা উচিত হবে তোমার। বিক্ষিপ্ত মনটা একটু শান্ত হলেই আমাকে খবর দিও। জরুরী একটা ব্যাপারে আমি তোমার সাথে আলাপ করতে চাই।'

পরদিন সকালে লন্ডন কোচ স্টেশনে নেমেই একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম আমরা। মরিসন আর মুসপ্র্যাট রওনা হয়ে গেল যার যার বাড়ির পথে। আমি রওনা হলাম ফিগ ট্রি কোর্টে মিস্টার এর্সকাইন-এর বাড়ির দিকে।

মিস্টার এর্সকাইন আমার প্রয়াত বাবার বন্ধু এবং আমাদের পারিবারিক আইন উপদেষ্টা। একটা সপ্তাহ কাটিয়ে দিলাম তাঁর বাড়িতে। তার পর খবর পাঠালাম স্যার জোসেফের কাছে। জবাব এল কয়েক ঘণ্টার ভেতর। রাতে তাঁর সাথে খাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আমাকে স্যার জোসেফ।

সন্ধ্যার পর পৌঁছুলাম তাঁর বাড়িতে। দেখলাম আমি একা নই, হেকটরের ক্যাপ্টেন স্যার মন্টাগুও নিমন্ত্রণ পেয়েছেন। ইউরোপের বর্তমান পরিস্থিতি, রাজনৈতিক ঘটনাবলী কোন দিকে মোড় নিচ্ছে বা নিতে যাচ্ছে এসব ব্যাপারে কিছুক্ষণ আলাপ করলাম আমরা। করলাম না বলে বলা উচিত স্যার জোসেফ আর স্যার মন্টাগুই করলেন, আমি শুনলাম। ওঁদের কথাবার্তা শুনে আমার মনে হলো, খুব শিগগিরই যুদ্ধ বাধতে যাচ্ছে ইউরোপে। অবশ্য তাতে কিছু এসে যায় না আমার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি ফিরে যাব তাহিতিতে—আমার হেলেনের কাছে, আমার তেহানির কাছে। সুতরাং ইউরোপ এখন রসাতলে গেলেও আমার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই।

ইউরোপ প্রসঙ্গ শেষ হতেই স্যার জোসেফ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি করবে তুমি, কিছু ভেবেছ, বিয়্যাম? নৌবাহিনীতে ফিরে আসবে না অক্সফোর্ডে যাবে আবার?'

'কোনটাই না, স্যার,' আমি জবাব দিলাম। 'ঠিক করেছি আমি

তাহিতিতেই ফিরে যাব।'

আমার কথা শুনে ভয়ানক অবাক হলেন দু'জন। কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারলেন না।

'ইংল্যান্ডের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ আর নেই,' আবার বললাম আমি।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন স্যার জোসেফ। 'তুমি যে তাহিতিতে ফিরে যাওয়ার কথা ভাববে আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। আমি ভাবছিলাম তুমি হয়তো জাহাজের কাজ ছেড়ে আবার লেখাপড়ায় লেগে যাবে। কিন্তু তাহিতি···না!'

'কেন নয়, স্যার? দেশে কোন বাঁধন, কোন দায় দায়িত্ব আমার নেই। এক মা ছিল, সে-ও মরে গেছে। তাহলে আর কেন?'

'উঁহুঁ, কথাটা তুমি ঠিক বললে না, বিয়্যাম,' মদের গেলাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে ক্যাপ্টেন মন্টাগু বললেন। 'দেশে কোন আপনজন নেই বলে কোন দায় দায়িত্বও নেই এটা কিন্তু ভুল। যে ঘটনাটা ঘটে গেল, এর ফলে বিশেষ একটা দায়িত্ব চেপেছে তোমার কাঁধে।'

'মানে! কিসের দায়িত্ব?'

'তোমার মৃত বাবা মায়ের সম্মানের দায়িত্ব, স্মৃতির দায়িত্ব। বিদ্রোহের মত জঘন্য অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলে তুমি। যদিও বেকসুর খালাস পেয়েছ তবু, আগামী দিনগুলোয় তোমার নামের সাথে সামান্য হলেও–কি বলে ওকে?–কালিমা লেগে থাকবে। তোমার আগামী দিনের কাজের ওপর নির্ভর করবে এই কালিমা চিরদিন থেকেই যাবে না ধীরে ধীরে হালকা হতে হতে মিলিয়ে যাবে। যদি ডাঙার কোন কাজ বেছে নাও বা তাহিতিতে ফিরে যাও, মানুষ বলবে, "রজার বিয়্যাম? হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনি, বাউন্টির বিদ্রোহী গুণ্ডাদের একজন তো?–সামরিক আদালতে বিচার হয়েছিল, শেষ মুহূর্তে কেমন করে যেন ছাড়া পেয়ে গেল।" জনমতের একটা আলাদা শক্তি আছে, বিয়্যাম। ইচ্ছে করলেই সে শক্তিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া যায় না।'

'জাহান্নামে যাক জনমত,' একটু উষ্ণ কণ্ঠেই আমি বললাম। 'আমি নির্দোষ এবং আমার রাবা-মা–মৃত্যুর ওপারে যদি জীবন থেকে থাকে তো এতদিনে নিশ্চয়ই জেনে গেছে একথা। সুতরাং অন্যরা যা খুশি ভাবুক, আমি গ্রাহ্য করি না।'

'তুমি আসলে পরিস্থিতির শিকার হয়েছ,' সহানুভূতির সুরে বললেন ক্যাপ্টেন মন্টাগু। 'তার ওপর পেয়েছ চরম দুর্ব্যবহার আর অপমান। তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। তবে এটাও ঠিক, তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে তুমি যা ভাবছ তা ঠিক নয়। আমার–এবং স্যার জোসেফেরও ধারণা, জাহাজের চাকরিই তোমার জন্যে এ মুহূর্তে সবচেয়ে উপযোগী হবে। তোমার মনে যে ক্ষত তৈরি হয়েছে তা সারিয়ে তুলতে হলে এর চেয়ে ভাল আর কোন পথ নেই। বাতাসে যুদ্ধের গন্ধ। তাতে অংশ নেয়াই যথেষ্ট হবে, দু'দিনেই তোমার সম্পর্কে সব কানাকানি বন্ধ হয়ে যাবে। আর যদি যোগ্যতা দেখাতে পারো তো কথাই নেই।'

এক মুহূর্তের জন্যে থামলেন ক্যাপ্টেন মন্টাগু। তারপর বলে চললেন, 'শোনো, বিয়্যাম, সোজাসুজিই বলছি, আমি তোমাকে হেকটর-এ চাই। লোকের দরকার আছে আমার, সেই লোকটা যদি তুমি হও সত্যিই খুশি হব আমি।'

এরকম একটা প্রস্তাব এমন আচমকা হাজির হবে ভাবতে পারিনি। ইতস্তত করতে লাগলাম আমি।

'হ্যাঁ, বিয়্যাম এটাই সবচেয়ে ভাল হবে তোমার জন্যে,' বললেন স্যার জোসেফ।

'ভাল তো হবে। কিন্তু, স্যার–,' বিড় বিড় করলাম আমি। 'স্যার, আপনার প্রস্তাবটা লোভনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু–'

'এক্ষুণি তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে না,' বাধা দিয়ে বললেন স্যার মন্টাগু। 'ব্যাপারটা নিয়ে ভাল মত চিন্তা ভাবনা করো। এক মাসের ভেতর জানালেই চলবে, ততদিন আমি লোক নেব না।'

'হ্যাঁ, ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নাও,' স্যার জোসেফ বললেন। 'আজ আর এ নিয়ে কোন কথা আমরা বলব না।'

পর দিনই আমি রওনা হলাম কাম্বারল্যান্ডের পথে, ক্রিশ্চিয়ানকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্যে। সেখান থেকে উইদিকম্বিতে আমার বাড়িতে।

মাসের শেষ নাগাদ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। ক্যাপ্টেন মন্টাগুর প্রস্তাব গ্রহণ করব আমি। হেকটরে যোগ দেব নাবিক হিসেবে।

উপসংহার

১৭৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে আমি যোগ দিলাম ক্যাপ্টেন মন্টাগুর জাহাজে। পরের মাসেই ইউরোপ জুড়ে জ্বলে উঠল যুদ্ধের আগুন। বারো বছরের ভেতর সে আগুন আর নিভল না। এই বারো বছরে অসংখ্য নৌযুদ্ধে অংশ নিলাম আমি। বেশির ভাগই স্পেন উপকূলের অদূরে স্প্যানিশ আর্মাডার সাথে। এ ছাড়াও ক্যাম্পারডাউনে ডাচদের সাথে, ডেনদের সাথে কোপেনহ্যাগেন-এ, স্প্যানিশ এবং ফ্রেঞ্চদের সাথে ট্র্যাফালগার-এ যুদ্ধ করতে হলো। এই সময়ের ভেতর ধাপে ধাপে পদোন্নতি পেয়ে আমি ক্যাপ্টেন হলাম।

যুদ্ধের পুরো সময়টায় আমি স্বপ্ন দেখেছি, প্রশান্ত মহাসাগরীয় কোন শান্তিপূর্ণ উপনিবেশে বদলি হওয়ার। কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে, বাস্তব আর হয়নি। বাস্তব হলো যুদ্ধ শেষ হওয়ার অনেক পর ১৮০৯ সালের গ্রীষ্মে, যখন ফরাশিদের কাছ থেকে দখল করা 'কুরিওজ' নামের একটা ফ্রিগেটের দায়িত্ব দিয়ে নিউ সাউথ ওয়েলস-এর পোর্ট জ্যাকসনের পথে রওনা হতে বলা হলো আমাকে। সেখান থেকে ভ্যালপারাইজো যেতে হবে। পথে দিন কয়েকের জন্যে থামতে হবে তাহিতিতে।

এপ্রিলের গোড়ার দিকে এক বিকেলে মাতাভাই উপসাগরে প্রবেশ করল আমার জাহাজ। দূরে তাহিতির তটরেখা দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির বন্যা উদ্বেল করে তুলল আমাকে। ওই তো ওখানে পয়েন্ট ভেনাস। তার ওপাশে ছোট্ট সেই দ্বীপটা—মোটু আউ। উল্টোদিকে হিটিহিটির বাড়ি। সামান্য দূরে স্টুয়ার্টের নিজ হাতে গড়া বাগান। পেগি এখন কেমন আছে? ওদের মেয়ে? বীর পইনোর বাড়ি দেখতে পেলাম, মরিসন আর মিলওয়ার্ড থাকত ওখানে। কাছেই ভাইপুপু উপত্যকা থেকে নেমে আসা ছোট্ট নদী ভাইপুপুর মোহনা, যেখানে তেহানির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল আমার। কতদিন আগের কথা? তখন আমি কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনের দুয়ারে পা দিয়েছি সবে। আর এখন, প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায়। আমার মেয়ে হেলেন এখন কতবড় হয়েছে?

আশ্চর্য ব্যাপার, আমরা যখন নোঙর ফেললাম একটা ক্যানোও এল না আমাদের জাহাজের কাছে। সৈকতের ওপর অল্প কয়েক জন মানুষকে কেবল দেখলাম। উত্তেজনা বা আনন্দ নয়, কেমন যেন বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। তাহলে কথাটা ঠিক! ক'দিন আগে পোর্ট জ্যাকসন-এ এক মিশনারির কাছে শুনছিলাম, যুদ্ধ এবং ইউরোপীয় নাবিকদের সাথে আসা রোগ ব্যাধিতে তাহিতির চার পঞ্চমাংশ জনসংখ্যাই নাকি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কথাটার তাৎপর্য তখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। আজ নিজের চোখে দেখে পারলাম। মনে পড়ল বাউন্টি যেদিন প্রথম নোঙর ফেলেছিল এখানে সেদিনকার

দৃশ্য। হাজার হাজার ক্যানো ছেঁকে ধরেছিল আমাদের। চারদিকে–সাগরে, ডাঙায় সেদিন ছিল প্রাণের ছড়াছড়ি। আর আজ! তাহিতির সেই চির সবুজ প্রকৃতিও যেন আর তেমন নেই। কেমন হলদেটে নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে।

অবশেষে অনেকক্ষণ পর একটা ছোট জোড়া তালি দেয়া ক্যানো এসে ভিড়ল কুরিওজের গায়ে। দু'জন লোক তাতে। ছেঁড়াখোঁড়া ইউরোপীয় পোশাক তাদের পরনে। এক পলক দেখেই বুঝলাম লোকদুটো ভিক্ষুক ছাড়া কিছু নয়। আমাদের দেয়া উপহারের বিনিময়ে কিছুই দিতে পারল না ওরা। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথা শুরু করল। আমি জবাব দিলাম ওদের ভাষাতেই। টিপাউ, পইনো এবং হিটিহিটির কথা জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে কাঁধ ঝাঁকুনি আর বিস্মিত দৃষ্টি ছাড়া কিছু পেলাম না।

সূর্যাস্তের ঘন্টা খানেক আগে আমার লোকেরা হিটিহিটির পয়েন্টে নামিয়ে দিল আমাকে। ওদের অপেক্ষা করতে বলে আমি এগিয়ে গেলাম দ্বীপের ভেতর দিকে। একটা মানুষ দেখতে পেলাম না। আমার তাইওর বাড়ির কোন চিহ্ন খুঁজে পেলাম না। যেখানে হিটিহিটির উঠান ছিল সে জায়গাটা এখন আগাছায় পূর্ণ। ফারেরোই-এর মন্দিরে যাওয়ার পথটারও এক দশা। এখানে যে কোন কালে পথ ছিল অনেক কষ্টে তা কল্পনা করে নিতে হয়।

সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রওনা হলাম তেহানির সাথে যেখানে দেখা হয়েছিল সেই নদীমুখের দিকে।

যেখানে বসে আমি সূর্যোদয় দেখতাম ঠিক সেখানে বসে আছে এক বৃদ্ধা। দূর সাগরের দিকে দৃষ্টি। ধীর পায়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। চমকে মুখ তুলে তাকাল বৃদ্ধা। আমি তাহিতীয় ভাষায় কথা বলতেই মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। হিটিহিটি? হ্যাঁ, লোকটার নাম সে শুনেছে, অনেক বছর আগে মারা গেছে এই গোত্রপতি। হিনা? মাথা নাড়ল বৃদ্ধা। টিপাউ-এর নামও কখনও শোনেনি। তবে পইনোর কথা ভালই মনে আছে তার। ডাকসাইটে যোদ্ধা ছিল। মারা গেছে সে-ও। সামান্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে বৃদ্ধা বলল, 'তাহিতি এক কালে মানুষের দেশ ছিল, এখন ছায়া ছাড়া কিছু নেই।'

পরদিন সকালে জনা বারো লোক নিয়ে পানসিতে করে টাউতিরার পথে রওনা হলাম আমি। দ্বীপটার পূর্ব উপকূল মাতাভাইয়ের চেয়ে অনেক ভাল অবস্থায় আছে মনে হলো। যুদ্ধ ভেহিয়াটুয়ার রাজ্যের বিশেষ কোন ক্ষতি করতে পারেনি। তবে মড়ক তার কাজ ভাল মতই সম্পন্ন করেছে। আগে, আমি যখন ছিলাম তখন যেখানে পঞ্চাশ জন লোক দেখা যেত এখন সেখানে দশ জনেরও দেখা পাওয়া ভার।

ভেহিয়াটুয়ার রাজ্য অক্ষত আছে কিন্তু বাড়ি নেই। সাগরতীরে যেখানে ছিল উঁচু বাড়িটা সেখানে এখন হিটিহিটির বাড়ির মতই আগাছার জঙ্গল। তবে আশ্চর্য ব্যাপার, আমার বাড়িটা আছে। কি করে এটা সম্ভব হয়েছে আমি জানি না।

পানসি ডাঙার মাটি স্পর্শ করল। জনা বিশেক নারী পুরুষ এগিয়ে এল

আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে। এক এক করে প্রত্যেকটা লোকের মুখ নিরীক্ষণ করলাম আমি। এক জনকেও পরিচিত মনে হলো না। তেহানির কথা জিজ্ঞেস করার সাহস হলো না আমার। পোর্ট জ্যাকসনের সেই মিশনারীটির মুখে শুনেছিলাম ভেহিয়াটুয়া মারা গেছে। তার পরিবারের অন্যদের খবর জিজ্ঞেস করার সাহস তখন হয়নি, এখনও হলো না। আমার লোকদের কিছু নারকেল কেনার জন্যে দরদাম করার নির্দেশ দিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম আমাকে চেনে এমন কারও খোঁজে।

বহুদিন আগের পরিচিত পথেই এগোলাম। হ্যাঁ, আমার বাড়ির দিকে। অর্ধেক পথও যাইনি, এমন সময় হোমরা চোমরা চেহারার মাঝ বয়েসী এক লোকের সাথে দেখা হলো। আমাকে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়ল সে। দু'জনের চোখ এক হলো। মুহূর্তের জন্যে কোন কথা বলতে পারলাম না দু'জনের কেউ।

'তুয়াহু?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'বিয়্যাম!' ছুটে এসে ইন্ডিয়ান রীতিতে আলিঙ্গন করল আমাকে তুয়াহু। আবার যখন মুখ তুলল, দেখলাম ওর চোখে জল। আমার হাত ধরে বলল, 'এসো, বাড়িতে এসো।'

'বাড়িতেই যাচ্ছিলাম,' আমি বললাম। 'কিন্তু—তার আগে চলো, এমন কোথাও যাই যেখানে আমরা একটু একা থাকতে পারব।

আমার মনের কথা স্পষ্ট বুঝতে পারল তুয়াহু। বলল, 'এখানেই বলতে পারো যা বলতে চাও। এপথে এখন আর বেশি লোক চলাচল করে না।'

অনেকক্ষণ ধরে সাহস সঞ্চয় করলাম আমি। অবশেষে করলাম প্রশ্নটা:

'তেহানি কই?'

'উয়া মাতে—মারা গেছে,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল তুয়াহু। 'তুমি চলে যাওয়ার তিন চাঁদ পর মারা গেছে ও।'

'আমাদের বাচ্চা?' দীর্ঘ নীরবতার পর আবার আমি প্রশ্ন করলাম।

'ও বেঁচে আছে। এখন পরিপূর্ণ নারী। ওর নিজেরও একটা বাচ্চা হয়েছে। আতুয়ানুই-এর ছেলেকে ও বিয়ে করেছে। একটু দাঁড়াও দেখতে পাবে তোমার মেয়েকে।'

'বন্ধু, তুমি জানো ও কতখানি প্রিয় আমার। এই এতগুলো বছর আমি স্বপ্ন দেখেছি ফিরে আসব, ফিরে আসব। পারিনি। আমার দেশ একটানা জড়িয়ে থেকেছে যুদ্ধে। এই জায়গা এখন আমার কাছে স্মৃতির কবরখানা। মেয়েকে আমি দেখতে চাই, তবে—তবে আমার পরিচয় না দিয়ে। আজ এত বছর পর পিতৃত্বের দাবি নিয়ে ওর সামনে দাঁড়াতে, ওকে বুকে জড়িয়ে নিতে, ওকে ওর মায়ের গল্প শোনাতে আমি পারব না, তুয়াহু। বুঝতে পারছ আমার কথা?'

করুণ একটু হাসি ফুটল তুয়াহুর মুখে। 'বুঝেছি,' সে বলল।

ঠিক সেই সময় নারী কণ্ঠের কথাবার্তা ভেসে এল কানে। তুয়াহু আমার হাত স্পর্শ করে বলল, 'ওই যে, ও আসছে, বিয়্যাম।'

দীর্ঘাঙ্গিনী এক তরুণীকে দেখলাম। পেছনে ভৃত্যস্থানীয়া এক মহিলা।

ছোট্ট একটা বাচ্চার হাত ধরে এগিয়ে আসছে তরুণী। কাঁধ থেকে নেমে এসেছে তুষার শুভ্র কুঁচি দেয়া ইন্ডিয়ান ধাঁচের ঝুল পোশাক। গলায় সোনার হার—তেহানিকে আমি যেটা দিয়েছিলাম।

'তেহানি,' আমার পাশ থেকে ডাকল তুয়াহু। মেয়েটা মুখ তুলল। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল আমার। সাগরের মত গাঢ় নীল চোখ! মৃত মায়ের রূপ পুরোটাই সে পেয়েছে! সেই সাথে পেয়েছে আমার মায়ের সৌন্দর্যের খানিকটা। 'মাতাভাই-এর সেই ইংরেজ ক্যাপ্টেন,' বলল তুয়াহু।

করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটা। আমার নাতনী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। চোখ ঝাপসা হয়ে এল আমার। তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম অন্য দিকে। আমার চোখের জল ওদের দেখতে দিতে চাই না।

'এবার যাই আমরা,' মামাকে বলল তেহানি। 'মেয়েকে কথা দিয়েছিলাম, নানার দেশের নৌকা দেখাব।'

'আচ্ছা, যা,' জবাব দিল তুয়াহু।

জাহাজে ফেরার জন্যে যখন পানসিতে উঠলাম তখন রাত হয়ে গেছে। উজ্জ্বল চাঁদ উঠে এসেছে মাথার ওপর। উপত্যকার গভীর থেকে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে অনেক মানুষের ফিসফিসানির মত শব্দ তুলে। হঠাৎ আমার মনে হলো, প্রেতাত্মার দল ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে—জীবিত এবং মৃত মানুষের ছায়ার মত—আমার নিজের ছায়াও আছে তাদের ভেতর।

***

কিশোর ক্লাসিক

বাউন্টিতে বিদ্রোহ

মূল: চার্লস নর্ডহফ ও জেমস নরম্যান হল

রূপান্তর: নিয়াজ মোরশেদ

নভেম্বর আটাশ, সতেরোশে অষ্টাশি।
হিজ ম্যাজেস্টিজ শিপ বাউন্টি রওনা হলো
দক্ষিণ সাগরীয় দ্বীপ তাহিতির পথে।
কয়েক দিনের মধ্যেই অসন্তোষের বীজ রোপিত হলো
নাবিকদের মনে।
জাহাজ যত এগিয়ে চলল
ততই বাড়তে লাগল অসন্তোষ।
ফিরতি পথে চূড়ান্ত রূপ নিল তা।
কয়েকজন নাবিকের সহায়তায় বিদ্রোহ করে
জাহাজ দখল করে নিল মেট ফ্লেচার ক্রিশ্চিয়ান।
ক্যাপ্টেন উইলিয়াম ব্লাইকে আঠারো জন সঙ্গীসহ
ছোট একটা নৌকায় ভাসিয়ে দেয়া হলো খোলা সাগরে...

সত্য ঘটনা অবলম্বনে অবিস্মরণীয় এক উপন্যাস।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Aohor Arsalan HQ Release

Please Buy The Hard Copy if You Like this Book!!

www.Banglapdf.net